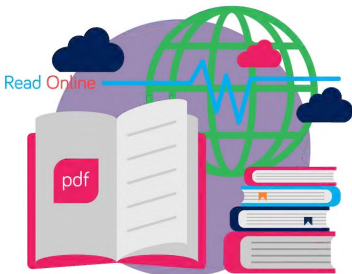

Read Online
pdf

অশ্বডিম্ব

আনিসুল হক





রম্য বিষয়ে রম্য

একজন রম্যলেখক গল্প বলছেন। ভরা আড্ডায়। গল্পটা এরকম :

ডাক্তারের কাছে রোগী গেছে। তার পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

ডাক্তার তাকে বললেন, আপনার কী সমস্যা ?

রোগী বলল, ডাক্তার সাহেব, আমি মাথায় ব্যথা পেয়েছি।

ডাক্তার বললেন, আপনি মাথায় ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু পায়ে ব্যান্ডেজ কেন!

রোগী জবাব দিল, ব্যান্ডেজটা মাথাতেই বেঁধেছিলাম, কিন্তু নামতে নামতে পায়ে চলে এসেছে।

এ গল্প শুনে ভরা আড্ডায় সবাই হেসে উঠল শুধু একজন ছাড়া। তার চুল পাকা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তিনি রম্যলেখককে আলাদা কোনায় নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার গল্পটা তো ভালো। শুনে সবাই হাসলও। কিন্তু আমি তো হাসতে পারলাম না। ব্যাপার কী! আমি বুঝছি না কেন! ধরতে পারছি না কেন! আচ্ছা বলুন তো, রোগী ডাক্তারের কাছে যখন এল ব্যান্ডেজটা তখন তার পায়ে বাঁধা ছিল ?

হ্যাঁ।

আর রোগী বলছে, ব্যথা পেয়েছে সে মাথায় ?

হ্যাঁ।

ব্যান্ডেজটা সে মাথায়ই বেঁধেছিল ?

হ্যাঁ।

তাহলে ব্যান্ডেজটা পায়ে গেল কীভাবে ?

ওই তো বললাম না! ব্যান্ডেজ আস্তে আস্তে নেমে গেছে পায়ে।

রম্যলেখক উত্তর দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইলেন। হাসির গল্প বলার এটাই নিয়ম। যিনি বলবেন, তিনি থাকবেন গম্ভীর। আর যিনি শুনছেন, তার হাসবার পালা। নাহ্, এই পক্বকেশ ভদ্রলোক এবারও হাসতে পারলেন না।

পরদিন তিনি রম্যলেখকের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, কাল সারারাত আমি আপনার গল্পটা ভেবেছি। কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি। আমার মনে হয় গল্পটা আপনি সবটা বলেননি। কিছু কিছু জিনিস গোপন রেখেছেন।

রম্যলেখক বললেন, না না, পুরোটাই বলেছি।

না। তা হতে পারে না। মাথা থেকে একটা ব্যান্ডেজ কীভাবে পা পর্যন্ত নামতে পারে? তা যদি বাস্তবে ঘটেও, তাহলে তো দুপায়ের চারপাশে লুঙ্গির মতো ব্যান্ডেজটা নেমে যাবে। সে হাঁটতে পারবে না। তাই কি হয়েছে ?

না। তা হয়নি।

তাহলে নিশ্চয় রোগীর পা ছিল একটা।

না। তার দু'পা-ই ছিল। রম্যলেখক বললেন।

মন খারাপ করে প্রবীণ ভদ্রলোক চলে গেলেন।

গভীর রাতে ফোন এল রম্যলেখকের বাসায়। ভাই, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন তো! আমি সেই বুড়োটি। আপনার কৌতুকটি যে ধরতে পারছে না।

বলুন।

আপনার গল্পটি আমি আমার স্ত্রীকে বললাম। সে হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছে। ব্যাপার কী ভাই! আমার স্ত্রী পর্যন্ত ধরতে পারল, আর আমি পারলাম না! আপনি কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ?

না! বুঝিয়ে বলব না। আপনি ঘুমোন। রম্যলেখক ফোন রেখে দিলেন।

পরদিন রম্যলেখকের অফিসে এসে তিনি হাজির। বললেন, আমি খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি। আমার চাকরি যায়-যায় অবস্থা। আমি যে চাকরিটা করি, তাতে রসিকতা করা আর রসিকতা বোঝাটা আমার চাকরির শর্তের মধ্যে পড়ে।

রম্যলেখক এরপর কী করেছেন, কী বলেছেন আমাদের জানা নেই। হয়তো তিনি বলেছেন, এই কৌতুকটি বোঝার জন্য আপনাকে যা করতে হবে, তা হলো চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া। এই চাকরিই আপনার রস শুকিয়ে ফেলেছে। হয়তো তিনি মানবিক কারণে ভদ্রলোকের চাকুরি রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু যা জানা যায়, এই কৌতুকটি নিয়ে তিনি যান একটি কৌতুক-পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। সম্পাদকের টেবিলে তখন আরো লোকজন উপস্থিত ছিল। রম্যলেখকের কৌতুকটি সম্পাদক সাহেব উপস্থিত সবাইকে পড়ে শোনান। সবাই একযোগে হেসে ওঠে। পরে সম্পাদক বলেন, আপনার লেখাটি আমি ছাপব। অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহ সহকারে ছাপব। কিন্তু কানে কানে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কৌতুকটার মজাটা কোথায় ? সবাই হাসল কেন ? আপনি কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ?

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ আপনারা যে গল্পটি শুনলেন, এটা আমি পেয়েছি একটা রুশ বইয়ে। এই ঋণটুকু আমি স্বীকার না করলেও পারতাম। তাতে দুটো লাভ হতো।

১. বেশির ভাগ পাঠকই এটা আমার বানানো গল্প বলে ভাবতেন। এর ফলে তারা আমার সৃজনশীলতা সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠতেন।
২. কিন্তু সকল পাঠককে চিরকালের জন্য বোকা বানানো যাবে না। কিছু কিছু পাঠক আছেন, চলিষ্ণুবিদ্যাকল্পদ্রুম। তারা ঠিকই আমার এই চুরিবিদ্যা ধরে ফেলবেন। এবং চিল্লাচিল্লি শুরু করবেন, আনিসুল হক এটা নকল করেছেন। আনিসুল হক চোর....ইত্যাদি। তখন আমার প্রচার বাড়বে। এবং লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন পুরোপুরি না করে ভাববে : গ্রেট মেন থিংক এলাইক, এবং গবেষকেরা তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা করে দেখাবেন, রুশ লেখকের সঙ্গে আনিসুল হকের চিন্তার ঐক্য ও পার্থক্য কোথায়।

কিন্তু আমি ঋণ স্বীকার করছি। এর ফলেও লাভ হবে। লাভটা হলো লোকে ভাববে আনিসুল হককে যতটা মূর্খ ভেবেছিলাম, সে ততটা মূর্খ নয়। সে রুশ বইটইও পড়ে।

২

আমি জানি না, উপরের অংশটি পড়ে পাঠকের মনের অবস্থা কী দাঁড়াল। একটা রম্যরচনা হিসেবে উপরের অংশটুকুই যদি ছাপা হয়, তাহলে পত্রিকার পাঠক ও সম্পাদকের মনে কী কী ভাবনার উদয় হবে! তারা কী কী বলবেন!

১. এই ব্যাটা ফাঁকিবাজ, এটা একটা লেখা হলো ?
২. এই লেখার উদ্দেশ্য কী ? শুধু ফাজলামোর জন্য একটা পাতা! ব্যাটা পাঠকদের ছাগল ভাবে যে, ঘাস খাওয়াতে চায়!

এটা একটা বিপদ বটে! সিরিয়াস পাঠকেরা সব বিষয়েরই একটা শিক্ষামূলক উপসংহার চান। রুশ গল্পটির তেমন উল্লেখযোগ্য উপসংহার নেই। এই পর্যন্ত লিখে যদি আমি পত্রিকা সম্পাদকের হাতে দিই, সম্পাদক লেখাটি নাও ছাপতে পারেন। তাই আমাকে এখন উপসংহার দিতে হচ্ছে।

এরশাদ-আমলে সরকার প্রায়ই সম্পূর্ণ অকারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ' ঘোষণা করত। মাসের পর মাস বন্ধ থাকতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে একজন পত্রলেখক পত্রিকায় চিঠি লিখল : বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ও হলগুলো অকারণে পড়ে আছে। ফাঁকা। অব্যবহৃত। তার চেয়ে এক কাজ করলেই তো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাঁসমুরগির খামার করা হোক। তাতে ডিম ও মাংস সমস্যার সমাধান হবে।

এই পত্রের জবাবে দু-সংখ্যা পরে অন্য একজন পত্রলেখকের চিঠি ছাপা হলো। তাতে বলা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাঁসমুরগির খামার বানানোর প্রস্তাব একটা আত্মঘাতী প্রস্তাব। কে না জানে যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড...ইত্যাদি।

৩

অর্থাৎ, কিছু কিছু লোক আছে, রসিকতা বোঝে না। তারা গূঢ়ার্থ খোঁজে। তাদের নিয়েই হয় মুশকিল।

একবার এক বৃদ্ধলোক একটা লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলছিলেন। কায়িক শ্রমে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি বলছিলেন : যমদূত কোথায়, তার কি চোখ নেই, সে কি আমাকে চোখে দেখে না, আমার জানটা কবচ করতে পারে না ?

মাথার উপর দিয়ে তখন যাচ্ছিল যমদূত। সে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের সামনে হাজির। আমি যমদূত, তুমি আমায় ডেকেছিলে কেন ? বৃদ্ধ বললেন, আমার বোঝাটা বহন করতে কষ্ট হচ্ছে, এটা কি তুমি বহে দিতে পারো ? এজন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম।

না, আমি শুনলাম, তুমি তোমার জান কবচের কথা বলছিলে।

আরে ও-কথা তো বলছিলাম ইয়ার্কি করে। ও যমদূত, তুমি ইয়ার্কিও বোঝ না!

৪

এ বইটি যারা ইয়ার্কি বোঝে না, তাদের জন্যে নয়। আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বিয়ে করবে। তার জন্যে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। কেমন পাত্রী চাই ? বাসার সবাই জিজ্ঞেস করে। সে বলেছে, অন্য কোনো গুণ থাকুক বা না-থাকুক, একটা গুণ থাকতে হবে। জোক্‌স শুনে হাসতে হবে।

আমার এ বইটি তাদের জন্যে, যারা জোক্‌স শুনে বুঝতে পারেন ও হাসতে পারেন।

এ দাবি আমি করছি বটে, কিন্তু আমি নিজেই ঠিক রসিকতা ধরতে পারি না।

যেমন, ওই রুশ জোকটা...। একজন আর্মি অফিসার ফ্যান পরিষ্কার করার জন্যে জুতোসুদ্ধ চেয়ারে উঠেছে। তার বউ বলল, একটা পত্রিকা বিছিয়ে নিলেই তো পারতে। আর্মি অফিসার জবাব দিল, তাতে কী লাভ হতো! আমি তো এমনিই নাগাল পাচ্ছি!... এই জোকটা আমি ধরতে পারি না। সত্যি তো, পত্রিকা তো তেমন উঁচু না। নাকি আজকালকার পত্রিকা বেশ উঁচুই!

এসো জ্বালিয়ে দেই সারাদেশ

দেশের ১০ কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে শাহ আলমের দিকে। সাফ গেমস। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশও এ গেমসে অংশ নিচ্ছে। তেমন কিছুই অবশ্য অর্জন নেই বাংলাদেশের। ফুটবলের সোনা, সে তো সোনার হরিণ। কাবাডিতে রুপা! এই যা!

কিন্তু দেশ তাকিয়ে আছে শাহ আলমের দিকে। শাহ আলম দৌড়বিদ। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে তিনিই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন। দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম মানব হতে যাচ্ছেন তিনি। ১০০ মিটার দৌড়ে যে মুহূর্ত কয়েক সময় লাগবে, তা অতিবাহিত হলেই তার গলায় সোনার পদক ঝুলবে। উত্তোলিত হবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। বেজে উঠবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

গেট সেট রেডি। গো...। শাহ আলম দৌড় শুরু করেছেন। একেকটা মুহূর্ত যেন একেকটা বছর। কিন্তু একেকটা পদক্ষেপ যেন পাড়ি দিচ্ছে একেকটা মাইল।

হঠাৎ কী হলো! কতিপয় মানুষ, তারা বাংলাদেশেরই নাগরিক, পেছন থেকে টেনে ধরল শাহ আলমকে। শাহ আলম, দাঁড়াও। তুমি থামো।

শাহ আলম তাদের হাত থেকে পরনের গেঞ্জি ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছেন। আর নয়, এখনো যদি ওরা তাকে ছেড়ে দেয়, এক লাফে তিনি পৌঁছে যাবেন শেষপ্রান্তে। কেউ তার চ্যাম্পিয়নশিপ কেড়ে নিতে পারবে না।

অন্য সব দেশের দৌড়বিদরা দৌড়াচ্ছে। কিন্তু শাহ আলম দৌড়াতে পারছেন না। তিনটি সেকেন্ড তাকে আটকে রাখল তার স্বদেশের বন্ধুরা। তারপর তাকে বলল, যাও, এখন আবার দৌড়াও।

শাহ আলম থেমে গিয়েছিলেন। আবার দৌড় ধরলেন। একবার থেমে আবার দৌড় শুরু করা কঠিন। তবু দৌড়ে যেতে হবে। শাহ আলম যখন দৌড় শেষ করলেন, তখন দক্ষিণ এশিয়ার সব কজন দৌড়বিদই পৌঁছে গেছেন শেষ মাথায়।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন শাহ আলম। কী হয়ে গেলো আজ তার জীবনে। কিন্তু যে বাংলাদেশীরা শাহ আলমকে আটকে রেখেছিল ট্র্যাকের মধ্যখানে, তারা তাকে অভিনন্দন জানাল। বলল, অভিনন্দন শাহ আলম, হরতাল পালন করায় তোমাকে অভিনন্দন। তোমার দৌড়ের মধ্যখানে আমরা তিন সেকেন্ডের জন্য হরতাল ডেকেছিলাম।

২

উপরের ঘটনাটা কাল্পনিক। তবে আমাদের বাস্তবতা এর চেয়েও অনেক খারাপ। উপরের ঘটনায় শাহ আলমের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে, সারাজীবনের সাধনার শেষ পুরস্কার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়, বঞ্চিত করা হয় সমস্ত জাতিকে একটা বড় সম্মান থেকে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা আরো ভয়াবহ। সারা পৃথিবীর সবকটা দেশ এখন প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সামনের দিকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার জন্য, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকার জন্য, একবিংশ শতকের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি অর্জনের জন্য। এ দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার অর্থ হলো সমস্তটা দেশের জন্য স্থায়ী দুঃখ-কষ্ট, অবমান-অপমান বরণ করে নেয়া। ঠিক এই সময়ে খুবই পিছিয়ে পড়া দেশ বাংলাদেশকে দৌড়াতে দিচ্ছে না এদেশেরই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। দেশকে জাপ্টে ধরে তার জার্সি টেনে ধরে হাত-পা বেঁধে রেখে বলা হচ্ছে— দৌড় থামাও, এখন হরতাল!

এই দৌড়ে হেরে গেলে আমরা যে কেবল সোনা থেকে বঞ্চিত হব, তাই তো শুধু নয়; দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্য দারিদ্র্য, অনাহার, চিকিৎসাহীনতা হয়ে পড়বে স্থায়ী।

শাহ আলমকে ১০০ মিটার দৌড়ে ৩ সেকেন্ড আটকে রাখার চেয়েও বড় ক্ষতি হচ্ছে একুশ শতকের দিকে দৌড়ে দেশকে তিনদিনের জন্য আটকে রাখায়।

একটা মানুষকে খুন করা হলে সে অপরাধীর যদি ফাঁসি হয়, ১৩ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎকে হত্যা করা হলে তার শাস্তি কী হতে পারে?

৩

ঘন ঘন হরতালের মতো জাতির হাত-পা কেটে ফেলার কর্মসূচি দেয়ার জন্য দেশের মানুষ নিশ্চয় আমাদের বিরোধীদলগুলোকে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সরকার যে দায়দায়িত্ব এড়াতে পারবে তাও নয়।

সরকার কি বিরোধীদলকে পৌরসভা নির্বাচনে আনার জন্য তার আন্তরিকতার শেষবিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা করেছে?

দেশের সবকটা পৌরসভায় আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়ে পড়ছে, এই আত্মতৃপ্তিতে কি সরকার ভুগছে না? আর তা হতে দেয়ার পর বিএনপিই বা কী করে পরবর্তী মেয়র নির্বাচন বা সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে? ফলে আগামী আড়াই বছর দেশে শান্তি আসার কোনো কারণ নেই।

আগামী আড়াই বছরে দেশে যে অরাজকতা ঘটতে যাচ্ছে, তার চেয়ে এক কাজ করতে পারেন আমাদের রাজনীতিবিদেরা— সমস্তটা দেশে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন!

৪

সত্য বটে বিএনপিসহ বিরোধীদলগুলো নিজের বানানো কুয়োয় নিজেরাই পড়েছে। পৌর নির্বাচন বর্জন কিংবা দেশব্যাপী হরতাল ডাকার মতো কোনো বাস্তব কারণ নেই। এটা তারা না করলেই ভালো করতেন। এজন্য আমরা তাদের দোষারোপ করব।

কিন্তু দায় কি এড়াতে পারবে আমাদের সিভিল সোসাইটির শীর্ষ মুখপাত্রগণ। পাবনা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ যদি ভিত্তিহীনও হয়, তবু আসলে ওখানে কী ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার জন্য একটা গণতদন্ত কমিশন কি গঠন করা যেত না!

(একই কথা অবশ্য বিএনপিওয়ালাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। পাবনা নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, এ ঢালাও অভিযোগের অতিরিক্ত একটাও কি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তারা দেখাতে পেরেছে ?)

৫

যাক, দেশ অনিবার্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অরাজকতার মুখে। আমাদের রাজনীতিবিদদের একটাই নীতি— যা আমি ভোগ করতে পারব না, অন্যদেরও তা ভোগ করতে দেব না। দরকার হলে সারাটা দেশ জ্বালিয়ে দেব। পুড়িয়ে দেব!

দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম মানব শাহ আলম অনেক আগেই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। হয়তো তিনি ঠিক কাজটিই করেছেন। আমাদের নেতৃবৃন্দ কোমর বেঁধে নেমেছেন— এ দেশটাকে তারা মানুষের বসবাসযোগ্য থাকতে দেবেন না।

৬

ছোট্ট মেয়ে পদ্য। বয়স সাড়ে তিন বছর, জানুয়ারিতে ভরতি হয়েছে স্কুলে। প্লে-গ্রুপে। বাবা বলেছেন, প্লে-গ্রুপ মানে খেলার গ্রুপ। ওখানে শুধু খেলা হয়।

পদ্যর ক্লাস সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্লাস আর হতে পারছে কই! আজ হরতাল, কাল হরতাল, পরশু হরতাল!

পদ্য খুব ভয় পায় পুলিশকে। হরতালের দিন পাড়ার রাস্তায় ভাইয়ারা ক্রিকেট খেলে আর গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ। তাই পদ্য খুব ভয় পায় হরতালকে।

আবার তিন দিন হরতাল। পদ্য খুব ভয় পেয়ে গেল। বাবাকে বলল, বাবা হরতাল কারা দেয় ? কেন দেয় ?

বাবা মেয়েকে এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন। কী বললে সাড়ে তিন বছরের শিশু হরতালের মানে বুঝবে। তিনি বললেন, 'এখন শেখ হাসিনা রানী। তাই খালেদার খুব রাগ। রেগে-টেগে তিনি হরতাল দেন। বলেন, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ, দোকান বন্ধ, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। যদি কেউ এসব চালাতে চাও, আমি সব ভেঙে দেব, পুড়িয়ে দেব। এর আগে যখন খালেদা ছিলেন রানী, তখন হাসিনাও খুব রেগে গিয়েছিলেন। তিনিও তাই হরতাল ডাকতেন।'

'দোকান, গাড়ি সব কেন ভাঙে ?'

'বাহ! তুমি যখন রেগে যাও, তখন তোমার খেলনা গাড়ি, পুতুল, ঘরবাড়ি ধরে আছাড় মারো না ? ওসব ভেঙে ফেলতে চাও না ? তেমন তারাও সবকিছু ধরে আছাড় মারতে থাকেন।'

'ও! দোকান, গাড়ি, স্কুল— এসব বুঝি খালেদা-হাসিনার খেলনা ?'

পদ্য খুব গম্ভীর। খুব ভয় পেয়ে গেছে সে। তার চোখমুখে একরাশ অন্ধকার।

বাবা তাকে এই প্রশ্নটার জবাব দিতে পারেন না।

প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

ভয়ঙ্কর রোবট ও একটি প্রশ্ন

রোবটটার নামটা খুব সুন্দর। এঞ্জেলিকা।

নামটা শুনেই সায়মন মুগ্ধ হয়েছিল। সে তাকে ডাকে কিন্নরী বলে। অবশ্য প্রথম সাতদিন সে ভেবেছিল, অপ্সরা বলেই ডাকবে তাকে। কিন্তু পরে অপ্সরা নামটা একসময় নিজে নিজেই বাতিল করে ফেলেছে সে।

ব্যাপারটা তার নিজের কাছেই রহস্যময়। যেমন, তার বাবা তার নাম রেখেছিলেন সায়মুল। বড়ছেলের নাম সায়ফুল, তার সঙ্গে মিলিয়ে ছোটছেলের নাম তিনি সায়মুল রাখাই সঙ্গত ভেবেছিলেন। কিন্তু দু-চার দিনের মাথাতেই তার নাম সায়মন হয়ে গেল!

এখন তার এই রোবটটার ডাকনাম অপ্সরা নয়, কিন্নরী। কোম্পানির দেয়া নাম এঞ্জেলিকা।

প্রথম দিন সায়মন তাকে বলল : এঞ্জেলিকা, আমাদের দেশে প্রত্যেকের দুটো নাম থাকে। একটা সার্টিফিকেটের নাম, অনেকের ক্ষেত্রেই সেই নামটা থাকে অজানা; আরেকটা ডাকনাম, পরিবারের সবাই সেই ব্যক্তিকে ডাকনামেই ডাকে। তোমার অফিসিয়াল নেম এঞ্জেলিকা, কিন্তু আমি তোমাকে ডাকব অপ্সরা বলে। বুঝলে!

'জি, বুঝলাম।'

'ভালো করে নামটা মেমোরিতে নিয়ে নাও। অপ্সরা বললেই সাড়া দেবে। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

কয়েকদিন পর যখন অপ্সরা নয়, কিন্নরী নামে তাকে ডাকা শুরু হলো, তখনো সে কিন্তু ঠিকই সাড়া দিল। সায়মন প্রথমে ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। পরে যখন তার হুঁশ হলো, সে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ। কী ব্যাপার এঞ্জেলিকা, তোমাকে কিন্নরী বলে ডাকছি, তাতেই তুমি সাড়া দিচ্ছ, ব্যাপার কী?

'মি. সায়মন। আমি হলাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান রোবট। আপনার ডাকার ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পারি, আপনি আমাকে ডাকছেন। এমনকি আপনি যদি 'এই', 'হে', 'ওই', 'ওগো', 'হ্যাঁগো' বলে আমাকে সম্বোধন করেন, তাতেও আমি সাড়া দেব।"

এমন যে বুদ্ধিমান, সুদর্শন এবং সহানুভূতিসম্পন্ন রোবট, যার নাম 'এঞ্জেলিকা', সেই কিনা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

এঞ্জেলিকা বলল, মিস্টার সায়মন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন। আমি এখন আমার ভেতর থেকে অসীম-সসীম ক্ষমতার বিদ্যুৎ-বিস্ফোরণ ঘটাব! সঙ্গে সঙ্গেই আপনি মারা যাবেন।

সায়মন প্রথমে এঞ্জেলিকার কথার কিছুই বুঝছে না। রোবটটার মাথাটা খারাপ হলো কী করে?

সায়মন আর তার রোবটটা এখন বিশাল জাহাজে ভাসমান। তারা সমুদ্রে এসেছে একটা প্রমোদ-ভ্রমণে। জাহাজে আছে আরো অসংখ্য শিশু, নারী আর পুরুষ।

সায়মন বলল, তোমার এই বিদ্যুৎ-বিস্ফোরণে কি শুধু আমি মারা যাব, নাকি আরো কেউ মারা যাবে?

এঞ্জেলিকা বলল, পুরো জাহাজটা বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়বে, সব দাহ্যবস্তু একসঙ্গে জ্বলে উঠবে, জাহাজের জ্বালানি তেলভাণ্ডার বিস্ফোরিত হবে, জাহাজের যাত্রীরা সবাই জীবন্ত দগ্ধ হবে, অতঃপর জাহজের প্রজ্জ্বলন্ত খণ্ড খণ্ড অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে পানিতে!

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ, এঞ্জেলিকা ?'

'না। মিস্টার সায়মন।'

'তোমার এই উল্টোপাল্টা আচরণের কারণ কী ?'

'আমার ভেতরে সার্কিটে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। এই ঘটনা ঘটানো ছাড়া আমার আর কোনোই উপায় নেই।'

'কিন্তু রোবোটিকস অনুসারে তুমি আমার ক্ষতি করতে পারো না।'

'আমি এখন আর লক্ষ্মী ধরনের স্বাভাবিক রোবট নই, জনাব।'

'তুমি কি এক্ষুনি বিস্ফোরণটা ঘটাবে ?'

'হ্যাঁ। তবে তার আগে আপনার শেষ আদেশটি আমি প্রতিপালন করব। মনে রাখবেন, সেটি যেন এমন না হয় যে, তুমি পানিতে ঝাঁপ দাও বা তুমি ক্ষতিকর আচরণ করো না।'

'তাহলে আমি কী ধরনের আদেশ তোমাকে দিতে পারি ?'

'কোনো সাধারণ অঙ্ক কষতে দিতে পারেন।'

'আচ্ছা। তাহলে আমি একটু ভেবেই তোমাকে একটা অঙ্ক কষতে দেব।'

'বেশিক্ষণ সময় নেবেন না। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।' এঞ্জেলিকা বলল। তাকে সত্যি সত্যি রাগী আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

সায়মন মহা ফাঁপরে পড়েছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জাহাজভরতি এতগুলো মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

অথচ তার মনে পড়ছে কেবল তার ছেলের কথা। তার একটা ছোট্ট ছেলে আছে। বয়স কেবল এক বছর দু'মাস। ছেলেটার নাম সে রেখেছে 'অনন্ত'। এটা সে রেখেছে 'ইনফিনিটি'র বাংলা তর্জমা করে। ছেলেটা ভীষণ মায়াবী। আধো-আধো কণ্ঠে কথা বলে। তার মা তার কপালে বড় কাজলের ফোঁটা পরিয়ে রাখে। যেন কারো নজর না লাগে। এ সবকিছু ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে! না, তা হতে পারে না।

সায়মনের মনে পড়ল হুমায়ুন আহমেদ আর মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা দুটো সায়েন্স ফিকশনের কথা। হুমায়ূনের সায়েন্স ফিকশনে রোবটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একটা সাপ তার নিজের লেজ নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলেছে। লেজের দিক থেকে সে খেতে খেতে ক্রমাগত এগুতে থাকবে। শেষপর্যন্ত কী হবে! রোবট এই প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেনি। ক্রমাগত ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেছে। আর জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশনে এমন একটা খেপা রোবটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল...

হ্যাঁ, এরকমই একটা প্রশ্ন করতে হবে এই রোবটটিকে। কী করা যায়, কী করা যায়!

ইউরেকা। একটা প্রশ্ন মনে পড়েছে সায়মনের। সে প্রশ্নটা মনে মনে সাজিয়ে নেয়। তারপর দাঁড়ায় এঞ্জেলিকার সামনে।

'এঞ্জেলিকা। প্রশ্নটা একটু লম্বা। কিন্তু সহজ। সাধারণ একটা অঙ্ক। একটা দেশে একটা পেশাজীবী গোষ্ঠী আছে। তাদের শতকরা ৯৯ ভাগ ঘুষ খায়। ঘুষ খাওয়া

সেদেশে অপরাধ। তাহলে ৯৯ ভাগই ঘুষ খাওয়ার অপরাধে অপরাধী। তারপর তাদের অনেকেই বা কেউ কেউ রেপ করে। তাদের স্টেশনে কেউ সাহায্যের জন্য গেলে রেপ্‌ড হয়। রাস্তাঘাটেও তারা রেপ করেছে— এমন ঘটনার উদাহরণ ভূরি ভূরি। তারপর তারা নিজেরাই ছিনতাই করে, ডাকাতিও করে। এদের বেশিরভাগই স্কুল পর্যন্ত পড়েছে, এর বেশি এদের শিক্ষাদীক্ষা নেই। যে ট্রেনিং এদের দেয়া হয় তা শারীরিক। মানসিক উৎকর্ষের ট্রেনিং তাদের দেয়া হয় বলে মনে হয় না।'

'খুবই ভয়াবহ একটা গোষ্ঠী। সন্দেহ নেই। বলুন, আপনার প্রশ্ন শেষ করুন।'

'এখন প্রশ্ন হলো, এই শতকরা ৯৯ ভাগ অপরাধী যে দলে, তাদের হাতে রাষ্ট্র ও সরকার তুলে দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং দিয়েছে দেশে অপরাধ নির্মূলের ভার। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কোন্ দেশের কথা বলছি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কোন্ পেশার লোকদের কথা বলছি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি বলো, সব জেনেশুনে এই দেশ, তার সরকার, তার জনগণ এমন একটা ভয়াবহ অপরাধচক্রের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ অপরাধ দমনের দায়িত্ব দিয়ে রাত্রি বেলা ঘুমায় কী করে? মানুষের চোখে ঘুম আসে কী করে?'

'আপনি কি নিশ্চিত, সেদেশের মানুষ রাতে ঘুমায়?'

'হ্যাঁ। ঘুমায়!'

'সে দেশে সরকার আছে?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'দাঁড়ান। প্রশ্নটা কঠিন। একটু ভেবে বলি।'

রোবটটা ভাবতে থাকে। যারা ঘুষ খায়, ঘুষ খাওয়া অপরাধ, অর্থাৎ যারা অপরাধী; যারা নিজেরাই ছিনতাই, রাহাজানি, রেপ করে; তাদের হাতেই কেন দেয়া হয়েছে অপরাধ নির্মূলের ভার এবং আগ্নেয়াস্ত্র। আর এই ভয়াবহ ব্যাপারটি ঘটে যাওয়ার পরও কী করে দেশবাসী ঘুমোয়?

ভেবে ভেবে রোবটটি কূলকিনারা করতে পারে না।

জাহাজটি নিরাপদে জেটিতে ফেরে। রোবট-পুলিশ এসে এঞ্জেলিকাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ২৫ মার্চ, ১৯৯৯

কাফ্‌কার জগতে বসবাস

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। পথে এটা কলার খোসা পড়ে আছে। খোসাটা তুলে কি ডাস্টবিনে ফেলে দেব! না, দেয়া হয় না। কত কিছুই তো করতে সাধ হয়, করা হয় কই! এ তো কলার খোসা! মাঝেমধ্যে জানেন, আমি যে পথ দিয়ে চলি, যে ফুটপাত দিয়ে; তাতে, আমার পায়ের খুব কাছে মানুষ শুয়ে থাকে। আকাশে ঝাঁঝাঁ রোদ। ব্যস্ত রাজপথে গাড়িঘোড়া হাতি ছুটে চলেছে। কানে তালা লাগার উপক্রম। অথচ একটা মানুষ ঠিক

ফুটপাতে শুয়ে আছে। লোকটা মরে যায়নি তো! অজ্ঞান হয়ে পড়ে নেই তো! ওর বুকে হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে!

কিছুই করা হয় না। হেঁটে চলে যাই। কলার খোসার কথা মনে হতেই মনে পড়ে যায় পাকা কলার কথা। কাল পাড়ার মুদির দোকানে, এমনি দুপুরবেলা, এক কাঁদি পাকা হলুদ কলা দেখেছিলাম। এতটা হলুদ, এত চড়া রঙ কি আমাদের জীবনে হয়?

ভাবছি। আর হাঁটছি। তখন, দুটো লোক, হঠাৎ দুপাশ থেকে এসে আমার দুটো হাত ধরে ফেলে! আমার বগলের নিচ দিয়ে তাদের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে কবজা করে তারা!

আমি চিৎকার করতে চাই। কণ্ঠস্বর থেকে কোনো আওয়াজ বেরোয় না। একটা পুলিশের গাড়িতে তারা তোলে আমাকে।

ব্যাপার কী!

ব্যাপার আছে।— তারা বলে।

আমাকে তারা নিয়ে যায় থানায়! এখন থানায় নিয়ে গিয়ে তারা কী করবে?

অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন :

১. বলতে পারে, তোমার নাম মরা। তুমি তানিয়া নামের একটা ছোট্ট শিশুকে রেপ করেছ! তোমাকে আমরা পেয়েছি! আর ছাড়ছি না। পশ্চাদ্দেশে রুলার প্রবিষ্ট হলে বুঝবে— পুলিশের কক্ষে ঢুকে রেপ করবার পরিণতি কী!

প্রায় এক বছর আগে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত প্রাঙ্গণে ধর্ষণের শিকার ছয় বছরের শিশুকন্যা তানিয়ার পিতা ফজল বেপারী মুখ খুলতে শুরু করেছেন। প্রকৃত ঘটনা আদালতে বলতে এবং মেয়েকে ফেরত পাওয়ার জন্য আইনজীবীদের সহযোগিতা চাইছেন।

গত বছরের ১০ মার্চ শিশু তানিয়া ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণকারী সন্দেহে সিআইডি পুলিশ ওবায়দুল হক মরা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

ফজল বেপারী বলেন, আদালত তানিয়াকে তার কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সিআইডি পুলিশ তানিয়াকে তার কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু মাত্র তিনদিন পর পুনরায় পুলিশ তানিয়াকে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসপি মুজিবর রহমান তাকে বলেছেন যে, তানিয়া মিরপুরের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিরাপত্তা সেলে রয়েছে। একাধিকবার তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে গিয়েছেন। কিন্তু তানিয়াকে দেখতে দেয়া হয়নি।

সিআইডি অফিসে গিয়ে এএসপি মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখান থেকে তাকে বলা হয়েছে, এখনো মামলা শেষ হয়নি। মামলা শেষ হলেই তানিয়াকে ফেরত দেয়া হবে। তারপর জমি এবং টাকা দেয়া হবে। তবে এ-কথা কাউকে যেন না বলা হয়।

তানিয়ার পিতার অভিযোগ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নেত্রী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, আইনে বলা হয়েছে সাক্ষীকে কখনো পুলিশ হেফাজতে রাখা যাবে না। অথচ পুলিশ তানিয়াকে জোরপূর্বক তাদের হেফাজতে রেখেছে। তার পিতার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। তিনি বলেন, তানিয়া ধর্ষণের ঘটনায় ওবায়েদ জড়িত থাকলে বিষয়টি নিয়ে এত রাখঢাক কেন? *(প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)*

২. তারা বলতে পারে— আপনার নাম নূরুল আবছার। আমরা ইন্টারপোলের ফ্যাক্স পেয়েছি। আপনি একজন ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট। বলুন। কোথায় কী রেখেছেন ? কার কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে! বলুন। বলতে হবে। নিন। একটা সিগারেট খান। তারপর ধীরে সুস্থে বলুন।

'আমি কি একগ্লাস পানি খেতে পারি ?'

'নিশ্চয়। চা খাবেন ? কফি ?'

'পানি!'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা চানটা কী ? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা কী ? কেন সন্ত্রাস করেন ? স্মাগলিঙে কি অনেক টাকা ? ড্রাগসে ? মেয়েমানুষে!'

ইন্টারপোল ফ্যাক্সের পুরো ব্যাপারটাই ভুয়া ? নূরুল আবছারকে চট্টগ্রাম আদালতে হাজির করানো হতে পারে আজ।

॥ চট্টগ্রাম অফিস ॥

ইন্টারপোলের কাছ থেকে কথিত ফ্যাক্সে ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তরে তথ্য পেয়ে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' বলে চট্টগ্রামে ৬ দিন আগে গ্রেপ্তারকৃত নূরুল আবছারের কোনো অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণই জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া যায়নি। নূরুল আবছারের পরিবার অবশ্য প্রথম থেকে দাবি করছিল তিনি নির্দোষ। এখন জানা যাচ্ছে, ইন্টারপোল থেকে আদৌ কোনো ফ্যাক্স আসেনি। কেউ আবছারকে হেনস্তা করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে লন্ডন থেকে ফ্যাক্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগকেও বোকা বানিয়েছে। *(প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯)*

৩. আপনাকে খালি-গা করাতে পারে। তারপর পেছনে আরো একদল মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে পারে সংবাদপত্রে : 'গতকাল হোটেল নিশি অভিসার থেকে অসামাজিক কার্যের অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়!'

৪. তারা বলতে পারে, এই সেই নাইন-শুটারওয়ালা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন একে ধরার। আমরা পেয়ে গেছি একে। হুঁ হুঁ হুঁ। ফাজলামো। কই রেখেছ চান্দ নাইন-শুটারটা ?

অতঃপর কাগজে ছবি। নাইন-শুটারওয়ালা ধৃত।

অবস্থা খুব খারাপ। পুলিশের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে! জীবন ফাঁদময়! কিন্তু বাংলাদেশে আছে আরো অনেক ধরনের ফাঁদ। ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা, পথের ধারে বিপজ্জনক নির্মাণ কাজ, ইলেকট্রিকের ছেঁড়া তার আর পুলিশ!

লালবাগের একটা শস্তা রেস্তোরাঁয় এক ব্যক্তি 'প্রথম আলো' মেলে ধরে আছে! *স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ মানা হলো না! পুলিশ ধরছে না এই নাইন-শুটারওয়ালাকে!* এ খবরটি পড়ে লোকটা বলে উঠল : আমরা সবায় চিনি, মাগার হালায় পুলিশ চিনে না!

'সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক, তাকে গ্রেপ্তার করুন'—প্রধানমন্ত্রী

প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

আমাদের চাঁদ-সূর্যও কি নকল ?

আজ থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। সংবাদপত্রে চানাচুর-সংবাদ হিসেবে ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে—

ফটোস্ট্যাট ধুম

ঝিনাইদহ শহরের ফটোস্ট্যাট মেশিনের দোকানগুলোতে উপচে পড়ছে ভিড়। আগামীকাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু। নকলবাজরা তাই বইয়ের বড় বড় পাতা ছোট আকারে ফটোস্ট্যাট করে নিচ্ছে। কোতোয়ালি থানার আশপাশের দোকানগুলোতে ফটোস্ট্যাটের ধুম লেগে গেছে। গত বছর পরীক্ষা চলার সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলো বন্ধ রাখা হয়। এবার তাই আগেভাগেই চান্স নিচ্ছে নকলবাজরা। এদের তৎপরতায় অভিভাবকমহল শঙ্কিত।— ঝিনাইদহ প্রতিনিধি। *(প্রথম আলো, ৩ মার্চ ১৯৯৯)*

এর আগে প্রথম আলোতেই ছাপা হয়েছিল আরেক খবর :

নকলের হ্যান্ডবুক

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে পরীক্ষার্থীদের নকলের সুবিধার্থে নাটোরে প্রত্যেকটি বইয়ের দোকানে এখন পাওয়া যাচ্ছে ৪ ইঞ্চি বাই ২ ইঞ্চি সাইজের হ্যান্ডবুক 'সলিউশন গাইড'। এতে অফসেট মেশিনে ছোট হরফে ছাপা সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া আছে। এতে কোনো লেখক বা প্রকাশকের নাম নেই। দেদারসে বিক্রি হচ্ছে এই হ্যান্ডবুক। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে হ্যান্ডবুকের পাতা কেটে সহজেই নকল করা যায়।

একটা পরীক্ষা হলের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা সকালবেলায়। পরীক্ষা হলের চারদিকে ভিড়। এত ভিড় যেন হাট লেগে গেছে। হলের সিটে কুঞ্জকে বসিয়ে রেখে কায়সুল বাইরে এসে দাঁড়ায়। কতগুলো লিচুগাছ আছে এই সেন্টারের বাইরে। একটা গাছের নিচে সে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। পিঁপড়া আছে নাকি, মাটিতে আর গছের গায়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। বাইরে কয়েকজন পুলিশ বেঞ্চে বসে রোদের মধ্যেই ঝিমুচ্ছে।

এত ভিড় কেন পরীক্ষার হলের চারদিকে ? কায়সুলের অসহ্য লাগে। ওই যে দুটো ওষুধের দোকানে দুটো ফটোকপিয়ার মেশিন। আরো দুটো ফটোকপিয়ার মেশিন এসে গেল। রিকশা থেকে নামিয়ে ওই আমগাছ তলায় বসানো হচ্ছে। ব্যাপার কী ?

পানওয়ালা, শিঙ্গাড়াওয়ালা, চানাচুরওয়ালা, কার্বন পেপারওয়ালা, কাগজওয়ালা— এটা কি বাজার নাকি! ঢং ঢং ঢং। পরীক্ষা হলের ঘণ্টা বাজে। প্রশ্নপত্র এখন দিয়ে দেয়া হবে। দেয়া হবে কি, হয়ে গেছে। ওই তো ফটোকপিয়ারের দোকানে ফটোকপি হচ্ছে। প্রতিপ্রশ্ন ৫ টাকা। অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্নও এসে গেছে। হৈ হৈ রৈ রৈ ভাব। ও, তাহলে এরা সব নকল সরবরাহকারী।... নোটবই ছেঁড়ো রে। এই, এই প্রশ্নটার উত্তর লেখ। কপি কর কপি কর। ওই হারামজাদা, ফটোকপি করে নে। প্রতি পাতা ফটোকপি ২ টাকা ২ টাকা। নে-নে। দৌড় ধর।... সব সাপ্লায়ার দৌড়ে উঠে পড়ে বারান্দায়। জানালা দিয়ে নকল দেয়। দরজা দিয়ে দেয়। কী মোচ্ছব চলছে এখানে। ওই যে ওখানে অবজেকটিভ টাইপের উত্তরপত্রই চলে এসেছে। টিক দাও। টিক দাও। একজন পণ্ডিতব্যক্তিও এসেছেন। উনি হচ্ছেন অবজেকটিভ টাইপের বিশেষজ্ঞ। ক সেট, খ সেট, গ সেট— সব কটাতেই উনি ধামাধাম টিক দিয়ে দিলেন।

কায়সুলের মাথায় রোদ চড়চড় করে। এসব কী হচ্ছে! তাহলে তার ছেলেটা পড়াশোনা করে করলটা কী। এই হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে সে পরীক্ষা দেবে কীভাবে। কীভাবে সে ভালো রেজাল্ট করবে।

কায়সুল দৌড়ে হেডমাস্টারের রুমে যায়। হেডমাস্টার সাব, এসব কী হচ্ছে ? এত নকলের ছড়াছড়ি কেন ?

হেডমাস্টার এমনভাবে তাকান যেন ভারি অদ্ভুত উদ্ভট কথা শুনলেন। বলেন, বাইরে থেকে নকল সাপ্লাই দিলে আমরা কী করব ? ভেতরটা আমরা সামলাচ্ছি। পুলিশ তো কিছু করছে না।

রাগে দপদপ করে কায়সুলের মাথার রগ। সে বারান্দায় উঠে চিৎকার করে : খবরদার, খবরদার কেউ নকল সাপ্লাই দিতে পারবে না। খবরদার।

নকল সাপ্লায়াররা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। তারা বারান্দা ছাড়ে। পরে শুরু হয় ফিসফিসানি। লোকটা কে রে! এভাবে চিৎকার-চেঁচামেচি করে। একজন বলে, ও তো এখানকার ইনভিজিলেটর না। দে ওরে ধোলাই দে।

কতোগুলো মুরব্বি লোক এগিয়ে আসে। ও প্রফেসর সাহেব। এদিকে আসেন। আপনার তো ডিউটি না। আপনে চিল্লাচিল্লি করেন ক্যান ?

করব না। নকল হবে কেন ? নকল করে পরীক্ষা দিয়ে কী লাভ ? এডুকেশনের লক্ষ্য তো পাস করা না...।

কে রে লেকচার দেয়! এটা ক্লাসরুম না। ধর তো ব্যাটাকে।

কতগুলো তরুণ এগিয়ে আসে। তারা পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কায়সুলকে। স্কুলের পেছনে বিরাট পুকুর। পুকুরে টলমল করছে জল। কায়সুলকে সোজা ছুড়ে মারে পানিতে।

কায়সুল সাঁতার জানে। সুতরাং উঠে আসতে তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু আকাশে গনগন করে সূর্য, আকাশ নীল, পানিতে কাপড়চোপড় সব ভেজা, পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কতগুলো মানুষ, দাঁত বের করে হাসছে সব...

কায়সুলের মাথা হেঁট হয়ে আসে।

(*ফাল্গুনের রাতের আঁধারে* উপন্যাস থেকে)

দেশটা তবু টিকে আছে কীভাবে

দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। শুধু-যে পরীক্ষার্থীরা নকল করে তা-ই নয়; তাদের আত্মীয়স্বজন, অভিভাবক, গৃহশিক্ষকরা মিলে তাদের নকল সরবরাহ করে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা আবার 'নির্বিঘ্ন নকল' নিশ্চিত করার দায়দায়িত্ব নেয়। আর শিক্ষকেরা চাঁদা তোলে ম্যাজিস্ট্রেটদের খুশি করার জন্য।

তার মানে আর ভরসা করা যাবে কার ওপরে। বাকি থাকল কে ? শিক্ষকসমাজ যদি তার মেরুদণ্ডের জোর হারিয়ে ফেলে, তবে আর কোনো আশা থাকে না। তবু এ দেশটা টিকে আছে কী ভাবে ? কেন এই দেশে সূর্য ওঠে ? বাতাস বয় ?

সম্ভবত এ নষ্টভ্রষ্ট দেশে এখনো রয়ে গেছে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী, যারা প্রকৃত জ্ঞান আহরণের জন্যই পড়ে। শুধু সিলেবাসের বই নয়,এর বাইরের বইয়েও ঢুঁ মারতে তারা ছাড়ে না। সংখ্যায় কম হলেও জাতির প্রাণটুকু তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে, জাতির ভবিষ্যতের আশাটুকু তারাই ধরে রেখেছে।

প্রথম আলো, ৪ মার্চ ১৯৯৯

এবারের ঈদের ফ্যাশন

এবারের ঈদের ফ্যাশনে যে শীতের প্রভাব পড়বে, ফ্যাশন ডিজাইনাররা অবশ্য সে কথা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন। ফলে মেয়েদের কোন্ শাড়ির সঙ্গে কোন্ শালটা মানাবে ভালো এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা! তারপর লোকে যাই বলুক না কেন আমাদের ডিজাইনাররা আসলেই সৃষ্টিশীল আর উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী।

কিন্তু একটা প্রবলেম থেকেই যায়। আমাদের শীত কিন্তু খুব অল্প কদিনের ব্যাপার। ভুলে গেলে চলবে না এটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। আর হিউমিডিটিও খুব বেশি। শীতের ফ্যাশন আপনি করতে পারেন বড়জোর দুদিন কিংবা তিনদিন।

হ্যাঁ, এ মন্তব্যের পেছনে সত্যতা আছে। সত্যি বলতে কী, ইশ এবছর দেখি শীতই পড়ছে না! আমার উইন্টার কালেকশনের কী হবে! হায় হায় ইন্ডিয়া থেকে এত সুন্দর সুন্দর সোয়েটার এনেছি, আপনাকে কী বলব এখন মনে হচ্ছে ওয়ারড্রবেই রয়ে যাবে।

তো সবারই এক চিন্তা। শীতের সঞ্চয় চাই, খাদ্য কিনিতেছি তাই, ছয় পায়ে পিলপিল চলি। পিপীলিকারও আছে নিজস্ব শীত-ভাবনা। আমাদের ফ্যাশন-ডিজাইনারদেরও আছে। আমাদের ভোক্তা সমাজেরও আছে। আসন্ন শীতের জন্য তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন দীর্ঘ দীর্ঘ দিন। তারপর শীত কেন আসছে না, ইশ দেশটার উন্নতি হবে কী করে, যে দেশে তুষার পড়ে না! ইত্যাদি।

তারপর! 'আয় শীত আয় শীত' বলে আমাদের প্রার্থনা।

ওদিকে ঈদ আর শীত মিলেমিশে এসেছে। সেটা একটা উপরি পাওনা। এখন শুধু পাঞ্জাবি বা পায়জামা নয়, সঙ্গে আপনার বিক্রি হচ্ছে কটি বা ওড়না। আরে, হ্যাঁ, পুরুষদের পাঞ্জাবির সঙ্গেও ওড়নার চল হয়েছে। এখন ছেলেরাও গান গাইছে :

লাল দোপাট্টা অঙ্গে আমার থাকতে চায় না
বন্ধু আমার ও দরিয়া
রাখ না আমায় তুই ধরিয়া
জুড়িয়ে দে মোর যৌবন জ্বালা আদর সোহাগ করে।

এর ফলে কাপড়ের বিক্রি বাড়ছে। আগে যেখানে বিক্রি হতো টুপিস, এখন সেখানে থ্রিপিস ফোরপিস।

আর শীতকালের সুবিধাও অনেক।

যেমন—খাওয়া-দাওয়ায়। এত ভেরিয়াস কাইন্ড্স অফ সবজি পাওয়া যায়। আর ধরুন মিনিটে মিনিটে খাবার নষ্ট হয় না।

অতএব পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়। ডালা যে আজ ভরে গেছে ফ্যাশন হাউজে ওরে আয় আয় সাজ।

তবে অর্থনীতির ফ্যাশনবিদ আতিউর রহমান বলেন...

> বৃহত্তর রংপুর ও ময়মনসিংহের যমুনা, ব্রহ্মপুত্র পারের মানুষরাই বেশি সংখ্যায় শহরে এসেছেন। বরিশালেও নদী ভেঙেছে বলে কিছু মানুষ এসেছেন ঢাকা শহরে।
>
> আয়ের অভাব বলেই তারা এসেছেন। বাঁচার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার পর তারা শহরে এসেছেন। তারা আশা করছেন আয়-উপার্জন করে মহাজনের ঋণ শোধ করে দেবেন। তবে সে ঋণ গড়ে ৩০০ টাকার বেশি নয়। কিন্তু সুদ খুবই চড়া। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট অন্য এলাকা থেকে বেশি। উন্নত এলাকার অর্থনীতি খানিকটা শক্ত বলে বিনিময় প্রক্রিয়াতেই অনেককে কাজের সুযোগ করে দিতে পারে। কিন্তু পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার অর্থনীতি এতটাই শক্ত (fragile) যে সেখানে কাজ হতে পারেন যারা তারাও বিপর্যস্ত। আর সে কারণেই অসহায়ত্ব এখানে বেশি। এ এলাকাগুলোর ওপর বিশেষ নজর বা এজন্য আলাদাভাবে পুনর্বাসন চিন্তা থাকা উচিত। বিশেষ করে আসন্ন শীতে তাদের কাবু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনিতেই অনেকের বাড়িঘর নেই। অপুষ্টির কারণে শরীর দুর্বল। তাই শীতের আক্রমণ তীব্র হলে তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা মুশকিল হবে। এদের কথা ভেবে কি আমরা এখনি শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণের কাজটি শুরু করে দিতে পারি না? বন্যার সময় যেমন মানুষের জন্য মানুষ এগিয়ে এসেছে, শীতার্তদের জন্যও তেমন সামাজিক উদ্যোগ আশা করা কি খুব অন্যায় হবে? *(প্রথম আলো, ১ নভেম্বর ১৯৯৮)*

বেলাল বেগের কছেও এলাকাবাসী বলেছিল একই কথা।

৭ নভেম্বর ১৯৯৮, যখন বেলাল বেগ কুড়িগ্রামের মঙ্গাপীড়িত এলাকা সফর করেন এলাকাবাসী তাকে সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিল :

> 'সারাডোবের বিশাল চরাঞ্চল যা ফসলের সম্ভারে ভরে যেত এখন সম্পূর্ণ বিরাণ খাঁ খাঁ করছে। কৃষকেরা তিনবার ধান লাগানোর চেষ্টা করেছে।

কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি সব পচিয়ে দিয়েছে। ক্ষুধায় অনেকে ধান গমের সামান্য বীজও খেয়ে ফেলেছে।

চেয়ারম্যান আজিজুল সাহেবও স্বীকার করলেন কেউ এ যাবৎ অনাহারে মারা না গেলেও বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না হলে কেউ দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কেবল তার হোলখানা নয়, যাত্রাপুর, পাঁচগাছি, মোঘলবাছা, ভোগাদহ, ভোগডাঙ্গা অর্থাৎ ঐ থানায় ৮টি ইউনিয়নের ৬টির অবস্থা একই রকম— খুবই খারাপ। অন্য সূত্রে জানা গেছে, একই রকম দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছে ধরলার দক্ষিণ তীরের সমস্ত অঞ্চলে। এ অবস্থায় সপ্তাহখানেক পরেই নামবে ভয়ানক শীত। মানুষ এখন দিশেহারা। *(বেলাল বেগ, প্রথম আলো, ৯ নভেম্বর ১৯৯৮)*

যখন শীত এল (দি কোল্ড)।

তারপর শীত আসে। উত্তরাঞ্চলের ধুধু প্রান্তরে সূর্য ওঠে কি ওঠে না। সারা সকাল সারা দুপুর সারা বিকেল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা কুয়াশা। ধুলি-ধূসরিত বাতাসে ভর করে নামে কুয়াশার শাদাটে চাদর। তখন মনে পড়ে যায় গত মঙ্গায় মারা যাওয়া কছিমুদ্দির লাশটা এমনি শাদা এক কফিনে ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

রাত নামে ভালুকের থাবার নিচে। হু হু করে আসে শীতের বাতাস। রহিমা খাতুনের ছোট চালা। তাতে খড় নেই। চাল ফুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে চায় চাঁদের আলো, কুয়াশার কাফন ফুঁড়ে সেই আলো ঠিকভাবে পৌঁছায় না। বেড়ায় চাটাই নেই, হু হু করে বাতাস আসে। খড় বিছিয়ে ছিন্ন কাঁথায় তারা বাঁচতে চায় তীব্র শীত থেকে। পেটে ভাত নেই। কেননা স্বামী বিদেশে আজ তিনমাস। দুটি বাচ্চা আলী (৩) আর আব্বাস (৫)। তারা মায়ের শরীরের ওমে গুটিসুটি ভাগ বসাতে চায়। শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে রহিমা বোঝে তার হাতপা জমে গেছে। নড়াতে পারছে না। কোথাও প্রচণ্ড শীতে একটা কুকুর কাঁদছে।

একটু উঠে যে খড়পাতা জ্বালাবে—রহিমার শক্তি নেই। সে হাত বাড়াতে চায়। হাত নড়ে না। তার বুকের মধ্যে লেপ্টে আছে দুটো শিশু।

সেই শরীর দুটোতে রক্ত এখানো উষ্ণ কিনা, নাকি তারা জমাট বেঁধে গেছে, রহিমা জানে না।

তারপর...

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, গত দুদিন ধরে শৈত্য প্রবাহে সাতক্ষীরায় ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সারাদিন অধিকাংশ সময় সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। গত দুদিন ধরে সন্ধ্যার পরপরই শহর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড শীতের কারণে।

নীলফামারী প্রতিনিধি জানান, জেলার হতদরিদ্র মানুষ কনকনে শীতে চরম উৎকণ্ঠায় পড়েছে। জীর্ণ কুটিরের ভাঙা বেড়া দিয়ে হু হু করে হিম শীত ঘরে ঢুকে পড়ায় প্রতিদিন শত শত মানুষ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে এযাবৎ নীলফামারীতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতজনে। মৃতরা হলো সদর থানার কচুকাটা ইউনিয়নের দেনদুড়ি গ্রামের মতিয়ার (৫৫), একই গ্রমের সর্জির

উদ্দিন (৭৫), ডোমরা থানার...সদর থানার জয়চণ্ডি গ্রামের দীনেশবাবুর সাত বছর বয়সের পুত্র মিঠুন, কচুকাটা গ্রামের দিনমজুর আবদুল বারীর শিশুকন্যা ফালাদি (১)।

(প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৯)

আসুন বিতর্ক করি

এরা শীতে মরেছে নাকি রোগেঅসুখে মরেছে, নাকি মরেছে দারিদ্র্যে-অনাহারে—আসুন এই নিয়ে বিতর্ক করি। শীতে মরলে প্রকৃতির দোষ, আমরা দায়মুক্ত হই। অসুখে মারা গেলে তার স্বভাবের দোষ, কেননা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা ব্যক্তির নিজের দায়। দারিদ্র্যে আর অনাহারে মারা গেলে—না না, কেউ অনাহারে মারা যায়নি।

কেন মারা যাবে? ভিজিএফ কার্ড দেয়া হয়েছে। এনজিওরা কাজ করছে। ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। ভাতের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

কিছু লোক এমন মরবেই। এই মৃত্যু নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কী আছে?

ঢাকা শহরেও কিন্তু ফুটপাতে ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। বাংলামটর-সোনারগাঁও মোড়ের পার্কটি গত তিনমাসে কীভাবে উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে কালো হয়ে গেল চোখের সামনে। সন্ধ্যা হলে খড়কুটা জ্বালিয়ে তারা ভাত চড়ায়। ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে।

ঢাকা শহরে শীত ঢুকতে পারে না নানান কারণে। তবু এই শীতে হে ফুটপাতে শায়িত শিশু, তুমি কেমন করে রাত্রি কাটাও!

এবারের ঈদের ফ্যাশন

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের মধ্যে সেভাবে শীত ঢুকতে পারে না। বাইরে হাওয়া বইছে কন কন। জানালা খুলে দিই। শীতের কামড় এসে লাগে গায়ে। লেপের নিচে শুয়ে পড়ি। মাথা ঢেকে রাখি।

তারপর...তারপর..নীলফামারীর কচুকাটা গ্রামের দিনমজুর আবদুল বারীর এক বছর বয়সী মেয়েটি, যে শীতে কুঁকড়ে জমে একসময় শক্ত হয়ে গেছে, আর তারপর শুয়ে আছে মাটির নিচে, তার পরনের শাদা কাপড়টা বড় হতে থাকে। যেন সে সারা দেশের ১৩ কোটি মানুষকে ঢেকে দিতে চায়। তার মুখে বোল ফোটে না, তবু যেন সে বলতে চায়— প্রাণটুকু ধড় ছাড়ার আগে যে কষ্ট আমি পেয়েছি; বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষ, গাছতলায় থাকা মানুষ, ভাঙাঘরে থাকা মানুষ— তোমরা সবাই যেন সেই কষ্টটুকু থেকে মুক্ত থাকো। তোমরা সবাই যেন ভালো থাকো, জীবনের ওমটুকু ভাগাভাগি করে নিতে পারো।

কবরের ওপরে কাঁচামাটি। শিয়রে খেজুরের একটা কাটা ডাল। তাতে শিশির। কাঁচামাটিও ভেজা ভেজা। তার চারপাশে দুর্বাঘাসের ডগায় ডগায় শিশির। কুয়াশায় ঢাকা আকাশ। নিস্তব্ধ গাছ। অধোমুখী পাতা। গাছের নিচে ঝরে পড়া হলুদ পাতা।

আর এক চাঁদ। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। আর কুয়াশা। শাদা। কাফন। ঘুমোয় ফালাদি (১)।

প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ১৯৯৯

আগুন আবিষ্কার

মানুষ যেদিন পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাল, সেদিন থেকেই মানুষ আলাদা হয়ে গেল পশুদের থেকে। তার আগে মানুষ তো প্রায় পশুই ছিল। বনে-জঙ্গলে থাকত, থাকত গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায়। গাছের পাতা-ছাল পরত, আর খেত গাছের ফলমূল।

কিন্তু একদিন সে আবিষ্কার করতে পারল আগুন।

গাউডাং পাহাড়ের কোলে আছে একদল মানুষ। তাদের বড় বড় চুল, বড় বড় নখ। তারা প্রায় উলঙ্গই থাকে। দলে-বলে থাকে। পালে পালে চড়ে বেড়ায়। বিয়ে-শাদির ব্যাপার নেই। নারী-পুরুষ পাশাপাশি থাকে, নারীরা একসময় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বাচ্চার বাবা কে, আলাদা করা যায় না।

ওই আদিম মানুষদের মধ্যে দুটো দল। নইখাং আর মইখাং। কেন যে তারা এই দুইভাগে বিভক্ত কেউ জানে না। শুধু এই মানুষেরা জন্মের পর দেখতে পায়— তাদের কেউ নইখাঙের দলে, আর কেউ বা মইখাঙের দলে। আর দেখতে পায় নইখাঙের সঙ্গে মইখাঙের লড়াই।

মইখাঙেরা থাকে পাহাড়ের পূর্বপাশে, আর নইখাঙেরা থাকে পাহাড়ের পশ্চিমপাশে। মধ্যখানে আছে একটা ঝরনা। এখন শীতকাল বলে ঝরনায় পানি কম। ফলে প্রায়ই নইখাঙের লোকেরা ঢুকে পড়ে মইখাঙের এলাকায়। মইখাঙের লোকেরাও চলে আসে শত্রু-এলাকায়, কখনো কখনো। এলেই বিপদ। প্রহরারত শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুপ্রবেশকারীর ওপর। মুহূর্তের মধ্যে ভারী পাথরখণ্ড এসে পড়ে অনুপ্রবেশকারীর শরীরে। মৃত্যু ঘটে সঙ্গে সঙ্গে। তখন ওই লাশের চামড়া ছিলে মাংস খাওয়া চলে পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে।

জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতে পারলেও হয়। তখন গাছের ডালে লতাপাতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয় শত্রু-সদস্যের শরীর। আর একটা একটা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়িয়ে টেনে-ছিঁড়ে খায় বিজয়ীপক্ষ।

এই চলছিল নইখাং আর মইখাংদের।

হঠাৎ করে, ভিনগ্রহ থেকেই বুঝিবা, একপাত্র পেট্রল আর একটা দিয়াশলাই এসে পৌঁছে মইখাংদের হাতে। ভিনগ্রহের আগন্তুকটি একজন মইখাংকে শিখিয়ে দেয় দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার। আর পেট্রল দিলে কী করা যাবে।

ভিনগ্রহের আগন্তুক এই ক্যানিব্যালদের পেট্রলের আসল ব্যবহার বোঝাতে পারে না। কারণ সভ্যতাবঞ্চিত এই এলাকায় ইঞ্জিন নেই। অগত্যা ভিনগ্রহের আগন্তুক বোঝায় যে, পেট্রল একটা দাহ্যবস্তু। এটাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরলে বেশ আগুন জ্বলে ওঠে।

মইখাংরা আগুনকে করায়ত্ত করতে পারেনি বটে, কিন্তু আগুন তারা দেখেছে। কিছুদিন আগে একটা দাবানল সৃষ্টি হয়েছিল। বনের পশুপাখি সব পুড়ে মরে সাফ হয়েছিল। তবে অর্ধদগ্ধ একটা হরিণ এসে পড়েছিল মইখাং এলাকায়। সেই মাংস খেতে বড় ভালো লেগেছিল।

ভিনগ্রহের আগন্তুক বিদায় নিলে মইখাংরা বিপদে পড়বে। এই দিয়াশলাই আর পেট্রল দিয়ে তারা কী করবে।

বহুদিন দিয়াশলাইটি আর পেট্রলভরা পাত্রটি পড়েছিল অযত্নে। আজ একটা ব্যবহারের সুযোগ মিলেছে। একটা নইখাং ধরা পড়েছে।

নইখাংটাকে বাঁধা হলো গাছের সঙ্গে। খুব শক্ত করে। তার চোখদুটো পিটপিট করছে। সে বলল, ছিচিং টং স্কু ফু। মানে হলো : পানি পানি।

মইখাংরা হৈ করে উঠল। এখন তারা এই শিকারটার চারদিক ঘিরে নাচানাচি করবে। তারপর তারা ধারালো পাথর দিয়ে আঘাত করে থেঁতলে চাপ দিয়ে নইখাংটার হাত খুলে নেবে, পা কেটে নেবে। তারপর যার ভাগে যতটুকুন পড়ে হৈচৈ করে নইখাঙের মাংস খাওয়া চলবে।

তখন হঠাৎই মনে পড়ল পেট্রল আর দিয়াশলাইয়ের কথা। পেট্রল আনা হলো। বেঁধে-রাখা নইখাঙের গায়ে পায়ে চুলে ঢালা হলো পেট্রল।

নইখাংটা কিছুই বুঝছে না। সে ডাকছে—ম, ম, ম। অর্থাৎ মা, মা, মা।

মইখাংরা হেসে ফেলল। এত বড় লোক মাকে ডাকে কেন ?

এবার দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানো হলো। তারপর সেই অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করা হলো নইখাঙের গায়ে। মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল আগুন।

নইখাঙের হাত পুড়ছে, পা পুড়ছে, সারাদেহের রোম পুড়ে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে, এইতো এইমাত্র জ্বলে উঠল চোখের পাপড়ি, ভ্রূ, চুল। চামড়া জ্বলে গেল, মাংস বেরিয়ে পড়ছে, চর্বি গলে টগবগিয়ে ফুটছে, পুড়ছে, মুখের মাংস পুড়ে বেরিয়ে পড়ছে ভেতরের শাদা দাঁত...

মইখাংরা উল্লাস করছে, ওলে ওলে ওলাং....

এবার পড়ুন নিচের খবরটি :

হরতালকারীরা পুড়িয়েছে রিকশাসহ চালককে, বোমায় উড়ে গেছে শিশুর দুই হাতের আঙুল।

মেডিকেল প্রতিবেদক

হরতাল সমর্থক পিকেটাররা রিকশাচালক মোহাম্মদ আলীর গায়ে পেট্রল ঢেলে রিকশাসহ পুড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে ফেলে-রাখা হাতে-বানানো বোমা কৌতূহলের বশে খুলতে গিয়ে শিশু আজিমের দুহাতের সবগুলো আঙুল উড়ে যায়। নির্মম ঘটনা দুটি ঘটেছে যথাক্রমে পুরান ঢাকার প্যারিদাস রোডে এবং পশ্চিম তেজতুরি বাজারে।

বৃদ্ধা মা নূর বেগম, অন্ধ বাবা ওসমান আলী মোল্লার একমাত্র সন্তান রিকশাচালক মোহাম্মদ আলীর দরিদ্র পরিবার। মা-বাবাকে নিয়ে সে থাকত কেরানীগঞ্জ থানার মিরেরবাগের জনৈক আবদুল হাই ঢালীর বস্তিতে।

হরতাল জানা সত্ত্বেও পেটের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোহাম্মদ আলী গতকাল সকালে রিকশা নিয়ে বের হয়। সূত্রাপুর থেকে দুই যাত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল পুরান ঢাকার কোর্ট-কাছারির দিকে। সকাল আনুমানিক ১০টায় প্যারিদাস রোডের সিংটোলায় পৌঁছুলে হরতাল-সমর্থক পিকেটাররা

রিকশাটি ঘিরে ফেলে। তারা যাত্রীদের রিকশা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে দিয়ে রিকশাসহ মোহাম্মদ আলীকে ঘেরাও করে। যুবকরা কনটেইনার থেকে মোহাম্মদ আলীর সারা শরীরে পেট্রল ঢেলে দেয়। পেট্রল মাখা হয় তার রিকশাটিতেও। একপর্যায়ে তারা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে রিকশায় এবং মোহাম্মদ আলীর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে রিকশা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গুরুতর দগ্ধ হয় মোহাম্মদ আলী।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বার্ন ইউনিটের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, মোহাম্মদ আলীর শরীরের ৬৫ শতাংশ পুড়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। *(প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৯)...*

প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৯

কাষ্ঠরাজার রূপকথা

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার নাম ছিল কাষ্ঠরাজা। তার ক্ষমতার উৎস ছিল তার ডান হাতের তর্জনী। যে জায়গাতেই ডানহাতের তর্জনী ছোঁয়াতো, সে জায়গাই হয়ে পড়ত কাঠের। ইচ্ছে করে তর্জনী বুলিয়ে সে কাঠে পরিণত করল সিংহাসন। তার হাতের ছোঁয়া লেগে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কাঠে পরিণত হয়ে গেল রাজপ্রাসাদ। আর ঘোড়াটায় একদিন হঠাৎ লেগে গেল তার তর্জনী। অমনি সেটা হয়ে গেল কাঠের ঘোড়া। তখন দুঃখে রাজা নিজেই ছিঁড়তে লাগল নিজের চুল। আর তার চুলের যে অংশে অংশে তর্জনীর ছোঁয়া লাগল, সেই অংশটুকু পরিণত হয়ে গেল কাঠের চুলে।

রাজা তখন খুঁজতে লাগল উপায়। কী করা যায়। কী করা যায়। রাজার পাত্র-মিত্র-অমাত্যেরা সবাই ভাবতে লাগল। শুরু হয়ে গেল ভাবার প্রতিযোগিতা। ভেবে কি আর সমস্যার সমাধান করা যায়!

তখন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, কষ্ট করে ভেবেটেবে সমস্যার সমাধান করার দরকার কী ? এর চেয়ে এই উদ্ভট রাজাকে সরিয়ে দিলেই তো হয়।

রাজার গুপ্তচর রাজাকে জানাল এই দুঃসংবাদ। আপনার সভাসদদেরই কেউ কেউ উল্টোপাল্টা ভাবছে। রাজা দেখলেন, ভারি বিপদ তো। তিনি তখন ডাকলেন সব পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের। তাদের প্রত্যেককে ছুঁয়ে দিলেন তার ডান হাতের তর্জনী। আর অমনি সবাই হয়ে গেলো কাঠের পুতুল। রাজা তার নাম দিলেন রাজ্য-সংসদ। এখন সেটা হয়ে গেল তার ইচ্ছার অধীন। মন্ত্রীদের ডেকে ডেকে তিনি ছোঁয়ালেন করাঙুলি। মন্ত্রীরাও সবাই হয়ে গেল কাঠের পুতুল।

কিন্তু তখন বিপদ দেখা দিল সৈন্যদের তরফ থেকে। তারা ভাবল, আমরা হলাম জ্যান্ত সৈনিক। আর ওরা হলো কাঠের মন্ত্রিসভা, কাঠের সংসদ। আমাদের কর্তব্য হলো এদের সবাইকে উৎখাত করা, সৈন্যশাসন জারি করা। তখন রাজা ডাকলেন সেনাপতিকে। আর তাকে ছুঁয়ে দিলেন তার সেই আঙুল, অমনি সেনাপতিও হয়ে গেল কাঠের সৈনিক।

সৈন্যেরা যখন ঘুমিয়ে রইল শিবিরে, রাত্রিবেলা, রাজা চুপিচুপি গেলেন সেখানে। তারপর একটার পর একটা সৈন্যের গায়ে বুলিয়ে দিলেন তার জাদুকরি আঙুলটি। তখন সব সৈন্য পরিণত হলো কাঠের সৈন্যে।

আর কোনো বিপদ নেই! রাজা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বিপদ-সংকেত বেজে উঠল। বিদ্যামন্দির থেকে সব অধ্যাপকেরা বিবৃতি দিতে লাগলেন এই কাষ্ঠল শাসনের বিরুদ্ধে। তারা রাজার কাজের ভুলত্রুটির সমালোচনা শুরু করলেন শতমুখে, চুন থেকে পান খসবার উপায় পর্যন্ত রইল না। রাজা বললেন, যারা যারা আমার স্নেহ পেতে চাও, আমার সঙ্গে দেখা কর। আমি তোমাদের দেব দেশের সেরা বিদ্যামন্দিরের আচার্যের পদ, দেব এখানে-ওখানে নানা একাডেমির পরিচালকের সম্মান, আর তোমাদের নিয়ে যাব মৃগয়ায়।

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সব প্রতিবাদী বুদ্ধিসুন্দরেরা ভিড় করল রাজদরবারে। রাজা সবাইকে আশীর্বাদ করলেন নিজ হাতে, প্রত্যেকের মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহের করস্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে সব চিন্তাবিদের মগজটুকুন পরিণত হয়ে গেল কাঠে।

সবদিক থেকে রাজা এখন বিপদমুক্ত।

দেশে উন্নতির জোয়ার বয়ে যেতে লাগল।

এমনকি বিদেশী সৈন্যের আক্রমণ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারল না সামান্য বিপদ। কারণ রক্তমাংসের শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হলো কাঠের সৈন্যেরা, তরবারির আঘাতে তারা টলেও না, কাতরায় না। তাদের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল শত্রুরা।

তবু এই রাজা চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারল না। হায়, সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল!

এই রাজ্যে এল একজোড়া অতি ক্ষুদ্র ঘুণপোকা। এত চমৎকার সব কাষ্ঠখাদ্য দেখে তাদের খুশি আর ধরে না। তারা কুরে কুরে খায় সিংহাসন, রাজপ্রাসাদ; আর বংশবৃদ্ধি করে মনের সুখে। খুব তাড়াতাড়িই। ঘুণপোকার সংখ্যা-বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

ঘুণপোকা গেল মস্তিষ্কজীবীদের কাঠের মগজে। কুরে কুরে খেয়ে তাদের মাথাটাকে পরিণত করল নিছক খোলসে। ভেতরে কিছুই নেই, বাইরে থেকে দেখা যায় দশাসই মস্তক।

তাদেরই বুদ্ধি-পরামর্শে চলতে লাগল রাজ্য। কতদিনই বা চলতে পারে এভাবে।

একদিন ধড়াম করে ভেঙে পড়ল সিংহাসন। ঘুণপোকারা একেবারে ঝাঁঝরা বানিয়ে ফেলেছিল সিংহাসনটাকে। আর তাতে বসা ছিলেন স্বয়ং রাজা। কিন্তু রাজা যেই ধপাস করে পড়লেন, অমনি তার ভেতর থেকে বেরুতে লাগল কাঠের হলুদ মিহি গুঁড়া। হায় হায়, ভেতরে কিছু নেই। পুরোটাই খেয়ে ফেলেছে ঘুণপোকায়।

এইভাবে কাষ্ঠরাজা গেল, কাষ্ঠমন্ত্রী গেল, কাষ্ঠ-সংসদ গেল, কাষ্ঠ সৈন্যবাহিনী গেল— সবকিছুই গেল বাতিলের তালিকায়।

তখন রক্তমাংসের মানুষেরা এসে কায়েম করল সপ্রাণতার রাজত্ব।

প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

একটি চিঠি

ডাকযোগে একটা চিঠি এসেছে। পত্রলেখকের নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা নেই। চিঠিটা মর্মস্পর্শী। ভাষার কিছু রদবদল করে এখানে ছাপিয়ে দিচ্ছি। মতামত বা তথ্য বা বিশ্লেষণ পত্রলেখকের নিজস্ব। এজন্যে গদ্যকার্টুন লেখক বা এই পত্রিকার সম্পাদক দায়ী নন। তবে যাদের জন্যে এ চিঠি ভদ্রলোক লিখেছেন, তারা যদি চিঠিটি পড়েন এবং নিজেদের কাজকর্মের পুনর্মূল্যায়ন করেন, তবে দেশের মঙ্গল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পরম শ্রদ্ধেয় আপা,

আমার সালাম ও স্নেহাশিস গ্রহণ করুন।

আমি একজন গরিব মানুষ। লেখাপড়াও বেশি করিনি। আমার প্রতিবাদ আমার নিজের কাছেই। আমি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকেই জুতা পরা বন্ধ করি। প্রতিজ্ঞা করি, যতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচার না হবে, ততদিন পর্যন্ত জুতা পরব না, খালিপায়েই থাকব। আমি সেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসিনি। বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়েছে, আগে রায় কার্যকর হোক, তারপর ইনশাল্লাহ পাপ ও শাপমুক্ত বাংলার মাটিতে জুতা পায়ে চলাচল করব।

তবে আপা ১৯৯৬ সালে যেদিন আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, সেদিন আশায় বুক বেঁধেছিলাম। ভেবেছিলাম, এইবার দেশে একটা সত্যিকারের জনগণের সংগঠন ক্ষমতাসীন হতে পেরেছে, সত্যিকার রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনা করতে যাচ্ছে। গণতন্ত্র এখন শুধু নামেই নয়, কার্যক্ষেত্রেই দেখা দেবে।

ক্ষমতা গ্রহণের আগে-পরে আপনি বারবার বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোই আপনার কর্তব্য-তালিকার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কাজ। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই মানুষ এই বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে।

মানুষ হতাশ হয়ে পড়লেও আমি হতাশ নই। সাধারণ মানুষ কাজী আরেফ আহমেদ হত্যাকাণ্ডের পরপরই উদীচী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মুষড়ে পড়েছে। এজন্য অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও বদল ঘটেছে। কেউ বা হতাশ হয়েছে রুবেল হত্যাকাণ্ডের পর ডিবি অফিসে পানির ট্যাঙ্কে লাশ পাওয়ার ঘটনায়।

আমি কিন্তু এসব ঘটনাতে উদ্বিগ্ন বোধ করেছি। শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। আওয়ামী লীগের শত্রুর অভাব নেই। চারদিকে শত্রুদের নানা অপতৎপরতা মোকাবিলা করেই আমাদের চলতে হবে, সে প্রস্তুতি ও মনোবল নিশ্চয় আপনার আছে।

বাইরের ঘটনায় আমি হতাশ নই। আমি হতাশ ভেতরের ঘটনায়। সে-কথাটা বলার জন্যই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। জানি না, এই চিঠি ছাপা হবে কিনা।

গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকা নেড়েচেড়ে ঘেঁটে আমি এ হতাশাজনক ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভয়ে শঙ্কায় আতঙ্কে লজ্জায় মরে যেতে বসেছি।

ছাতকে একজন এমপির বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে প্রাণহানি ঘটেছে। পত্রপত্রিকাগুলো লিখেছে বোমা বানাতে গিয়েই ঘটেছে এ বিস্ফোরণ। শুধু তাই নয়,

সেনাবাহিনী তার বাড়ি থেকে ২০০টির মতো বোমা ও বোমা বানানোর মাল-মশলা উদ্ধার করেছে। এই এমপি কোন্ দলের ? আওয়ামী লীগের।

ফেনীতে ইনডোর স্টেডিয়ামের ছাদ ধসে ঘটেছে ব্যাপক প্রাণহানি ও অঙ্গহানি। এই স্টেডিয়ামটি বানানো হচ্ছিল সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে, টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার ছাড়া! এই অনিয়মের হোতা কে ? পত্রপত্রিকা লিখেছে এটার পেছনে আছে ফেনীর বিখ্যাত হাজারি— সরকারি দলের এমপি।

ঢাকায় বিরোধীদলের হরতালের দিন সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে বিএনপির মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণে মারা গেছে ছাত্রদল নেতা সজল। এই মিছিলে গুলিবর্ষিত হয়েছে আলহাজ মকবুলের নেতৃত্বাধীন মিছিল থেকে! আলহাজ মকবুল কে ? সরকারি এমপি!

এর আগে ঢাকার রাজপথে দেখা গেছে নাইনশুটার। এই নাইনশুটারঅলা নাকি ঢাকার আরেক হাজী এমপির বডিগার্ড। এই এমপি কোন্ দলের ? সরকারি দলের।

আপাজান, আমি মূর্খ মানুষ। বিদ্যাবুদ্ধি কম, জ্ঞানগম্যি কম। আমি যতদূর জানি, এমপিরা হলেন আইন আইনপ্রণেতা, ল-মেকার। তারা আইন প্রণয়ন করবেন। আর সংসদে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করবেন, জাতিকে দিকনির্দেশনা দেবেন, সরকারের কাছে জবাব চাইবেন। তাদের কোনো নির্বাহী দায়িত্ব থাকার কথা নয়। যদিও এদেশের গরিব জনসাধারণ এমপিদের কাছে বহু কিছু আশা করে— ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল।

যাই হোক, যারা শুধুই ল-মেকার, যাদের নির্বাহী ক্ষমতা থাকার কথা না, তারা ইদানীং নির্বাহ করছেন! কী নির্বাহ করছেন ? নির্বাহ করছেন নিজবাড়িতে বোমা বানানোর কর্ম, সরকারি নিয়মভঙ্গ করে নির্মাণকাজ তদারকি, অস্ত্রবাজি, গুলিবর্ষণ। এরা কোন্ দলের ? সরকারি দলের।

আমি এই জায়গাতেই হতাশ। এই যদি হয় সরকারি দলের এমপিদের চালচলন, আচার-আচরণ; দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা পাবে কী করে! মাছের সমাজের মতো করে কি আমাদের দেশ চলছে ?

আপা গো, আমি এখনো জুতা পরি না। বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিচার সম্পন্ন হওয়ার পরই পরব, ইনশাল্লাহ। তবে, আমার মনের আশা, যে-কথা আপনি বলেছিলেন— দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েই হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে হবে— এটা আমারও মনের কথা। আপা, যে অবস্থা দেশে সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি আর কোনো আশা দেখি না। একুশটা বছর বেঁচে ছিলাম যে আশায়, সেই আশার বাতিগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে। আমি এখন নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে মুখ দেখাতে লজ্জা পাই। তারা বলে, 'কী হল, তোমার আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় ! দেশের উন্নতি হলো!'

আমি এতদিন মুখে মুখে জবাব দিয়ে এসেছি। বলেছি-দেখো ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হয়েছে, পার্বত্য এলাকায় শান্তি এসেছে, বিদ্যুৎও আসবে। এখন আর জবাব খুঁজে পাই না।

আওয়ামী লীগের নেতা-এমপিরাই যদি এসব করে— দেশের মানুষের আর কোনো আশা করার জায়গা নেই।

আপা, আওয়ামী লীগ ছাড়া আমাদের ভরসা করার আর কোনো জায়গা নেই। আপনি আমাদের সেই আশার জায়গাটা বাঁচিয়ে রাখুন। না হলে, আত্মহত্যা করা ছাড়া আশার আর কোনো পথ নেই।

ইতি

আবদুস সালাম

প্রথম আলো— ১ এপ্রিল, '৯৯

এমডি ইন্টারভিউ গাইড

এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস— কথাটা টি এস এলিয়টের। এ-কথা হাশেম আলির জানার কথা নয়।

তবু এপ্রিল এলেই হাশেম আলির মাথাটা গরম হতে থাকে। সে উল্টাপাল্টা আচরণ করতে শুরু করে। অবশ্য এজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকরা অক্সিজেন আবিষ্কার করার আগেও কি মানুষ বেঁচেবর্তে থাকেনি ?

ব্যাপার হলো, হাশেম আলি রাস্তার ধারের দেয়ালে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ে। সেদিনও পড়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ এপ্রিল ১৯৯৯। হেডলাইন নিউজ হলো :

প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি নিয়োগের সিদ্ধান্ত।

খবরটা পড়ে হাশেম আলি বেশ প্রসাদ লাভ করল। যাক, এটা একটা ভালো উদ্যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে প্রার্থীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিটিকেই নিয়োগ দেয়া হবে!

তাহলে তো প্রতিযোগিতা বেশ জমেই উঠবে। আর যেখানেই প্রতিযোগিতা, সেখানেই দু-পয়সা কামাইয়ের সুযোগ!

হাশেম আলি ভাবল, দুটো কাজ জরুরিভিত্তিতে করতে হবে।

এক. একটা কোচিং সেন্টার খোলা। এমডি কোচিং সেন্টার।

দুই. একটা গাইড বই বের করা। শিওর সাকসেস গাইড। সোনালি গাইড, জনতা গাইড।

শুধু ভাবলেই তো চলবে না, কাজ করতে হবে। গাইড বইয়ের পাণ্ডুলিপি কে রচনা করবে।

অন্যের ওপর নির্ভর করাটা ঠিক হবে না। আইডিয়া পাচার হয়ে যাবে।

হাশেম আলি নিজেই বসে গেল গাইড বই রচনা করতে।

এক দিস্তা শাদা কাগজ, একটা কলম। ঘরের মধ্যে বসে হাশেম আলি ঘামছে। হাতে তালপাখা। তালপাখাই ভালো। লোডশেডিঙের ঝামেলা নেই।

হাশেম আলি তার গাইড বইয়ে যা লিখল তা থেকেই বোঝা যায়, তার মাথার ঠিক নেই। এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস।

সে একটা মডেল টেস্টের প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও।

১। প্রার্থীর বাড়ি কোথায় ?
ক. গোপালগঞ্জ, খ. দেশের অন্যত্র।
২। ক্ষমতাসীনদের সহিত সম্পর্ক কী সূত্রে ?
ক. আত্মীয়তা, খ. বন্ধুত্ব, গ. কর্মসূত্রে, ঘ. সম্পর্ক নেই।
৩. প্রার্থী সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারেন (আত্মীয় নহেন) এমন চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ?
(সুপারিশকারীরা মন্ত্রী কিংবা ক্ষমতাচক্রের অংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি না হলে উল্লেখের প্রয়োজন নেই)

এ ধরনের মডেল টেস্টের মডেল প্রশ্নসমেত একটা গাইড বই হাশেম আলি পুরোটাই রচনা করে ফেলল। তারপর ছাপানোর জন্য গেল পাড়ার অফসেট প্রেসে।

প্রেসের মালিক পাণ্ডুলিপি পড়ে কর্মচারীদের ডাকাটাই কর্তব্য জ্ঞান করল। সোজা ঘাড় ধরে বের করে দিল হাশেম আলিকে। গজরাতে লাগল : সর্বনাশ করতে চায়!

পাগলামোর জায়গা পায় না, পাড়ার মধ্যে ব্যবসা করে খাচ্ছি, পেটের ব্যবসায় লাথি মারার ব্যবস্থা করছে আর কী! একদম গাবতলি পাঠায়া দে পাগল-ছাগলরে।

যাক, পাগলও নিজের ভালো বোঝে। ছোট একটা প্যাঁদানি খেয়ে হাশেম আলি কিছুটা সংযত হয়েছে।

দুদিন পর আরেকটা সংবাদের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো :

এমপিদের নেতৃত্বে থানায় থানায় সন্ত্রাস নির্মূল কমিটি গঠনের নির্দেশ। (৫ এপ্রিল ১৯৯৯-এর দৈনিক ইত্তেফাক।)

> 'সন্ত্রাস নির্মূল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এমপিদের নেতৃত্বে থানায় থানায় কমিটি গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।'

খবরটা পড়ে হাশেম আলি হাসতে লাগল। দারুণ কমিটি হবে! সত্যি সত্যি এবার সন্ত্রাস দূর হবে। থানায় থানায় হবে কমিটি। জয়নাল হাজারী এমপির নেতৃত্বে সন্ত্রাস দমন কমিটি। ছাতকের মানিকের নেতৃত্বে কমিটি। শামীম ওসমানের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের কমিটি। গোলাম ফারুক অভির নেতৃত্বে... সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে... হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে...

হাশেম আলি বিড়বিড় করে, এ-কথা সে-কথা বলে!

তার কথার কোনো দাম নেই। পাগলা কিসিমের মানুষ। তার মধ্যে খরায় খরায় তার মাথাটাও বেশ গরম। বাদ দিন— পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!

প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ১৯৯৯

জংলীদের কাণ্ড

চিচিংগা পাহাড়ের ওই পারে যাব বলে বেরিয়েছি। বন্ধুর পথে বড়ই কষ্টকর এই যাত্রা। কোনো যানবাহন নেই। নেই পায়েচলা পথও। পাথরের ছোটবড় টুকরো মাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। জুতোর তলা ক্ষতবিক্ষত। পায়েও যন্ত্রণা হচ্ছে।

চিচিংগা পাহাড়ের ওই পারে আমরা যাচ্ছি নিতান্তই মানবিক কারণে। আমাদের বহরের সঙ্গে আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি খাবার পানি। আমাদের প্রত্যেকেরই পিঠে চামড়ার মশক। আমরা প্রত্যেকে এখন ভিস্তিঅলা।

সম্প্রতি একদল টিভি-ক্রু গিয়েছিল চিচিংগা পাহাড়ের ওই পারে। গিয়ে তারা যা দেখেছে তা রীতিমতো ভয়াবহ। চিচিংগা পাহাড়ের অপর পারে থাকে এক আদিম নৃগোষ্ঠী। মানুষই তারা। তবে জংলী মানব। কাপড়চোপড়ের ব্যবহার জানে না। গাছের ছাল পরে থাকে।

জংলী হলেও ওরা মানুষ। এদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। টিভি-ক্রু দলটি ফিরে এসে জানাচ্ছে, পানীয় জলের ভীষণ সংকটে ঝিমুংগা সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ মারা গেছে। বাকি শত শত মানুষ আজকালের মধ্যেই মারা পড়বে।

ওই সম্প্রদায়ের পানির উৎস ছিল এক মিষ্টি পানির সরোবর। সম্প্রতি ওটা শুকিয়ে গেছে। নিচে পড়ে আছে ঘোলা কাদা। পিপাসায় কাতর মানুষগুলো ওই কাদাই খাচ্ছে।

চারদিকে পাহাড় তাদের। উপত্যকায় তাদের বাস। এর বাইরে তারা কোথাও কখনো যায়নি। যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না।

হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা আটকে আসছে। শরীর নুয়ে পড়ছে। শরীর আর চলে না। আমরা আর পারব না। কেন যে এ পথে বেরিয়েছি আমরা! নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কি এসব আদিবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে!

আমাদের মধ্যে কয়েকজন যাচ্ছে নলকূপ মিস্ত্রি। ওখানে পাথুরে জমি খুঁড়ে একটা নলকূপ যদি বসিয়ে আসা যায়।

এখন রাত। পাহাড়ি জঙ্গলের মাথায় অর্ধেক চাঁদ। আমাদের সঙ্গে ব্যাটারিঅলা লণ্ঠন। চারদিকে বুনো ঝিঁঝির ডাক। দূর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি প্রাণীদের চিৎকার।

হাতের নিচে কী যেন নরম নরম লাগছে। ওরে বাবারে! লণ্ঠনের আলোয় দেখে আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম। একটা নীলচে সাপ!

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কায়িক পরিশ্রমে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম চিচিংগা পাহাড়ের অপর পারে।

আমাদের দেখে ঝিমুংগা সম্প্রদায়ের লোকজন খুশিতে হৈহৈ করে উঠলো।

তাদের নেতারা এলো আমাদের কাছে পানীয় জলের দায়দায়িত্ব বুঝে নিতে। এছাড়া নলকূপটা কোথায় বসানো হবে সেটাও ঠিক করা দরকার।

ঝিমুংগাদের নেতা একজন প্রবীণ মহিলা। তার গায়ের চামড়া ফেটে খরায় পোড়া এঁটেল মাটির মতো হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, আপনারা যে সাহায্য নিয়ে এসেছেন, তাতে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।

তিনি কথা বলছিলেন তার ভাষায়। পাহাড়ের অন্য পার থেকে আমরা একজন পাহাড়িকে ধরে নিয়ে এসেছি, যে ঝিমুংগা ভাষা জানে। কেন জানে— সেটা অবশ্য একটা রহস্য। এই পাহাড়িটি দোভাষীর কাজ করছে। গোত্রপ্রধান জানালেন, নলকূপ হলে তাদের ভালো হয়। আরো ভালো হয়, যদি তাদের জন্য কিছু লবণের ব্যবস্থা করা হয়। পাথুরে লবণের মজুদ গত মাসে শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা পোড়া মাংস লবণ ছাড়াই খেতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা বললাম, ঠিক আছে লবণের ব্যবস্থাও হবে। এছাড়া পাথরে পাথর ঘষে নয়, দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত পানিটা খাও।

নিজেরা খাও, সবাইকে খেতে দাও। বাঁচো।

পানির অভাবে কীভাবে যে ওই মানুষগুলো মরেছে, তার বর্ণনা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। পিপাসা মেটাতে তারা ঘাস, পাতা, কাদামাটি সব চিবিয়ে শেষ করে ফেলেছে।

গোত্রপ্রধান তার লোকদের বললেন, মশকগুলো নিয়ে যেতে। আমরা নিয়ম বলে দিলাম, আগে পানি পাবে শিশুরা, তারপর নারীরা...

এমন সময় হঠাৎ বেজে উঠল মাদল। হৈ হৈ করে আমাদের ঘিরে ফেললো একদল মানুষ। চেহারা সুরত দেখে এদেরও ঝিমুংগা বলেই মনে হলো। কী ব্যাপার ? তোমরা কারা ? কী চাও ?

ওরা বলল, পানি দেবেন না। এই গোত্রপ্রধানের হাতে পানি দেবেন না।

'ব্যাপার কী ? পানি না পেলে তোমরা তো এখনই মরবে!'

'মরলে মরব।' তাদের পিপাসাকাতর কোটরাগত চোখ। মর মর চেহারা। তারা বলছে, 'আমরা মরলে মরব। তবু এই গোত্রপ্রধানকে পানি দেবে না। পানি পাওয়ার যোগ্য সে নয়। সে খুব অত্যাচারী প্রধান। তার অত্যাচারে পুরো গোত্রের অবস্থা খারাপ। সামনের পূর্ণিমায় গোত্রপ্রধান বদল হবে। পরের মাসটায় আমাদের পছন্দের মানুষটি গোত্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবে। তখন পানি দেবেন।'

'সামনের পূর্ণিমা আসতে তো ঢের দেরি। ততদিনে তোমরা সবাই মারা পড়বে।'

'না না। আমরা সেসব কথা শুনতে চাই না। আমাদের সাফ কথা। এই গোত্রপ্রধানের আমলে এই ঝিমুংগা জাতি একফোঁটা পানিও সাহায্য পেতে পারে না।'

তারপর লেগে গেল এই নৃগোষ্ঠীর দুই গোত্রের ঝগড়া। ঝগড়া থেকে মারামারি। এ ওকে চেপে ধরে গলায় পাথরের ছুরি ঘষছে। ও এর মাথায় বাড়ি মারছে পাথর দিয়ে। একজনের হাত থেঁতলে দিচ্ছে কয়েকজন মিলে, পাথরের ওপরে হাত ঠেসে ধরে।

বোধহয় বিরোধীপক্ষই জিততে যাচ্ছে। তাদের স্লোগানে চারদিক মুখরিত : 'পানি নিয়ে ফিরে যাও। এক মাস পরে আবার এসো।'

একফোঁটা পানি বিতরণ হলে বিদেশীদের খাও গিলে...

আমরা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ কোন্ জংলীদের সামনে এলাম বাবা!

(আমার কল্পকাহিনীটি শেষ। তবে বরাদ্দকৃত জায়গা এখনো ভরেনি। ফলে আরো কিছু লেখা যায়। নিচের খবরটি পড়ুন।)

প্যারিসে বিএনপি সমর্থকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্যারিসে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক উপলক্ষে গতকাল সোমবার সেখানে স্থানীয় বিএনপি কর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। বিক্ষোভকালে তারা প্লাকার্ডে বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায়

বর্তমান সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার কথা লিখে সেসব প্রদর্শন করে। বিএনপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার এ-কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, গতকাল স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ৬৬ এভিনিউ ইয়েনা চত্বরে প্যারিস প্রবাসী শতাধিক বাংলাদেশী নাগরিক মিলিত হয়ে সেখান থেকে প্লাকার্ড হাতে তারা এক মাইল পথ মিছিল করে দ্য গল চত্বরে জমায়েত হয়। সেখানে বিশ্বব্যাংকের ফ্রান্স শাখার দপ্তর অবস্থিত।

পরে বিএনপি ফ্রান্স শাখার নেতা ড. আবদুল মালেকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিশ্বব্যাংক ফ্রান্স শাখার প্রধান মাদাম শ্যাভয়কে ১০ পৃষ্ঠার একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রথম আলো— ২২ এপ্রিল '৯৯

জবরদখল এড়াতে আমরা আর যা যা করতে পারি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন : শহরে সরকারি জায়গাজমি, বাড়ি দখলে রাখা যাচ্ছে না। সবই লোকজন দখল করে নিচ্ছে। তাই আমরা ওগুলো বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি বলেন : 'ওসমানী উদ্যানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতিও দেয়া হয়েছে। না হলে উদ্যানটি রক্ষা করা যেত না। একসময় দেখা যাবে সেটিও দখল হয়ে গেছে। এর আগেও একদল লোক এটি দখলের উদ্যোগ নিয়েছিল।' (রিপোর্টার্স ইউনিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ এপ্রিল '৯৯। এ-কথা বলেন। সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরের বক্তবটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয় পাঠক, আপনার প্রতি অনুরোধ রইল, উপরের বক্তব্যটুকুন বারবার পড়ুন, অন্তত ১০ বার পড়ুন।

পড়েছেন ! ১০ বার পড়তে পারলেন! আপনার শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসেনি! আপনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেননি!

হ্যাঁ। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, সরকারি জায়গাজমি, বাড়ি ধরে রাখা যাচ্ছে না। এ কারণেই সরকার এগুলো বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন কি উদিত হয় না : সরকার যদি নিজেই তার জমিজমা, বাড়ির দখল ধরে রাখতে না পারে, দখলদাররা এসে যদি তা জবরদখল করে নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা ? তাদের জমিজমা, বাড়ি জবরদখলদারদের হাত থেকে কে বাঁচাবে ?

শুধু জমি নয়, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বাড়িও দখলে রাখা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, মিন্টো রোডের বাড়িগুলো, রাষ্ট্রীয় অতিথিভবনগুলো, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ইত্যাদির দখলও নিশ্চয় হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো : এসব সরকারি স্থাপনা অচিরেই বিক্রি করে দেয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

সবচেয়ে ভয়াবহ কথা, ওসমানী উদ্যানের উদ্যান বিনষ্ট করে বানানো হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। কারণ— প্রধানমন্ত্রী রাখঢাক ছাড়াই বলেছেন— না হলে উদ্যানটি রক্ষা করা যেত না, দখলদাররা এসে সেটি দখল করে ফেলত। এর আগেও একদল লোক এটি দখলের উদ্যোগ নিয়েছিল বটে! এখন প্রশ্ন হলো : প্রধানমন্ত্রী নিজেই যখন বলেছেন সরকারি জমি এবং বাড়ি দখলে রাখা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এই বাড়িটি (নির্মিতব্য সম্মেলন কেন্দ্র) কীভাবে রক্ষা করা হবে ? তার দখল সরকার কীভাবে রাখবে ? যে জমির দখল ধরে রাখা যায় না, সে জমির উপরে নির্মিত ভবনের দখল কীভাবে ধরে রাখা যাবে! নাকি ওই সম্মেলন কেন্দ্রটিও বিক্রি করে দেয়া হবে ?

প্রধানমন্ত্রীর এই অকপট স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আমরা আরো অনেক সমস্যার সমাধানের সূত্র পেয়ে যাই :

১. বুড়িগঙ্গা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা রক্ষার জন্য নদী বরাবর একটা মহা-আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র স্থাপন করা হোক। (অথবা বুড়িগঙ্গা বিক্রি করে দেয়া হোক)।

২. ধানমণ্ডি লেকের একাংশ দখল করে একজন শের বাড়ি বানিয়েছে। এমন ঘটনা আরো ঘটে থাকতে পারে। পুরো ধানমণ্ডি লেক ভরাট করে তার ওপরে একটা কিছু কেন্দ্র/ মিলনায়তন বানানো হোক। (অথবা ধানমণ্ডি লেক বিক্রি করে দেয়া হোক)।

৩. বিমানবন্দরের রানওয়েটা ফাঁকা পেয়ে নিশ্চয় যাদের জোর আছে তারা দখল করে নেবে। সেক্ষেত্রে পুরো রানওয়ে জুড়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র বানানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কী ?

এবং সবশেষে একটি ছোট্ট প্রশ্ন : যদি কতিপয় ব্যক্তি কোদাল, দড়ি, মাপার ফিতা ইত্যাদি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটার কাছে ঘুরঘুর শুরু করে এবং চারদিকে সুতা টাঙিয়ে 'এই চেয়ারের মালিক মিসেস রহিমা খাতুন' ... ইত্যাদি একটা কিছু লিখে ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে কী করা হবে! প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটি বিক্রি করে দেয়া হবে ? ওটিতে একটা অন্তর্জাতিক সম্মেলন কুশন ব্যবহার করা হবে ?

সংযোজন

আমার লেখাটি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, গদ্যকার্টুনের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার বরাদ্দকৃত জায়গাটা এ লেখা দিয়ে ভরাট হবে না। জায়গা খালি থাকবে। তাতে অন্য কেউ জায়গাটা দখল করে নেবে! সেটা হতে দেয়া যায় না। তাই এ বাড়তি কথা।

যারা অন্যের বাড়িতে লজিং থাকেন, তাদের জন্য প্রবীণ লজিং-অভিজ্ঞ একটা পরামর্শ আছে। আপনার নামে বরাদ্দ তরকারি যদি পুরোটা খেতে না পারেন, বাকিটা ফেরত দেবেন না। চুপিসারে ফেলে দিন। নইলে পরদিন আপনাকে তরকারি কম দেয়া হবে।

আমিও তাই করছি। নিজের লেখার জায়গার বেদখলত্ব প্রতিহত করতে অপ্রয়োজনীয় কথা বলছি। তার চেয়ে বরং সুমন চট্টোপাধ্যায়ের দুটো গানের লাইন লিখি :

আমি চাই গাছ কাটা হলে শোকসভা হবে বিধানসভায়
আমি চাই প্রতিবাদ হবে শিমুল পলাশে রক্তজবায়।

প্রথম আলো, ৬ মে, ১৯৯৯

ওলটপালট করে দে মা

ওলটপালট করে দে মা খইয়ের ডালা, বাতাসার কুলা, মুড়ি-মুড়কির ঝুড়ি-ভরা মেলায়। আর আমরা, মেলায় আগত দুষ্ট ছেলের দল, ঝাঁপিয়ে পড়ি—লুটেপুটে খাই।

ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই। হুটোপুটি চলছে, লুটোপুটি চলছে। এই আমি থাবা দিয়ে পেয়ে গেলাম একটা সন্দেশ। নাও, নাও, মুখে পুরো। ওপাশ থেকে একটা বাতাসা ধুলো থেকে তুলে নিয়ে বলেছে রাম ও রহিম, বশির ও সগির। পায়ের নিচে একহাঁটু মুড়ি-মুড়কি। আঁজলা ভরে তোলো। একমুঠো মুখে নাও, এক কোছা উড়িয়ে দাও বাতাসে। ওড়াও, ওড়াও। বাতাসে মুড়ি ওড়াও। খই ওড়াও। উড়ো খইটুকুন গোবিন্দকে নিবেদন করো। নমঃ নমঃ গোবিন্দ। এ তুমি কী সুবর্ণ সুযোগ দিলে ভগবান!

আরে ঝপাস। এই মাত্র উল্টে গেল এক কড়াই রসগোল্লা। নে, নে। লুঙ্গির আর শাড়ির আঁচলে বেঁধে ফেলে। করিস কী! লুঙ্গির অর্ধেকটা দিয়ে কোছা বানিয়েছিস। ওরে হতভাগা। পুরো লুঙ্গিই খুলে ফেল। এক মাথায় একটা গিঁট দিয়ে ওটাকে ছালা বানিয়ে ফেল। এবার ভর। নে। মুড়ি কম নিবি। ওই রাবড়িগুলো বেশি করে ভর। ইশ রে, ছোটন ফোটন ঝোটন পুঁতি ফুতি ভুতিকে আনলেই হতো। ওরাও খেত। খেয়ে ঝোলায় ভরত। এমন মওকা আর কি কোনোদিন এই ইহজনমে পাব রে। সবাই লেগে পড়। দাদা-দাদি, বাবা-চাচা, চাচি-ফুপু, আব্বা-আম্মা, সেজো-মেজো। আহা, বাড়ির কাজের ছেলেটা এসেছে, কিন্তু ওর পোয়াতি বউটাই আসেনি। কী সুযোগ!

কী সুযোগ? কিসের সুযোগ!

জনাব, এইচএসসি পরীক্ষা হচ্ছে জনাব। এই সুযোগে আপনিও তো ওটা সহজেই বগলে দাবিয়ে ফেলতে পারতেন। আরে ছ্যাঁ ছ্যাঁ, দস্তখত করতে জানতে হবে কেন! আপনার নাম রেজিস্ট্রি করা থাকলেই হবে। পরীক্ষার হলে! ও আপনাকে বসতেও হবে না। পাশের বিল্ডিঙে আমরা আছি কী করতে? উত্তরপত্র লিখে বান্ডিলে ভরে দেব। আপনি স্বাক্ষর করতে জানেন? তাহলে তো কথাই নেই। আপনি ফার্স্ট ডিভিশন। নিন দুটো লেটার। মন খারাপ কেন। দুটো লেটারে হবে না! শখ কত। শুধু সই দিতে জানে, তিনটা লেটার চাই। মামাবাড়ির আবদার! ন্যায়-অন্যায় বলে কথা নেই!

আহ! কী জমে উঠেছে এইচএসসি পরীক্ষা। সব কটা জানালা, সবকটা দরজা খুলে দিয়েছে। কোশ্চেন ক্যান্ডিডেটের হাতে আসার আগেই বাইরে উত্তরপত্র রেডি। এরা নিশ্চয়ই স্ট্যান্ড করবেন। কিন্তু সবাই স্ট্যান্ড করবে না। পরের গোত্র স্টার। এরা নিজেদের খাতায় নিজেরাই লিখবেন। উত্তর যোগান দেয়া হবে বাইরে থেকে ফটোকপি করে। বইয়ের পাতা কেটে। প্রকাশ্যে বই খুলে এরা লিখবেন।

কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পাতাটা কপি করব মামা।

তিনজন পাখা দিয়ে বাতাস করছে, আর দেখিয়ে দিচ্ছে। আরে হতভাগা, এই তো উত্তর। এই পর্যন্ত কপি কর।

মামা, আমার হাতে ব্যথা। তুমিই কপি করো। আমি বাতাস করি।

শিক্ষকরা দেখছেন। কেউ ঘুমুচ্ছেন। কেউ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরেকজনের সঙ্গে গল্প করছেন। যা গরম পড়েছে। কেউবা পাখা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের বাতাস করছেন।

মামা, মিষ্টি খায়? মামা বলেন, কে খায়?

'এই তোমার নাম কী?'

'মাছি।'

মাছি? বাতাস করো, বাতাস করো।

পুরোনো বাংলা ছবির দৃশ্য সংলাপ। এখন সবাই মিলে নকল করছে। শিক্ষকরা বাতাস করছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটরা কেউ কেউ প্রতিবাদ করেন। করে মার খান। হলে আগুন জ্বলে। এর চেয়ে চেপে যাওয়া ভালো। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী বখরা দেয়। ভালো ইনকাম হয়। বাধা দিলে বদলির সম্ভাবনা।

নিজেদের এলাকার ছেলেদের মঙ্গলের দায়িত্ব নিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। এলাকায় দুটো ব্রিজ চাই, হাসপাতাল চাই। এর সঙ্গে এটাও খুব জনপ্রিয় দাবি— ছেলেদের পরীক্ষায় পাস করানো চাই। পরীক্ষায় কড়াকড়ি হলে ভোটও কড়াকড়িতেই হবে। আমার ভোট তাহলে কিন্তু আমিই দেব। যাকে খুশি তাকে দেব।

নেতারা তাই বড়ই তটস্থ। ম্যাজিস্ট্রেটকে সাইজ করো। ডিসি-এসপিকে ম্যানেজ করো। শিক্ষকদেরও নাকি কলেজের রেজাল্ট ভালো দেখাতে হয়। ছেলেরা পাস না করলে তাদের ভাতা বন্ধ।

ওরে। লেখ রে লেখ। বই দেখে লেখ। এত লেখারই বা কী দরকার। যা, বোর্ডে গিয়ে ধর। একবারে মার্কশিটে নম্বর বসিয়ে দে।

ইস কী সুবর্ণ সুযোগ! বাসার কাজের মেয়েটাকেও কেন পরীক্ষার হলে বসিয়ে দিলাম না। কোথায় যেন এক অশ্বারোহী পিএইচডি ডিগ্রি ক্রয় করে তার ঘোড়াটির জন্যও তা কিনতে চেয়ে শুনেছিল : আমরা শুধু গাধাদেরই ডক্টরেট ডিগ্রি দেই, ঘোড়াদের দেই না।

বোর্ডের চেয়ারম্যানরা হতাশ। তারা কী করবে? তারা কি পুলিশ! কুমিল্লা বোর্ডের কর্তারা কেন্দ্রে গিয়ে ভিরমি খেয়েছেন— এ তো নকল নয়। নকল হচ্ছে দেখে-দেখে লেখা। কিন্তু এ কী! সবার সামনে বই খোলা, সবাই দেখছে। সবাই লিখছে। কোনো দ্বিধা নেই। সংকোচ নেই।

ভারতের কোনো কোনো এলাকায় লোকজন রেললাইনের ধারে প্রাতঃক্রিয়াদি সারে। তাই দেখে একজন বিচিত্রায় লিখেছিল, চলন্ত ট্রেনকে নাহয় লজ্জা নাই, কিন্তু এরা কি পরস্পরকেও লজ্জা পায় না! দিব্যি সারি বেঁধে বসে পরনের কাপড় তুলে...

তাই তো। নকলের একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব থাকা উচিত। শিক্ষক একটু কাশি দেবেন তো পরীক্ষার্থী একটু বইটা আড়াল করবে। ম্যাজিস্ট্রেট এলে সবাই নকলগুলো

কাপড়ের নিচে চালান দেবে। এসব কিছুই না। কেউ কাউকে লজ্জা পাচ্ছে না। সবাই সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছে। ওরে লেখ। লেখ। দেখে লেখ। অন্যের কাছে লিখিয়ে নে!

আসছে। আগামীদিনের কাণ্ডারীরা আসছে। এরা এমপি হবে। মন্ত্রী হবে। শিক্ষামন্ত্রী হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবে। অর্থমন্ত্রী হবে। পরিকল্পনামন্ত্রী হবে।

কেন হব না! গৃহবধূরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ চালাচ্ছে না! ঠিক পারব।

না-পারার কোনো কারণ নেই। খুব সোজা। মন্ত্রীদের এমন কী কাজ। থানায় ফোন করা। টেন্ডারে বখরা নেয়া। ছাত্রদের হল দখলে উসকানি দেয়া। ওটা-ওটা ইন্সেন্টিভ দেয়া। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করা। সব চাকরিবাকরিতে নিজের লোক, দলের লোক, এলাকার লোক ঢুকিয়ে দেয়া। নয়তো যে মালপানি ছাড়বে, তাদের ঢোকানো। ও আমিও পারব। এজন্য নকল করে এসএসসি, এইচএসসি পাস করেছি কিনা— এটা জানতে চেয়ো না।

কিচ্ছু রইল না দেশটার। সেই আদর্শবান প্রতিবাদী শিক্ষকটি কই! অন্তত নকল স্বর্গের প্রতিবাদে এলাকায় একাকী তো অনশন করতে পারতেন। কেউ নেই।

সবকিছুর মূলে আছে রাজনীতি এবং দুর্নীতি। দেশটা গেছে। গোড়া কেটে কেটে আগায় বসে ভাবছে— বেশ তো আছি। তা যারা ভেঙে-পড়া ডালটা পাবে, তারা তো ভালো আছেই। কিন্তু ডালের আগায় বসে আছে দেশ। আর ভবিষ্যৎ! ওটা গেছে— পুরোপুরিই।

আমি এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না। আমি এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না।

প্রথম আলো, ১৩ মে, ১৯৯৯

একটি আদর্শ হাসির গল্প

প্রথমে একটা গল্প বলে নেই। মন দিয়ে শুনলে, আশা করছি, গল্পটা আপনাদের ভালো লাগবে।

এক দাঁতের ডাক্তার। তার কোনো ডিগ্রি নেই। আজ তিনি ডাক্তারখানা খুলেছেন সকাল ৬টায়। যন্ত্রপাতি, নকল দাঁত ইত্যাদি গোছগাছ করছেন। খুব গরম পড়েছে। সোমবারের এ সকালে এখনো বৃষ্টি হয়নি।

৮টা পেরিয়ে গেছে। টেবিল-চেয়ার ঠিকঠাক করতে করতে ডাক্তার সাহেব জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দুপুরের পর বোধহয় বৃষ্টি হবে।

'আব্বু'। তার ১১ বছরের ছেলের ডাকে তার তন্ময়তা ভাঙল।

'কী ?'

'মেয়র সাহেব জানতে চাচ্ছেন, তুমি কি ওনার দাঁত তুলবা ?'

'গিয়া কও আমি এখানে নাই।'

ডাক্তার সাহেব একটা সোনার দাঁত পরিষ্কার করছেন। বসার ঘর থেকে তার ছেলে আবার চিৎকার করে বলল, 'বাবা, উনি বলতেছেন তুমি এখানেই আছ, উনি তো তোমার গলা শুনতে পাচ্ছেন।'

ডাক্তার সাহেব মন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করেই চলেছেন। অন্য কোনোদিকে তার খেয়াল নেই।

'আব্বু।'

'কী হলো?' ডাক্তারের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই।

'মেয়র সাহেব বলতেছেন, তুমি যদি ওনার দাঁত না তোলো, তাহলে উনি তোমাকে গুলি করবেন।'

ডাক্তার সাহেবের মধ্যে কোনো তাড়া নেই। তিনি তার কাজ থেকে হাত সরিয়ে ড্রয়ারটা খুললেন। ভেতরে একটা রিভলবার। বললেন, 'ওনাকে আসতে বলো। এসে আমাকে গুলি করতে বলো।'

মেয়র দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তার গালের এক পাশের দাড়ি কামানো। আরেক পাশে দাঁতের ব্যথায় গাল ফোলা, আর পাঁচদিনের দাড়ি।

ডাক্তার সাহেব ড্রয়ার বন্ধ করে বললেন, 'বসেন।'

'স্লামালাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম।'

মেয়র রোগীর চেয়ারে বসে তার মাথাটা রাখলেন চেয়ারের পেছনে। এখন কিছুটা ভালো লাগছে। ডাক্তার কাছে এলে মেয়র হা করলেন। ডাক্তার মুখের ভেতরে আলো ফেলে দেখলেন, একটা দাঁত ক্ষয়ে গেছে। তারপর রোগীর হা মুখটা চাপ দিয়ে বন্ধ করালেন। বললেন, অ্যানেসথেশিয়া ছাড়াই দাঁতটা তুলতে হবে।

'কেন?'

'কারণ ভেতরে একটা ফোড়া আছে।'

মেয়র তাকালেন ডাক্তারের চোখের দিকে। 'ঠিক আছে।' তিনি হাসার চেষ্টা করলেন। ডাক্তার কিন্তু বিনিময়ে হাসলেন না। তিনি দাঁত তোলার যন্ত্রপাতির পাত্রটা কাছে আনলেন। পা দিয়ে থুতু ফেলার গামলাটা আনলেন। বেসিনে গিয়ে হাত ধুলেন। ডাক্তার এসব করছেন, কিন্তু একবারও তাকাচ্ছেন না মেয়রের দিকে। অন্যদিক মেয়র চোখ সরাচ্ছেন না ডাক্তারের ওপর থেকে।

নিচের আক্কেল দাঁতটা তুলতে হবে। গরম চিমটা দিয়ে ধরে শক্ত টানে দাঁতটা তোলা হবে। ডাক্তার পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। মেয়র চেয়ারের হাতল সর্বশক্তি দিয়ে ধরে আছেন। তার কিডনিতে শীতল বরফের চাপ। তিনি কোনো শব্দ করছেন না। ডাক্তার বললেন, 'এবার আপনাকে শোধ দিতে হবে। মানুষের দাম। আমাদের কুড়িজন মৃত মানুষের দাম।'

ডাক্তারের কবজি নড়ল। মেয়র অনুভব করছেন, তার চোয়ালে হাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছে। তার চোখ পানিতে ভরে উঠছে। তিনি শ্বাস চেপে আছেন।

ঘর্মাক্ত ধ্বস্ত মেয়র থুতুর গামলার দিকে উপুড় হলেন। পকেটে হাত দিয়ে তিনি রুমাল খুঁজছেন। ডাক্তার তাকে একটা পরিষ্কার কাপড় এগিয়ে বললেন, 'চোখ মোছেন।'

মেয়র চোখ মুছলেন। তিনি কাঁপছেন। ডাক্তার তার হাত ধুচ্ছেন। মেয়র দেখতে পাচ্ছেন ছাদের গায়ে মাকড়সার জাল, মাকড়সার ডিম, আর মরা পোকামাকড়।

হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার বললেন, 'বিছানায় যান। লবণ পানি দিয়া কুলকুচা করবেন।'

মেয়র উঠলেন। বিদায় নিলেন। বললেন, 'বিল পাঠায়া দিবেন।'

'কার কাছে বিল পাঠাব ? আপনার নামে, না নগর-কর্তৃপক্ষের নামে ?'

মেয়র ফিরে তাকালেন না। দরজা লাগিয়ে দিয়ে পর্দার ভেতর থেকে ডাক্তার বললেন, 'ধুর, একই কথা।'

সংযোজন

ওপরের গল্পটি গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের একটা ছোটগল্পের সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ। এবার গল্পটাকে আমরা নিজের মতো করে লিখব।

মেয়র এলেন ডাক্তারের কাছে। ফোলা গাল, পোকায় খাওয়া একটা দাঁত, আর অসহ্য ব্যথা নিয়ে।

ডাক্তার বললেন, আপনার দাঁতগুলো আমি তুলে ফেলব। সাঁড়াশি দিয়ে টেনে একটা একটা করে তুলব। সামান্য ব্যথা লাগবে। রক্ত-টক্ত পড়বে। কিছু দাঁত আধাভাঙা থাকবে। কিছু মাংস কেটে ছিঁড়ে যাবে।

শুনে মেয়রের অক্কা পাওয়ার যোগাড় : আমার দাঁতগুলো আপনি তুলে ফেলবেন। বলেন কী! আমি মরে যবো তো!

'গেলে যাবেন' ।— ডাক্তার নির্বিকার।

তখন মেয়র গঠন করলেন ৭০ দাঁত রক্ষা পরিষদ। শুরু করলেন আন্দোলন। না! আমার দাঁত আমি তুলতে দেব না।

শহরে আর কোনো দন্ত-চিকিৎসক নেই। পোকায় খাওয়া দাঁতটির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাকে আবার আসতে হলো ওই ডাক্তারেরই কাছে।

বললেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি জানেন, আমি ৭০ দাঁত রক্ষা পরিষদ গঠন করেছি।

ডাক্তার বললেন, আরে আরে কে বলেছে আমি আপনার ৭০টা দাঁত তুলব। আপনার দাঁত তো আছে মোটে ৩২টা। এর মধ্যে ওপর পাটির ৬টা আর নিচের পাটির ৭টা তুলব মাত্র।

৭০ দাঁত রক্ষা পরিষদ বিভ্রান্ত হলো। তাই তো! দাঁত আছেই মোটে ৩২টা। এর মধ্যে ১৩টা তুললে ক্ষতি কী!

তারা মেয়রকে বলল, যান ডাক্তারের কাছে। এভাবে দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার দরকার কী!

মেয়র ডাক্তারের চেম্বারে, অপারেশন চেয়ারে আধা শোওয়া। ডাক্তার তার সাঁড়াশি ডেটল-পানিতে ধুচ্ছেন।

'হা করেন।'

মেয়র হা করলেন।

মেয়র বললেন : ডাক্তার সাহেব, একটা কথা। ৭০ দাঁত রক্ষা আন্দোলনে নাহয় সংখ্যায় ভুল হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার তো একই। একটা দাঁত অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া তুললেই তো আমার জিন্দেগি পয়মাল। ১৩টা তোলার আগেই ব্যথায়-বেদনায় আমার

কলিজা ফুটো হয়ে যাবে। সংখ্যার ভুলটাকে অগ্রাহ্য করে এর অন্তর্নিহিত ভাবটাকে কি উপলব্ধি করতে পারেন না!

'না, পারি না।' ডাক্তার বললেন, 'কারণ আমাদের নগরের উদ্যানটির ১১ হাজার বৃক্ষ বাঁচানোর আন্দোলন নিয়ে কর্তৃপক্ষ একইরকম হৃদয়হীনতা দেখিয়েছে। তারা বলেছে— ১১ হাজার নয়, গাছ আছে ১০০৯। এর মধ্যে শ'চারেক কাটা হবে মাত্র। গাছ উপড়ে ফেলা হলে নগরের আর নাগরিকদের কী যন্ত্রণা হয়, এটা বোঝানোর জন্য আপনার একটা একটা দাঁত এখন উপড়ে ফেলা হবে। আপনার জন্য আমি এই সান্ত্বনাসূচক বিবৃতি দিচ্ছি যে, '৭০টা নয়, মাত্র ১৩টা দাঁত এখন উপড়ানো হবে।'

উপসংহার : আমার গল্প শেষ। আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এটিকে একটি আদর্শ হাসির গল্প বলা হলো কেন?

হাস্যরস কী, তা বোঝাতে চেক লেখক মিলান কুন্ডেরা স্মরণ করেছিলেন গোগলের একটা উক্তি। গোগল বলেছেন, আমরা অমাদের সেরা হাসির গল্পের দিকে যতই তাকাই, ততই বেদনার্ত হয়ে পড়ি। হাসির গল্প আসলে চোখ-ভেজানো, হৃদয়-পোড়ানো বেদনার গল্প।

ওপরের এই গল্পটি পড়ে আপনার হৃদয় কি বেদনার্ত হয়ে পড়েনি! ওসমানী উদ্যানের সবুজ-সতেজ গাছগুলো কর্তিত হবে কুঠারের ইস্পাতের ফলায়— এটা আপনি কিছুতেই রোধ করতে পারবেন না; ক্ষমতার দম্ভের কাছে পরাজিত হবে ক্ষমতাহীন মানুষের বিবেকের আবেদন— এটা ভেবে অক্ষম বেদনায় আপনার হৃদয় কি বিদীর্ণ হয়ে উঠছে না!

প্রথম আলো, ২০ মে, ১৯৯৯

রোবট ও অপূর্ব সরকার

আমাদের অফিসে একটা রোবট আছে। ট্রিটন। বেশ বুদ্ধিমান রোবট। এতটাই বুদ্ধিমান যে, কে সত্য বলছে, কে মিথ্যা বলছে, সে ধরে ফেলতে পারে।

নানা কাজের মধ্যে রোবটটার একটা উল্লেখযোগ্য কাজ— চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ করা। এ-কাজটা তাকে করতে দেয়া হয়েছে, যাতে কোনোরকম স্বজনপ্রীতি না হয়। এ দায়িত্ব সে সুচারুরূপেই পালন করছে।

এই ইন্টারভিউগুলো যাতে সে ঠিকভাবে নিতে পারে, সেজন্য তার মেমোরিতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ইনপুট করা হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে সে খুব ভালো জানে। এদেশের মানুষ, সমাজ, রাজনীতি—সবকিছু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যে তার স্মৃতিভাণ্ডার ঠাসা।

এখন আমাদের অফিসে চলছে লোক নিয়োগের মৌসুম।

সকাল ১১টার সেশনে একজন প্রার্থীকে ডাকা হলো ইন্টারভিউ বোর্ডে। একজন অল্পবয়সী তরুণ। দেখতে শুনতে 'অপু' মার্কা। নাক-মুখ পাতলা। চোখে চিকন চশমা। ফরসা গায়ের রং।

'তোমার নাম কী?' রোবটটা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'অপূর্ব সরকার', তরুণের উত্তর।

ইন্টারভিউ বোর্ডে আমিও ছিলাম। তরুণের নাম শুনে চমকে উঠলাম। অপূর্ব যার নাম, তার চেহারা কেন আমার কাছে 'অপু' 'অপু' মনে হলো। তাহলে কি নামে অনেক কিছু এসে যায় ! কোনো অসুন্দর ঘ্রাণহীন ফুলের নাম গোলাপ রাখা হলে একসময় তাতে সৌন্দর্য আর সুগন্ধও যুক্ত হবে ?

মানুষের জীবনে হয়তো তার নামের ভাব পড়ে থাকে। নইলে মিউমোরোলোজিতে নামের অ-এর সংখ্যা বিচার থেকে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমার পর্যবেক্ষণ হলো, নামের অর্থ অনেক সময় মানুষের চরিত্রে ছায়া ফেলে। যেমন সুমন নামের লোকদের মন সুন্দর হয়। বিদ্যুৎ বা চঞ্চল নামের লোকেরা চঞ্চল প্রকৃতির হয়। অবশ্য উল্টোটাও হতে পারে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নিয়ে তো কথা কম হয়নি। যাক, অপূর্ব সরকার সব প্রশ্নেরই দারুণ দারুণ সব উত্তর দিচ্ছে। ৫টা প্রশ্ন আছে, নির্বাচিত সব প্রার্থীকেই করা হয়। সে ৫টা প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিয়ে দিল।

এরপর অনির্ধারিত প্রশ্ন। ইতিপূর্বে কোনো প্রার্থীকেই এসব প্রশ্ন করা হয়নি। পরবর্তী প্রার্থীকেও করা হবে না।

আশ্চর্য। এসব প্রশ্নের জবাবও অপূর্ব সরকার ভালোভাবেই দিল।

অপূর্ব সরকার বিদায় নিল। তার মতো এমন উজ্জ্বল এক তরুণের মুখ আমার মনে আঁকা হয়ে রইল।

কয়েকদিন পর চাকরির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রণীত হলো। প্রতিস্বাক্ষরের জন্য আনা হলো আমার কাছে। হঠাৎই মনে হলো অপূর্ব সরকারের কথা। ওর তো ফার্স্ট হওয়া উচিত। তালিকার ওপরের দিকে তাকালাম। নাহ্। অপূর্ব বলে কারো নাম নেই। তালিকার মধ্যভাগে, শেষভাগে ?...না, কোথাও নেই। ব্যাপার কী ? ব্যাটা রোবটের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো!

আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। বললাম, 'ট্রিটন, তুমি এটা কী করেছ ? ওই ছেলেটা তো ইন্টারভিউ খুব ভালো করেছে! ওই যে...অপূর্ব সরকার। তাকে তুমি বাদ দিয়েছ কেন ?'

রোবট যা বলল তা শুনে আমার আকাশ ভেঙে পড়ার যোগাড়! 'ও, অপূর্ব সরকার! তার সমস্যা আছে!'

'সমস্যা! কী সমস্যা ?'

'মিথ্যা বলেছে! কোথাও তার একটা ফাঁকি আছে। যেটা আমরা ধরতে পারছি না। কিন্তু আমার মিথ্যা-নিরূপণ প্রোগ্রাম অনুসারে সে লাল ক্রস পেয়েছে। তার কথা আর আচরণে সঙ্গতি নেই।'

'কী বলছ তুমি ট্রিটন, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে। তোমার হিসাবে তার আইকিউ কি বেশি আসেনি ?'

'হ্যাঁ, এসেছে। এমন আইকিউ খুব কম লোকের হয়।'

'তাহলে। ছেলেটা দেখতে-শুনতে ভালো। কথা বলতে জানে। ব্যবহারে তাকে সজ্জন বলে মনে হয়।'

'সে সবই সত্য।'

'তাহলে কেন তুমি তাকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিচ্ছ ?'

'কারণ', ট্রিটন নামের রোবটটি বলতে থাকে, 'কারণ হলো তার নামের দ্বিতীয় অংশ। তার নাম 'অপূর্ব সরকার'। এটাই তার বাদ পড়ার কারণ।'

'কী বলছ তুমি! আমার মনে হয় তোমার সার্কিটে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

'কী বলছি আগে শুনুন। আমার কাছে যত তথ্য আছে, তাতে 'সরকার' কখনো বুদ্ধিমান হয় না। যেই সরকার হয়, সেই বোকা হয়ে যায়। যেমন খালেদা সরকার বা বিএনপি সরকার। হাসিনা সরকার বা আওয়ামী লীগ সরকার।'

আমার মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

ট্রিটন কিন্তু বলেই চলেছে : ধরো, আওয়ামী লীগ সরকার। তারা তো এর আগে দীর্ঘদিন বিরোধীদলে ছিল। আন্দোলন-সংগ্রাম কীভাবে তীব্র হয়ে ওঠে— তারা জানে। কিন্তু সরকারে গিয়ে তারা কী করছে! বিএনপির আন্দোলনগুলো যাতে সফল হয়, তার ব্যবস্থা করছে। বিএনপির পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখী লংমার্চটা অবাধে যেতে দিলেই হতো। কিন্তু কী করল সরকার। কাঁচপুর ব্রিজের কাছে যানজট বাধিয়ে পরদিন সব কাগজের শিরোনাম বানাল এটাকে। বিরোধীদল আহূত হরতালগুলো নির্বেঘ্নে পার করে দিলেই যেখানে চলত, সেখানে একবার রাজপথে নামানো হলো নাইনগুটার। ব্যস, পরদিন কাগজে সেটাই হলো প্রধান খবর। আরেক হরতালে সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে বিএনপির মিছিলে গুলিবর্ষণ করে মারা হলো ছাত্রদল নেতাকে। সেটাও সারাদেশে ধিকৃত হলো। আর সবশেষে হরতালের বিরুদ্ধে নামানো হলো পুলিশ। এমনি সে পুলিশ, যারা দম্ভোক্তি করছে সাংবাদিকদেরও গুলি করার অর্ডার আছে। সেই পুলিশ সাংবাদিক তো পেটালোই, রাজপথে প্রতিবাদী বিক্ষোভকারিণীর শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি করলো। সরকার মানে কতটা নির্বোধ, বেআক্কেল, যে বোঝে না— রাজপথে মহিলার আঁচল ধরে টানা মানে সরকারের নিজেরই বেআব্রু হয়ে পড়া। আওয়ামী লীগ যখন বিরোধীদলে ছিল, তখন কিন্তু এতটা বোকা ছিল না। একটা মোমবাতিতে জোরে ফুঁ দিলে মোমবাতি নিভে যায়, কিন্তু চুলোর আগুনে চোঙা দিয়ে ফুঁ দিলে আগুন জ্বলে ওঠে জোরে। যখন পাড়ায় অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকে, তখন যদি বাতাস বয়, তবে সর্বনাশ। বিরোধীদলের বিক্ষোভ সমাবেশে বাধা দেয়া, গুণ্ডা বা পুলিশ লেলিয়ে দেয়া মানে প্রজ্বলন্ত কুটিরে চৈত্রের বাতাস বইয়ে দেয়া। কতখানি নির্বোধ হলে সরকার যমুনা ব্রিজের ওপর দিয়ে বিরোধীদলের রোডমার্চকে বাধা দেয়ার কথা ভাবতে পারে।'

'তোমার কথা কি শেষ হয়েছে, ট্রিটন।'

'না জনাব। সরকারের বোকামির তালিকা আরো অনেক বেশি দীর্ঘ। আমি কি সেসব বলব?'

'না। তোমাকে আর বলতে হবে না। কারণ তুমি মোটেও বুদ্ধিমান রোবট নও। তুমি একটা গর্দভ। মানে বুঝেছ?'

ট্রিটনের বাতি মিটমিট করতে লাগল। তার মানে সে লজ্জা পেয়েছে।

'তুমি যে সরকারের কথা বলছ, তারা হলো গভর্নমেন্ট। আর এ সরকার একটা পদবি মাত্র। এ সামান্য ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারলে না!' আমি বললাম।

'পেরেছি মহোদয়। এই নিন চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের আসল তালিকা। ওটা আমি আগেই বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু সরকারের বোকামিতে আমি এমন ত্যক্ত-উত্যক্ত যে, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি ফল্স তালিকাটা তৈরি করেছিলাম।' ট্রিটন বলল।

ট্রিটনের হাত থেকে আসল রেজাল্ট শিটটা নিলাম প্রতিস্বাক্ষরের জন্য। সত্যি, এটার এক নম্বর নামটাই অপূর্ব সরকার।

ট্রিটন তাহলে ততটা বোকা রোবট নয়। না হবারই কথা। তার নাম তো আর ট্রিটন সরকার নয়!

প্রথম আলো, ২৭ মে, ১৯৯৯

একটি অখেলোয়াড়সুলভ রচনা বা স্বতঃসিদ্ধ সূত্রকে মিথ্যা প্রমাণীকরণ

খেলার সঙ্গে মেলাতে নেই রাজনীতিকে। তারা বলে। যেন এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যেমন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি এর তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড়।

যখন জিজ্ঞেস করি, ভাই আপনি পাকিস্তানকে সমর্থন করেন কেন ? জানেন না, ১৯৭১ সালে...

তারা খেপে ওঠে। তারা তেড়ে আসে। তারা মারতে উদ্যত হয়। তারা মেরে বসে।

'ছি ছি। তুমি মিয়া একদম স্পোর্টস বোঝো না। স্পোর্টসের একটা স্পিরিট আছে। যে ভালো খেলবে, তুমি তার ভক্ত না হয়েই পারো না। দ্যাখো পাকিস্তানকে, কী তাদের পৌরুষ। কী তাদের তাকদ। কী তাদের জোয়ানি জোশ। একটা মাত্র বল বাকি। দরকার ৬ রান। পাকিস্তানের উইকেট পড়ে গেছে ৯টি। যে ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সে একজন বোলার। তবু তুমি আশা করতে পারো, পাকিরা জিতবে। ওই বোলারই ছক্কা মারবে। আরে মিয়া, রুটি খেতে হয়। গোরুর মাংস খেতে হয়। তাহলেই কজিতে জোর আসে। কোমরটা শক্ত হয়। কলজেটা বড় হয়।'

'তাহলে তুমি বলছ, তুমি পাকিস্তানের নয়, পাকিস্তানের ক্রিকেটের ভক্ত। আসলে তুমি ভক্ত পিওর ক্রিকেটের। নিখাদ শুদ্ধ, পবিত্র ক্রিকেটের। তার সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই। পাকিস্তান ভালো খেলে, ভালো পেটায়, সে জিততে জানে, শত বিপদের মুখেও ভেঙে পড়ে না— এই তার সৌন্দর্য। ক্রিকেটীয় সৌন্দর্য। তুমি ভক্ত তার!'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

'সে কারণেই তুমি ঢাকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসো গালে পাকিস্তানের পতাকা এঁকে, হাতে প্ল্যাকার্ড— মেরি মি, আফ্রিদি।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

'এর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই রাজনীতির। ১৯৭১ সাল। ২৫ মার্চ। অপারেশন সার্চলাইট। কামান দাগিয়ে উড়িয়ে দেয়া ছাত্রাবাস....'

'না না। এসবের সঙ্গে খেলার কী সম্পর্ক ? খেলার মধ্যে রাজনীতি আনবেন না তো। ক্ষ্যাত্ নাকি!'

'তাহলে খেলার সঙ্গে রাজনীতি মেশাব না ?'

'না।'

'খেলার মধ্যে রাজনীতি আনব না ?'

'না।'

'খেলা আর রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ। আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা।'

'ঠিক আছে মেনে নিলাম। রাজনীতি আলাদা, ক্রিকেট আলাদা। ক্রিকেটে যে ভালো খেলে, তাকে সমর্থন করাই যায়। যে দলের ক্রিকেটারদের আছে শৌর্যবীর্য, আছে সৌন্দর্য আর পৌরুষ, আছে জয়ের রেকর্ড— তাকে সমর্থন করাই যায় ?'

'যায়।'

'এর সঙ্গে তাহলে রাজনীতি মেশাব না ?'

'না।'

'তাহলে আসো আমরা পাকিস্তানকে সমর্থন করি। কারণ তারা ভালো খেলে। এর বিপক্ষ কে ? তুচ্ছ বাংলাদেশ, হাস্যকর। বিশ্বকাপের দুধভাত।'

'না না। তা কেন ? বাংলাদেশের ব্যাপারটা আলাদা। বাংলাদেশের সঙ্গে খেলার দিন তো আমরা বাংলাদেশেরই সাপোর্টার। এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা পড়লেও। তবে বাংলাদেশ বাদে অন্য কোনো দলের সঙ্গে যদি পাকিস্তানের খেলা পড়ে তখন আমরা পাকিস্তান।'

'কেন ? বাংলাদেশের ব্যাপারটা আলাদা কেন ?'

'বা রে। এটা কোনো প্রশ্ন হলো! বাংলাদেশ আমাদের নিজেদের দেশ না!'

'নিজের দেশ তো কী হয়েছে ? খেলাটা ক্রিকেট না! এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কী ? যে দল ভালো খেলে, যার আছে শৌর্য-বীর্য-সাহস-দক্ষতা আর জয়ের রেকর্ড, তুমি তো তাকেই সমর্থন করবে!'

'তা করব। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নয়।'

'কেন নয় ?'

'কারণ বাংলাদেশ আমার দেশ। আমার জন্মভূমি।'

'হ্যাঁ। এ উত্তরটাই শুনতে চাইছিলাম। এটা আমার দেশ, এটা আমার জন্মভূমি— এই বাক্যটা একটা রাজনৈতিক প্রপঞ্চ। তুমি যে একটা দেশে জন্মাও, সেটা যে একটা দেশ; তার যে একটা মানচিত্র থাকে, সেটা রাজনৈতিক মানিচিত্র; তার একটা সীমানা থাকে, সেটা রাজনৈতিক সীমানা। আমি বাংলাদেশের নাগরিক— এটা একটা রাজনৈতিক পরিচয়। বৈধভাবে বিদেশযাত্রা করতে হলে তোমার একটা পাসপোর্ট লাগবে, বাংলাদেশের পাসপোর্ট— এ সবই রাজনৈতিক ব্যাপার। তুমি রাজনীতিই আনছ। খেলার মধ্যে রাজনীতি আনছ কেন ? তুমি না বললে খেলা আর রাজনীতি আলাদা!'

'আলাদা। সবক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু সবার ওপরে নিজের দেশ। দেশের প্রশ্নে অন্য সব বিবেচনা তুচ্ছ।'

'হ্যাঁ। সবার ওপরে নিজের দেশ। এটাও একটা রাজনৈতিক কথা। এটা যদি তুমি খেলার মধ্যে আনো, তুমি খেলার মধ্যেই রাজনীতি আনো।'

'হ্যাঁ। তাহলে আনব। হাজার বার আনব।'

'ভালো, তাহলে মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, খেলার সঙ্গে রাজনীতি মেশাতে নেই— এ কথাটা। প্রমণিত হয় ওটা কোনো বেদবাক্য নয়। ওটা কোনো অকাট্য স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়।

'আচ্ছা বাবা, মানলাম। তাতে কী এসে যায়।'

'তাতে এসে যায় এই যে, ১৯৭১ স্যালে শহীদ হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ, নিগৃহীত হয়েছেন ২ লাখ নারী— এই কথাটা চলে আসে, বারবার... কারণ সবার ওপরে দেশ ... তারো ওপরে মানবতা... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে কামান দাগিয়ে ছাত্রদের কাতারবন্দি করে নির্বিচার গুলি করে হত্যা; প্রফেসর জি সি দেব, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট, কী অপরাধ তার, তুমি পাকিস্তান বাহিনী, ২৫ মার্চ রাতে বাসা থেকে ধরে মারছ জি সি দেবকে, বন্দিশিবিরে ধীরেন দত্ত, একটু পানির জন্য হামাগুড়ি দিচ্ছেন...'

পাদটীকা : একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রচনা লেখার পর ততোধিক সংকীর্ণ একটি পুরোনো কৌতুক।

ট্রেনে যাচ্ছে এক পাকিস্তানী, আরেক বাঙালি। বাঙালিটা একটা বোঝা মাথার ওপরে বার্থে তুলতে চায়। কিন্তু পারে না। পাকিস্তানীটা সেটা তুলে দিয়ে বলে, রুটি খাও, তাহলে শক্তি হবে। এরপর বাঙালিটা ট্রেনের চেইন টানার চেষ্টা করে। কিন্তু তার গায়ে শক্তি কই। সে তো পারে না। প্যাকিস্তানী এগিয়ে আসে। চেইন টেনে সাহায্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে গার্ড এসে তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে। এবার বাঙালির মুখ খোলার পালা : ভাত খাও, বুদ্ধি হবে।

(সংকীর্ণতা : দোষের জন্যে রইলো ক্ষমা প্রার্থনা।)

প্রথম আলো ৩ জুন ১৯৯৯

আবার রোবটের গল্প

'বাংলাদেশ গণতন্ত্র নিরীক্ষা কেন্দ্র।' এটি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কারো কৌতূহল হওয়ার কথা নয়। কারণ দুপয়সা পকেটে পোরার জন্য কিংবা অবসর জীবনে ক্লান্তি দূর করার জন্য অনেকেই এ ধরনের একটা-দুটো কেন্দ্র পোষেন।

কিন্তু বাংলাদেশ গণতন্ত্র নিরীক্ষা কেন্দ্র হঠাৎ করেই অনেকের চোখে পড়ে গেছে। ব্যাপার কী ? ব্যাপার হলো বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরীক্ষা করার জন্য ওরা একটা রোবট এনেছে। বেশ বুদ্ধিমান রোবট। ওরা এর নাম দিয়েছে ওয়াচডগ। ওয়াচডগ কিন্তু তার নামটা সানন্দেই গ্রহণ করেছে। তাদের অফিসের তরুণ সংগঠক হাসান বলেছিল : মি. ওয়াচডগ। ডগ শব্দের অর্থ কুকুর। বাংলাদেশের মানুষ কুত্তা জানোয়ারটাকে তেমন পছন্দ করে না। অথচ তোমার মতো বুদ্ধিমান রোবটের নাম রাখা ওয়াচডগ। মানেটা দাঁড়ালো প্রহরী কুকুর। ব্যাপারটা কি ঠিক হলো ? এখন তো তোমাকে সবাই কুত্তার বাচ্চা বলে ডাকবে।

ওয়াচডগ চোখ থেকে নীল আলো বের করেছে। এর মানে সে হাসছে। আর বলছে, 'নামে কী এসে যায়! শেক্সপিয়র বলেছেন...'

'থাক, তোমাকে আর শেক্সপিয়র শোনাতে হবে না।'

'শোনো, ওয়াচডগ শব্দটার অর্থ মোটেও কুকুর নয়। আমি সেটা বুঝি। এরপরও যদি কেউ আমাকে কুকুর বলে, আমি মন খারাপ করবো না। কারণ আমি তো একটা রোবট আর ও হলো সত্যিকার প্রাণী। বুদ্ধিমান আর প্রভুভক্ত প্রাণী।'

যাক, বাংলাদেশ গণতন্ত্র দেখতে দেখতে এবং বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা বুঝতে বুঝতে ওয়াচডগের দিন ভালোই যাচ্ছে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ওয়াচডগ প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে। টিভিতে খবর দেখে। এ সময় অবশ্য তার ঘুম পায়। রোবটের কেন ঘুম পায়, এটা একটা রহস্য। এ রহস্যের এখনো কোনো সুরাহা হয়নি।

এমন বুদ্ধিমান একটা রোবট শেষপর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশ গণতন্ত্র নিরীক্ষা কেন্দ্রের মান ডুবিয়েছে। শুধু-যে ওই প্রতিষ্ঠানের মান ডুবিয়েছে তা নয়, পুরো বাংলাদেশের ইজ্জতের ওপর কজন বিদেশীর সামনে কালিমালিপ্ত করেছে।

ঘটনাটা এরকম :

নিরীক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক তহবিলটা আসে বিদেশ থেকে। দাতারা দিয়ে থাকেন। দাতাদের পক্ষ থেকে কজন বিদেশী এসেছেন সরেজমিন পরিদর্শনে, বাংলাদেশে। স্থানীয় পাঁচতারা হোটেলে এই বিদেশীদের নিয়ে একটা জামায়েত। এতে বিদেশী কূটনীতিকরা আছেন, স্থানীয় সাংবাদিকরা আছেন। রোবট মি. ওয়াচডগ এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হলঘর নির্ধারিত অতিথিদের উপস্থিতিতে সরগরম। ওয়াচডগ কী বলে, সবাই তা শুনতে চায়!

প্রথমেই একজন বিদেশী জিজ্ঞেস করল ওয়াচডগকে, 'বাংলাদেশ দেশটা কেমন?'

ওয়াচডগের চোখ থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। সে বলল, 'খুবই মজার। এখানে পরিহাসকে জাতীয়করণ করা হয়েছে।'

'তা কেমন ?'

ওয়াচডগ বলল, 'সবাই রসিক। কর্তাব্যক্তিরা আরো বেশি রসিক। যেমন ধরুন ঢাকার মেয়র মো. হানিফ। তিনি ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান। দীর্ঘদিন তিনি আন্দোলন করেছেন ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে ক্রিকেটের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে। ফুটবল টিম সাফ গেমসে রানার্স আপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোমর শক্ত করে মাঠে নেমেছেন। ক্রিকেট দল তখন ইংল্যান্ডে। এই সুযোগ। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের পিচ খুঁড়ে ফেলা হলো। আহ! কী শান্তি। আর যখন ক্রিকেটদল বিশ্বকাপে ভালো খেলে দেশে ফিরল, সেই মো. হনিফই হলেন সংবর্ধনা কমিটির প্রধান। এটা হলো জোক অফ দি ডিকেড। এই দশকের প্রধান কৌতুক। তা আমাকে এত আনন্দ দিয়েছে যে, মনে পড়লেই হাসি পায়।'

সভায় যোগদানকারী একজন-দুজন রোবটের কথার প্রতিবাদ জানাতে উঠল। 'মেয়র হানিফ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে ক্রিকেটমুক্ত করতে চান এটা ঠিক নয়।' তারা বলল।

'তাহলে তো তিনি বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে ফুটবলমুক্ত করতে চান ?' ওয়াচডগ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন শ্রোতা উঠে দাঁড়াল এ-কথার প্রতিবাদ জানাতে। যাক, উদ্যোক্তাদের হস্তক্ষেপে আবার সভার কাজ শুরু হলো।

'আচ্ছা, এ দেশের রাজনীতি বলতে তুমি কী বোঝো?' বললেন একজন বিদেশী প্রতিনিধি।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াচডগের চোখ থেকে লাল আলো বেরুতে লাগলো। বেজে উঠল বিপদের অ্যালার্ম। তারপর দপ করে জ্বলে উঠে ধোঁয়া ছাড়িয়ে নষ্ট হয়ে গেল রোবটটা।

এই রোবট বানিয়েছিল রোবোকম নামের প্রতিষ্ঠান। তাদের হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও এখানে উপস্থিত। তিনি খুব লজ্জা পেলেন। বললেন, 'সুধীমণ্ডলী, আপনারা ক্ষমা করবেন। ওয়াচডগের সার্কিটে কী একটা ভাইরাস ঢুকে গেছে। আমি সার্কিটটা ক্লিন করে আবার একে চালু করতে পারব। আপনারা বসুন। সবার সামনেই এটার চিকিৎসা করি। তাতে জানা যাবে ভাইরাসটা কী প্রকৃতির।'

হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রোবটটা ওপেন করলেন। অনেকক্ষণ খেটেখুটে দেখা গেল, ওয়াচডগের মেমোরিতে পলিটিক্স ফাইলে একটা জটিল সমস্যা হয়েছে।

ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরবর্তী নির্বাচনের সময় সংক্রান্ত উক্তি। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে বললেন, তিনি নির্বাচন দেবেন ২০০০ সালের মধ্যেই। কাজেই বিরোধীদলের অস্থির হওয়ার কিছু নেই। পুরো জাতির মতো ওয়াচডগও এ ঘোষণটিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। সে বিশ্লেষণ করতে চায়, কেন শেখ হাসিনা ২০০০ সালের মধ্যে নির্বাচন দিতে চান। এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০০ সালের মধ্যে নয়, যথাসময়েই নির্বাচন দেয়া হবে। তখন ওয়াচডগের সার্কিটে প্যাঁচ লেগে যেতে শুরু করে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই একই লোক দু-কথা বলে কী করে?

তার কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যখন নির্বাচন দিলে আবার ক্ষমতায় আসতে পারব, তখনই নির্বাচন দেব। ওয়াচডগ চিন্তিত হয়ে পড়ে। ব্যাপার কী! এই যদি তার মনে, তাহলে আগের দুটো ঘোষণার মানে কী? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, উনি যদি দেখেন, এবার তার নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই, তাহলে কি উনি নির্বাচন দেবেন না এবং যদি উনি নির্বাচন দেন, তাহলে ধরে নিতে হবে তার দলই নির্বাচনে জিতছে!

ব্যাপারটা খোলসা করার জন্য সে একজন স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের শরণাপন্ন হয়। আচ্ছা, এই শেখ হাসিনা একই বিষয় নিয়ে একেকবার একেক রকম কথা বলছেন, এর মানে কী?

পর্যবেক্ষক জাবাব দেয়, 'রাজনীতি। এ ধরনের কথাকে বলা হয় রাজনৈতিক উক্তি। এসবের কোনো মানে নেই। এসব কথা বলা হয়, কিন্তু বলার জন্যই বলা। যে বলে সে জানে, তাকে এ কথা রাখতে হবে না। কাজেই সে যা ইচ্ছা তাই বলে। তার কথাবলাটা সার্থক হয় যদি রাজনীতিতে এই উক্তি তার বিরোধীদের ক্ষতিসাধন করতে পারে। সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন এখানে জড়িত নয়, জড়িত হলো বিরোধীদের ঘায়েল করার প্রশ্ন। শেখ হাসিনার এ উক্তিতে বিরোধী ডিস্টার্বড হয়েছে। তারা তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না।'

'ও, তাহলে রাজনীতি মানে যা-ইচ্ছা-তাই বলার গ্যারান্টি।' ওয়াচডগ তার প্রোগ্রামের মধ্যে এই সূত্রটা ভরে নেয়। এবং সে রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিটা উক্তিকে 'পরিবর্তনযোগ্য' বলে চিহ্নিত করে। এর ফলেই ঘটে বিপদ। সে রাজনীতির ফাইল খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব ডাটা পরিবর্তিত হতে থাকে। রোবটের সার্কিটেই গোলযোগ দেখা দেয়।

হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে এসব কথা শোনার পর স্থানীয় শ্রোতাদের মাথাটা কি হেঁট হয়ে যায় না?

প্রথম আলো, ২৪ জুন, ১৯৯৯

সম্পাদক দায়ী নহেন

কিছু কিছু বইপত্র লেখার সুবাদে প্রকাশকগণের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। প্রকাশক শব্দটার পাশে 'দের' না বসিয়ে আমি সচেতনভাবেই 'গণ' শব্দটা বসিয়েছি। তাতে তাদের সম্মান জানানো হয়। আমার মতো ক্ষুদ্র লেখকেরা প্রকাশকগণকে সম্মান জানাবেন—এটাই স্বাভাবিক। আমিও সম্মান জানাই। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি। তাদের যাতে উপকার হয় সেটা আন্তরিকভাবেই চাই।

পত্রপত্রিকায় যদি কোনো ভালো লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকে, ঝানু প্রকাশকের নজরে তা পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। এই লেখকটি কে, এর লেখাটিকে বই হিসেবে প্রকাশ করার সুযোগ কীভাবে পাওয়া যায়— সে বিষয়ে প্রকাশকগণ তৎপর হন। এমন সব ক্ষেত্রেই দুএকজন প্রকাশক আমার কাছে আসেন।

'অমুক লেখটি তো ভালো, বই করা যায়, কী বলেন?'

আমি ভেবেচিন্তে জবাব দেই, 'হ্যাঁ ভালো, বই করা যায়।'

'আচ্ছা, কার কাছে গেলে অনুমতি পাওয়া যাবে? সম্পাদকের কাছে গেলে হয়?'

'না। কেন? লেখক তো সামনের মাসে ঢাকা আসছেন। তখন গিয়ে ধরেন।' আমি বলি।

'আপনি কি একটু ফোন করে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেব।'

আমাদের কথাবার্তা হয় এরকম।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যেসব লেখার জন্য প্রকাশকদের আগ্রহ দেখেছি তার মধ্যে আছে— মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, বঙ্গভবনের স্মৃতি, সেনাবাহিনীতে কী ঘটেছিল।

মুহম্মদ জাফর ইকবালের কলাম বা আনিসুজ্জামান স্যারের স্মৃতি—এ ধরনের লেখাও প্রকাশকদের জন্য খুবই লোভনীয় বিষয়।

হাবিব রহমান সাহেব একজন প্রবীণ প্রকাশক। কিন্তু পুঁজি কম থাকায় তিনি পুস্তক ব্যবসায় তেমন সুফল অর্জন করতে পারেননি। হুমায়ূন আহমেদের আশপাশেই তিনি যেতে পারেন না। জাফর ইকবাল বা ইমদাদুল হক মিলনও তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন ব্যবসা চাঙা করার জন্য। নইলে ঋণের দায়ে তাকে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে দিতে হয়।

আমার সঙ্গে হাবিব সাহেবের প্রায়ই দেখা হয়। আমি তাকে পছন্দ করি- তার সৃষ্টিশীল আইডিয়ার জন্য। অল্প পুঁজিতে কীভাবে দারুণ বিক্রিয়োগ্য বই প্রকাশ করা যায় এ নিয়ে তার কিছু আইডিয়া আছে। যেমন তিনি গত বছর বের করেছেন পৃথিবীর নিষিদ্ধ গল্প। বাংলা ভাষার নিষিদ্ধ পুস্তক। সেদিন তার সঙ্গে দেখা তার বাড়ির সামনে। বাড়িটি পুরোনো। তবে সামনে বাগান আছে। আছে একটা কাঁঠালগাছ। গাছে ছোট ছোট কাঁঠাল ধরেছে। গাছের নিচে এঁচোড় ঝরে পড়ে আছে। একটা এঁচোড় হাতে তুলে নিয়ে বললেন : এই মৌসুমই শেষ। কয়েকদিন পর বাড়িটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন আর কাঁঠাল খেতে হবে না।

আমি বললাম, গত বছর যে নিষিদ্ধ গল্প, নিষিদ্ধ পুস্তক বের করলেন তাতে লাভ হয়নি ?

'না। ওই নিষিদ্ধ বইয়ের চেয়ে আজকালকার প্রসিদ্ধ বইয়ে সেক্স থাকে বেশি। কী কাজে যে ওগুলো নিষিদ্ধ হয়েছিল ?'

আজ হাবিব রহমানের সঙ্গে আবার দেখা। মুখে হাসি। বললেন, স্লামালেকুম ওয়াজেদ সাহেব।

বললাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন মনে হচ্ছে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ। সত্যি ভালো আছি।

'তাই নাকি ? শুনে ভালো লাগছে।'

'শোনেন। বাড়িটা বেহাত হচ্ছে না। ব্যবসায় ভালো করছি।'

'সুখবর। কী করে হলো ?'

'নতুন একটা বই করতে যাচ্ছি। নিষিদ্ধ বই। সুপারহিট হবে দেখবেন। মার মার কাট কাট।'

'বলেন কী ? রয়্যালটির টাকা লাগবে না ?'

'না। লাগবে না।'

'তা বইটা কী ?'

'নাম এখনো ঠিক করি নাই। তবে বিষয়টা হলো জাতীয় সংসদের এক্সপাঞ্জড কার্যবিবরণী। জম্পেশ বিষয়। ভাই, গত বছরের নিষিদ্ধ পুস্তকে যে স্বাদ দিতে পারি নাই এবার সেটা দিয়ে দেব। পাঠক এবার হতাশ হবে না।'

'বলেন কী! এক্সপাঞ্জড জিনিস তো ছাপা যাবে না। অনুমতি পাবেন না।'

'কেন। আমি তো সরকারি কার্যবিবরণী ছাপছি না। আমি ছাপতে যাচ্ছি রেডিও থেকে। রেডিওতে যা প্রচারিত হয়েছে আমি তা রেকর্ড করে নিয়েছি। সেটা থেকে শ্রুতিলিখন চলছে। খুবই লজ্জার ব্যাপার। প্রথমে ভাবছিলাম নিজের ছেলেমেয়েদের লাগিয়ে দেব ক্যাসেট শুনে লিখতে। পরে শুনে দেখি খুব শরমিন্দা কথাবার্তা। কান লাল হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের দিয়ে লেখাতে পারলাম না। আচ্ছা, এক কাজ করি, সম্পাদনায় আপনার নাম দিয়ে দেই। ওই ধরনের লেখালেখিতে তো আবার আপনার নামডাক আছে।'

আমি আঁতকে উঠলাম। আমার নাম কি এই ধরনের বিশেষ লেখালেখির বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে নাকি! 'না ভাই। এসবের সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না।'

'আমি টাকা দেব।'

'কত ?'

'ত্রিশ হাজার।'

'উল্টো আমিই আপনাকে টাকা দেব। তবু জাতীয় সংসদের এসব খিস্তিখেউড়ের সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না।' আমি উল্টোদিকে দৌড় ধরলাম। তিনি আমার শার্ট টেনে ধরলেন।

বললেন, ভাই নামটা কী দেব এটা একটু বলে যান।

আমি বললাম, নাম যাই দেন, এটা লাগিয়ে দিয়েন : কেবল 'প্রাপ্তবয়স্কের জন্য'। এবং এটাও দিয়েন, মতামতের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক দায়ী নয়।

'তাহলে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত খিস্তিখেউড় নামটাই ফাইনাল করি। কী বলেন ?'

আমি তখন দৌড়াচ্ছি, মান ইজ্জত হাতে নিয়ে।

প্রথম আলো, ১ জুলাই ১৯৯৯

দুর্নীতি-সমুদ্রের এক শৈবাল বলছি

আমার মাথাটা মনে হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

মাছের বাজারে গিয়ে একটা রুইমাছের দাম করি। দুশো টাকায় ফয়সালা হয়। পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে দিই। মাছঅলা লোকটা একটা পলিথিনে ভরে মাছটা দিয়ে দেয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। কী আশ্চর্য, লোকটা আমাকে মাছটা দিয়ে দিল কেন ? বোকা নাকি!

বলতে পারেন, আমি তো তাকে টাকা দিয়েছি। এর বিনিময়ে সে আমাকে মাছটা দিতে বাধ্য।

তাহলে আমাকে একগাল হাসতে হবে। আরে ভাই, আপনি যেটা বলছেন, সেটা হলো নিয়মের কথা। বাংলাদেশে কি নিয়ম বলতে কোনো জিনিস আছে নাকি! অনিয়মই কি এখানে নিয়ম নয় ?

আমার বাসায় একটা টেলিফোন আছে। এনালগ। আমি নিয়মিত বিল পরিশোধ করি।

বিল প্রত্যেক মাসেই বেশি আসে। নিজে গুনে গুনে ফোন করেছি। বিল এসেছে তার চারগুণ। কারণ কী ? কারণ আছে। ঢাকা শহরে প্রচুর দোকান আছে— 'এখানে ফোন করা হয়'। বাংলাদেশের যেখানেই ফোন করুন না কেন, দিতে হবে ১৫ টাকা। এসব দোকানের সঙ্গে টিঅ্যাণ্ডটির কর্মচারীদের চুক্তি আছে। যতই বিল আসুক না কেন, তারা বিল কমিয়ে দেবে। বিনিময়ে টিঅ্যান্ডটির কর্মচারীদের পকেটে একটা কিছু ঢুকবে। শুধু ফোন-ফ্যাক্সের দোকান নয়, যারা বেশি বেশি ফোন করেন তাদের অনেকেরই সঙ্গে টিএণ্ডটি কর্মচারীদের এই চুক্তি। উৎকোচের বিনিময়ে দূরালাপনী ভাতা-হ্রাসকরণ চুক্তি (উ-বি-দূ-ভা-হ্রা-চুক্তি)।

তো টিঅ্যান্ডটির এই হিসাবের গড়মিল তো মেলাতে হবে। বোঝাটা চাপে তাদের ওপর, যারা উ-বি-দূ-ভা-হ্রা-চুক্তিতে যুক্ত নন।

নাট্যপরিচালক সাইদুল আনাম টুটুল একবার টেলিফোন কেটে রেখে দিয়েছিলেন সারা মাস। তবুও মাস শেষে পেয়েছিলেন হাজার হাজার টাকার বিল।

যাক। আমার নামে বেশি বিল আসে। আমি দেই। কিন্তু তবুও আমার টেলিফোনটি কেটে দেয়া হয়েছে। ব্যাপার কী? টিঅ্যান্ডটি বোর্ডের খাতায় আমার দেয়া বিলটি এন্ট্রি হয়নি! কেন হয়নি? সে দোষ কি আমার! তাতে কী! লাইন কাটা যাবে!

এক্ষেত্রে ব্যাপার কী দাঁড়াল? আপনি টাকা ঠিকই দিচ্ছেন, কিন্তু জিনিস পাচ্ছেন না। এটা যদি টিঅ্যান্ডটিঅলারা করতে পারে, তবে মাছের দোকানদার করতে পারবে না কেন! আপনি দাম দেবেন, সে সেটা পকেটে গুঁজে বলবে, এন্ট্রি হয়নি, মাছ হবে না।

এটা যে শুধু টিঅ্যান্ডটির বেলায় প্রযোজ্য, তা নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে আপনি বিদ্যুৎ বিল কমাতে পারেন।

ঢাকা শহরে যতজন ড্রাইভার আছেন, তাদের ৯০ ভাগের ড্রাইভিং লাইসেন্স নকল। এই নিয়ে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। তাতে কী হয়েছে! কিছু তো হয় না। ৩০০ টাকা খরচ করে নকল লাইসেন্স বের করে আপনি চলতে থাকুন রাজপথে। বৈধ লাইসেন্সের বহু ল্যাঠা। তিনটা পরীক্ষা দিতে হয়— লিখিত, মৌলিক, প্রাকটিক্যাল। আমাদের ড্রাইভাররা 'লিখিত' পরীক্ষায় বসবেন—এটা আশা করাই তো বোকামি!

আমাদের স্কুল-কলেজগুলোর দিকে তাকান। প্রায় প্রতিটি শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী তারা তা করতে পারেন না। প্রতিটা পাবলিক পরীক্ষা এখন নকলের হাট। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হয়—নকলের ভ্যাট। ওটা নাকি দিতে হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে! নকলের দায়ে বহিষ্কারের তালিকায় শিক্ষকেরা থাকেন, পরীক্ষকেরা থাকেন, পরিদর্শকেরা থাকেন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরীক্ষাকেন্দ্রে পালা করে ঘুরে বেড়ান, মহড়া দেন— নকল ঠিকঠাক চলছে তো!

এদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আছে পুলিশ এবং বেশিরভাগ পুলিশই আইন ভঙ্গ করে সবার আগে— ঘুষ খায়। এদেশে সুশাসনের জন্য আছে প্রশাসন, আর প্রশাসন মানেই দুর্নীতি। এদেশে ডাক্তারিতে দুর্নীতি, প্রকৌশল পেশায় দুর্নীতি। দুর্নীতি নাই কোথায়।

আমি একবার গিয়েছিলাম নেত্রকোনায়। রাত ১২টায় গেলাম এক যাত্রা-সার্কাসের আসরে। গিয়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। নানা কায়দায় বসেছে জুয়ার আসর। হাউজি। তীর ছুড়ে মারা। চক্র ঘোরানো। ধুপধুনা জ্বালিয়ে চক্ষু বুজে আছেন একজন। তিনিই এই আসরের প্রধন আয়োজক। খানিকক্ষণ পরপর থলে ভরতি টাকা এনে রাখা হচ্ছে তার পায়ের কাছে। তখন বিএনপি আমল। জানলাম, ইনি একজন বিএনপি নেতা।

তার কানের কাছে গিয়ে একজন জানাল— ঢাকা থেকে সাংবাদিক এসেছে। তিনি চক্ষু উন্মীলন করলেন। বললেন, ঢাকা থেকে সাংবাদিক আসছে। কত চায়?

জানা গেল, এই জুয়ার আসর থেকে ডিসির নামে যায় প্রতিরাতে ৩ হাজার, এসপির নামে ২ হাজার। সত্য-মিথ্যা জানি না। যদি সত্য হয়, তবে এক জুয়ার আসর থেকে ডিসি সাহেবের মাসিক আয় ১ লাখ টাকা।

মাথাটা তাই খারাপ হতে চায়। মনে হয়, রাস্তায় সুন্দর গাড়িতে চড়া সুন্দর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি— মা, তোমার আব্বা কী করেন? ঘুষ খান, নাকি ঋণখেলাপি

করেন ? নাকি চুরি করেন ? নাকি ফেনসিডিল আনা-নেয়া করেন। বলতে বলতে বলি না। জেনুইন সৎলোকের মেয়েও তো হতে পারে।

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। প্রধানমন্ত্রী কি বলতে পারবেন, তার মন্ত্রিপরিষদে কেউ ঘুষ খায় না। বলতে পারলে উনি বলুন।

ঢাকা শহরে গাড়ির পার্টস চুরি হলে ধোলাইখাল যেতে হয়। ওরা বলে, আপনার পার্টস এখনো আসেনি। দুদিন পরে আসেন। দুদিন পরে গিয়ে নিজের গাড়ির পার্টস নিজেই কিনে আনা যায়। অথচ কেউ এই গাড়িচোর-চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না।

আপনার জমিতে আপনি বাড়ি বানাবেন, এসে বলবে, মালপানি ছাড়ো। না ছাড়লে চলবে না। আপনার দোকানে আপনি ব্যবসা করবেন। চাঁদা দিতে হবে। অবশ্যই।

আমরা অন্যায়-দুর্নীতি-অপরাধ-ঘুষের সমুদ্রে নিমজ্জিত। এ অবস্থায় যখন দেখি, এখনো টাকা দিলে জিনিস পাওয়া যায়, বিস্ময় লাগে। বোকা নাকি! বলে দিলেই তো হতো— টাকা নিয়েছি বলে জিনিস দিতে হবে নাকি! দেব না। ব্যস। কী করবি কর!

এ-কথা বললে আপনি কী করবেন! আপনি কী করবেন, আপনি ঠিক করুন। তবে আমি যা করব, সেটা খুব মারাত্মক।

আপনি যদি জানতে চান, চুপি চুপি বলে দেব। নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজের দুই ওষ্ঠ দ্বারা...

প্রথম আলো, ৮ জুলাই ১৯৯৯

রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?

এ গল্পটা আপনারা সবাই জানেন। ছোটবেলায় এ গল্পটা আমি প্রথম পড়ি দেব-সাহিত্য কুটিরের একটা বইয়ে। পরে দেখতে পাই, গল্পটা নিয়ে একটা কিশোরনাটক রচনা করেছেন কবি আসাদ চৌধুরী। আর সেটা স্থান পেয়েছে বোর্ডের স্কুলপাঠ্য বইয়ে। আরো একটু পরে শুনতে পাই আবৃত্তির ক্যাসেটে— একই কাহিনীকে কবিতা আকারে লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। একই গল্প, ছবিতে ভরপুর, চীনা সংস্করণ, তার বাংলা অনুবাদ—ছোট্ট সুন্দর বই হয়ে বেরিয়েছে— দেখতে পেলাম, আমার মেয়ে কিনে এনেছে নিউমার্কেট থেকে। সুতরাং গল্পটা যে সবাই জানেন, তাতে সন্দেহ নেই। বোকা রাজার গল্প।

রাজার খুব পোশাকের শখ। দেশ-বিদেশ থেকে মূল্যবান আর দুর্লভ পোশাক সংগ্রহ করেন তিনি।

তো একবার হলো কী, তার দরবারে হাজির হলো দুই বিদেশী। তারা বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি তারা বানিয়ে দিতে পারে।

শুনে তো রাজা মহাখুশি। তাদের জন্য দেয়া হলো বিশেষ বাসস্থান। খাবারদাবার অনন্ত। তারা সারাক্ষণ ঘর বন্ধ করে তাঁত বোনে। আর মাঝেমধ্যে রাজদরবারে জানিয়ে দেয় টাকার চাহিদা। রাজকোষ যেন তাদের জন্য অবারিত। যা চায়, তারও চেয়ে বেশি পায় তারা।

রাজা তো অস্থির! আর কদিন লাগবে পোশাক বানানো শেষ হতে ?

'হবে, হবে। যে-সে পোশাক তো নয়, পৃথিবীর সেরা পোশাক।'

তারপর একদিন কাপড় বানানো সম্পন্ন হলো। তাঁতি দুজন বলল, মহারাজ, এ পোশাক খুবই সূক্ষ্ম এবং জাদুকরি। কেবল বুদ্ধিমানেরাই এ পোশাক দেখতে পাবেন। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে, পৃথিবীশ্রেষ্ঠ পোশাকও পরা হবে, আর কার মাথায় ঘিলু আছে, কার নেই— সে পরীক্ষাও হয়ে যাবে।

এ বর্ণনা বাহুল্য। ঘটনা তো সবাই জানেন। দিগম্বর রাজা ভাবলেন, শালা, আমার মাথা তো দেখছি মগজশূন্য, ঘটনা চেপে যাওয়া ভালো। বুক ফুলিয়ে তিনি গেলেন রাজসভায়। পারিষদরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো। পোশাক দেখতে পাচ্ছি না— এ-কথা স্বীকার করল না কেউ-ই। এমনকি যখনই ওই জন্মদিনের পোশাক-পরা রাজা রাস্তায় নামলেন, তখনো প্রজাদের কেউ বলল না যে, রাজার গায়ে কাপড় নেই।

শুধু এক বোকা-সোকা ছেলে, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলো, চিৎকার করে বলে উঠল : রাজা, তোর কাপড় কই ?

আবৃত্তির ক্যাসেটে এই জায়গাটা বেশ জোরেশোরে বলা হয়— রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার কবিতা শেষ করেছেন এভাবে যে, আজ আমাদের দেশে দরকার এমনি বোকা-সোকা, স্পষ্টভাষী বালক, যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে রাজার পরনে কাপড় নেই, যে চিৎকার করে বলবে রাজা তোর কাপড় কোথায় ?

তারপর গল্পে কী হলো ?

বালকের কথা শুনে একজন-দুজন ফিসফিস করতে শুরু করল— তাই তো, রাজা দেখি ন্যাংটো। ছিল ফিসফিসানি, তাই একসময় পরিণত হলো গর্জনে। রাজার পক্ষে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না বাস্তবতা। একটা চাদর পরে তিনি লজ্জা ঢাকলেন আর দৌড়াতে লাগলেন রাজধামের দিকে।

নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় পরে নিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন— কোথায় গেল দুই ঠকবাজ, ধরে শূলে চড়াও নরাধম দুটোকে। কিন্তু ততক্ষণে প্রতারকদ্বয় পগার পার।

যে গল্পটা এতক্ষণ ধরে বর্ণিত হলো, সেটা সেকালের গল্প। কিন্তু একালের গল্প এতটুকুনেই শেষ হয়ে যায় না। তাতে আরো কিছু যুক্ত করা দরকার হয়ে পড়ে।

রাজা যখন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ দিয়ে নাঙ্গাবাবা হয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন, তখন এক বালক চিৎকার করে উঠল : রাজা, তোর কাপড় কই ?

রাজা সে-কথায় পাত্তা দিলেন না।

তখন জনতার মধ্য থেকে রব উঠল : রাজা ন্যাংটো, রাজা ন্যাংটো।

রাজা সে-কথায় গা করলেন না। তখন সভাসদরা বলতে লাগল : মহারাজ, আপনার গোপন ব্যাপারটি আর গোপন রইছে না। লজ্জা ঢাকুন। এই নিন উত্তরীয়।

রাজা বললেন : কেন, উত্তরীয় নেব কেন ? আমার তো এইরকমই বেশ লাগছে! নির্ভার লাগছে। গায়ে বাতাস খেলছে। শরীরের এসব জায়গায় তো কখনো এত ভেন্টিলেশন ছিল না।

কিন্তু মহারাজ, আপনি বুঝতে পারছেন না— লোকে ছি ছি ছি করছে।

ছি ছি ছি করছে ? ছি ছি ছি করলে কী ক্ষতি ? আর ছি ছি ছি করবেই বা কেন ? আমাদের ত্যাগতিতিক্ষা আছে। দুই যুগ ধরে এই রাজ্যের জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করছি। এর বিনিময়ে আমি যা-খুশি তা করতে পারি।

'যা-খুশি তা করতে পারেন ?'

'কী পারি না ? আমি রাজা। আমি যা-খুশি করব না ?'

'করবেন, কিন্তু লাজলজ্জার মাথাটাও কি খাওয়া সঙ্গত, মহামহিম ?'

'কেন ? লাজলজ্জার মাথা খাওয়ার কথা আসছে কোত্থেকে ?'

'এই যে-অবস্থায় আপনি এখন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে...'

'তাতে কিছু যায় আসে না। এই রাজ্য আমার তৈরি। এই রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক আমি। সব আমার। বলো, আমার না ?'

'আজ্ঞে, আপনার।'

'সব প্লট আমার। সব পদ আমার। রাজদূতের চাকরি আমার। সব পুরস্কার আমার। আমার। তোমরা আমার। এতে লজ্জা কী ? সব কিছু ওলটপালট করা... হো হো হো—আবার সোজা করো— হো হো হো— যা-খুশি তাই করব... যেমন খুশি তেমন চলব—লোকে দেখিয়ে দিলেই কী, ধরিয়ে দিলেই কী! আমি মহাপরাক্রম সম্রাট—আমি কাউরে পুছি না... আর লজ্জা ? লজ্জা নারীর ভূষণ...রাজার জন্য অ্যাপেন্ডিক্স— ওটা কেটে ফেলো, ঝেড়ে ফেলো... হা হা হা।'

প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ১৯৯৯

জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা করো, মাবুদ

শামীমুজ্জামান পত্রিকা পড়ছিলেন। হঠাৎ একটা খবরের শিরোনামে তার চোখ আটকে গেল। তিনি এই খবরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর নয়। রেপ নয়। খুন নয়। মন্ত্রিপরিষদের রদবদল নয়। তবু এই ছোট্ট এক কলাম খবরটা তার চোখে ধরল। কেন ?

'বিরোধী দলের রোডমার্চ হচ্ছে। এখনি আর হরতাল নয়।' এই হলো খবরের শিরোনাম। ২১ জুলাই ১৯৯৯-এর 'প্রথম আলো'র খবর।

আচ্ছা, খবরটা তার মনে একটা দোলা দিয়ে গেল কেন ?

শামীমুজ্জামান ভাবতে লাগলেন। সকালের নাশতার টেবিলে তার চা ঠাণ্ডা হতে লাগল।

হরতালের সঙ্গে রোডমার্চের মেলা পার্থক্য। আগামীকাল হরতাল হতে পারে—এই ছিল পত্রিকার আগের খবর। এখন যদি বিএনপি হরতাল দিত, তাহলে তার পুরো স্বাভাবিক জীবনের ছকটাই পাল্টে ফেলতে হতো। তাকে সাভার যেতে হয় রোজ একবার। হরতাল মানে ওই প্রোগ্রাম বাতিল। একটা সরকারি অফিসে তার একটা কাগজ আটকে আছে। এটা আগামীকাল পাওয়ার কথা। কাল না পেলে রোববার। রোববার পেলে পরবর্তী ধাপ পেরুতে পেরুতে সময়সীমা যাবে পেরিয়ে। তার একটা বিমানের টিকেট বাতিল করতে হবে।

এরকমই হয়। একটা কাজের সঙ্গে আরেকটা কাজ মালার মতো গাঁথা থাকে। একটা দানা পড়ে গেলে পরেরটাও পড়ে যায়। পুরো মালা ছিঁড়ে যায়।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মাসুমের কথা। তার ভাগ্নে। ঝিনেদায় থাকে। একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে। ক্লাস টেনে পড়ত। হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট। ডাক্তার বলল, এখানে চিকিৎসা হবে না, ঢাকায় নিতে হবে।

এমন একদিন বলল, তখন হরতাল। কোনো কিছু চলছে না। ঝিনেদায় একটা অ্যাম্বুলেন্সও পাওয়া গেল না। কী করা যাবে? অতিকষ্টে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে ঢাকার দিকে রওনা দিয়ে ঘাটে এসে দেখা গেল ফেরি বন্ধ।

না। মাসুমকে বাঁচানো যায়নি।

হরতালের খবর পড়লেই তাই শামীমুজ্জামানের বুক কেঁপে ওঠে।

সে কারণেই হরতাল হবে না শুনে তার মনের মধ্যে একটা স্বস্তির বাতাস বহে গেল।

শুধু কি তাই? লংমার্চ কর্মসূচিটারও হয়তো কিছু ইতিবাচক দিক তার চোখে পড়েছে। এই প্রথম রাজনৈতিক দলের কোনো কর্মসূচি তার দৃষ্টিগোচর হলো যেটা দেখে জনগণ ভয়ে পালাচ্ছে না, বরং রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছে, তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

এ কথা মনে হতেই শামীমুজ্জামানের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল : আচ্ছা, রাজনৈতিক দলগুলো তো জনগণের সেবক। তারা যা করে তার সবই দেশের মানুষের স্বার্থে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলেন একজন নেতা। মানুষের বিপদে-আপদে একজন নেতাই এগিয়ে আসেন সবার আগে। তাই যদি হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সভা-সমাবেশ দেখে মানুষ পালায় কেন?

শামীমুজ্জামান তার মনে দুটো ছবি আঁকলেন।

ছবি–১ : যেমনটি হওয়ার কথা

মিসেস নাসরিন এক বাস বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছেন স্কুলে। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। বাচ্চারা সবাই গান ধরেছে রিং আ রিং আ রোজেস... নাসরিন সবার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন। হাততালি দিচ্ছেন।

তাদের ড্রাইভার মাথা বের করে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। উভয় ড্রাইভারের মুখেই হাসি।

ব্যাপার কী? এত হাসি কেন?

ড্রাইভার সহাস্য বদনে বলল, সামনে একটা মিটিং হচ্ছে। পলিটিকাল পার্টির মিটিং।

বাচ্চারা হাততালি দিয়ে উঠল সজোরে।

ড্রাইভার বলল, আমরা মিটিঙের পাশ দিয়ে যাব।

নাসরিন বললেন, সভার পরে নিশ্চয় শোভাযাত্রা হবে। শোভাযাত্রা মানে সুন্দর যাত্রা। আমাদের ভাগ্য ভালো। আমরা একটা সুন্দর প্রসেশন দেখতে পাব।

বাচ্চারা আবার হাততালি দিয়ে উঠল।

নাসরিন বললেন, শোভাযাত্রা দেখলে বুকে একটু সাহস আসে। শোভাযাত্রায় নেতারা থাকেন, দেশসেবক কর্মীরা থাকে। কোনো বিপদ-আপদ হলে ওরা আমাদের

আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবেন। কাজেই যতক্ষণ শোভাযাত্রার সঙ্গে আছি, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ।

ড্রাইভার বলল, আর মাত্র দুমিনিট। তারপরই আমরা মিটিঙের পাশে চলে যাব।

'হুররে'— বাচ্চারা উল্লাস প্রকাশ করল।

ছবি–২ : আসলে যেমন হয়

বাসভরতি বাচ্চারা গান গাইছিল— রিং আ রিং আ রোজেস...। হঠাৎ হার্ড ব্রেক কষল ড্রাইভার। বাচ্চারা ছিটকে পড়ল সামনে।

'কী হলো! ড্রাইভার পাগল হয়ে গেলেন না তো!' কেয়ারটেকার নাসরিন তারস্বরে বলল।

'সর্বনাশ হইয়া গেছে আপা। আল্লা আল্লা করেন। সামনে মিছিল।'

বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। তার কাচ ভাঙা। ডাইভারের মাথায় মনে হয় কাচ লেগেছে, রক্ত পড়ছে। সে ছুটতে চাইছে পাগলের মতো। কিন্তু সামনে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে আটকে গেছে।

'কী খবর ওই দিকে?' স্কুলবাসটির ড্রাইভার বলল।

'আরে মিয়া ঘুরাও গাড়ি। ভাঙচুর শুরু হইয়া গেছে।'

বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। স্কুলবাসটি ঘোরার চেষ্টা করছে। 'ধর ধর' শব্দ আর ককটেলের কানফাটানো আওয়াজ। একদল লোক বড় বড় চ্যালাকাঠ হাতে এদিকেই আসছে।

একটা ছোটমেয়ে বাসে কাঁদছে— আম্মি... আম্মি...।

নাসরিন আল্লাহকে ডাকছে— লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা... জোয়ালিমিন। হে আল্লাহ, আমাকে জালেমের জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করো।

প্রথম আলো, ২২ জুলাই ১৯৯৯

সে সব কাহার জন্য ?

রোডমার্চ লঞ্চমার্চের চলার পথে প্রতিটি এলাকার হাজার হাজার লোক কাফেলার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান তুলেছে— 'ভারতের শেখ হাসিনা বাংলা ছাড়', 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ... বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'জয় বাংলায় লাথি মার... জিন্দাবাদ কায়েম কর।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ জুলাই ১৯৯৯

১

এটা কি সত্য, রোডমার্চ-লংমার্চকারীরা এই স্লোগান দিয়েছে? এই স্লোগান? জয় বাংলায় লাথি মার... জিন্দাবাদ কায়েম কর? এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এই বাংলার বাতাসে শ্বাস নিয়ে কেউ এই স্লোগান দিতে পারে! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

জয় বাংলায় লাথি মারতে হবে কেন? আপত্তিটা কোথায়? 'জয়' শব্দে? দৈনিক ইনকিলাবঅলারা 'জয়' শব্দটি ব্যবহার করে না? বিজয় শব্দটি ব্যবহার করে না? বেগম জিয়া কি 'বিজয় দিবস' পালন করেন না? বিএনপিঅলারা কি জয় চায় না?

ক্রিকেট খেলায় 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জয়' এ কথা শুনলেই কি তাদের বুক কাঁপে ? এ কথা উচ্চারণ করলে কি তাদের জিভ খসে যায় ?

তবে কিসে আপত্তি ? বাংলায় ? আপত্তি কেন ? আপত্তি কিসের ? হাজার বছরের বাঙালির জীবনে সবচেয়ে গৌরবের অর্জন স্বাধীনতা! এবং গৌরবের ব্যাপার এই যে, নিজস্ব ভাষার নামে এই জাতি তার স্বাধীন রাষ্ট্রটির নাম রেখেছে— বাংলাদেশ। বাংলা শব্দটিকে যদি কেউ তার দেশের পরিচিতি হিসেবে অসম্পূর্ণ ভাবেন, তবুও তার ভাষায় পরিচিত হিসেবে কি তিনি বাংলাকে অস্বীকার করতে পারেন ? বাংলা কি আমাদের ভাষাও নয় ? তাহলে এই 'বাংলা'র জয় চেয়ে-চেয়ে যে স্লোগান, তাতে লাথি মারা কেন? এই লাথির অর্থ আমার মাকে লাথি মারা! এই লাথির অর্থ আমার নিজের জিহ্বাকে কেটে ফেলার চেষ্টা করা!

নাকি জয় বাংলা নয়, তাদের চাওয়া হলো—বাংলার পরাজয়। কারণ ফুটবল মাঠে যেমন একটি পক্ষের জয় মানে অন্যপক্ষের পরাজয়, তেমনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জয় বাংলার জয় মানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়। কাজেই তারা জয় বাংলা চাইত না, তারা জিন্দাবাদ চাইত। যেখানেই জয় বাংলা পেত, তারা গুলি করত, বেয়নেট চালাত, আগুন জ্বালাত, ধর্ষণ করত। জয় বাংলায় লাথি মারতে চাইত তারা— পাকিস্তানিরা, রাজাকাররা, আলবদররা। বুটের নিচে পিষে মারতে চেয়েছিল তারা জয় বাংলাকে, বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— যে বাঙালি স্বাধীনতা ঘোষণা করে তার প্রাণপ্রিয় দেশটির নাম রেখেছিল বাংলার নামে— বাংলাদেশ। হ্যাঁ, জয় বাংলার জয় হয়েছিল সেদিন। ওই পাকিস্তানি হানাদাররা, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম গণহত্যা ও নারীনির্যাতনকারীরা সেদিন তন্দ্রায়-নিদ্রায়-জাগরণে আতঙ্কিত থাকত এই বুঝি 'জয় বাংলা' ধ্বনি শোনা যায়, এই বুঝি তাদের পরনের কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। আর এই বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ একাত্তরে অপেক্ষা করত একটি মাত্র ধ্বনি শোনার জন্য, বাংলার প্রতিটি নরনারী, পত্র-পুষ্প, পাখি ও পতঙ্গ যে-ধ্বনিটিকে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত, সবচেয়ে মধুর বলে জানত, তার সবচেয়ে সাহস আর প্রেরণার উৎস বলে জ্ঞান করত— তা 'জয় বাংলা'।

২

১৯৭১ সালে 'জয় বাংলা' স্লোগান মুখে নিয়ে শত্রুশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। পরাজয় বরণ করেছিল জিন্দাবাদ পক্ষ। সেদিনও শত্রুরা লাথি মারতে চেয়েছিল জয় বাংলায়, পারেনি।

আজ এরা কারা জয় বাংলায় লাথি মারতে চায় ? ওরা জানে না, জয় বাংলা শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল-সবুজ জাতীয় পতাকা। ওরা জানে না, জয় বাংলা শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সমস্ত বাংলাদেশ, তার প্রাণী-প্রকৃতি-নিসর্গ-বস্তুজগৎ একযোগে গেয়ে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

৩

এমন নয় যে, জিন্দাবাদ শব্দে আমার ঘোরতর আপত্তি। জিন্দাবাদ মানে একটা শুভেচ্ছা— জিতে রও, জিন্দা থাকো। শব্দটি বাংলা নয়। বাংলা নয় বলেই কোনো

শব্দকে আমার ঘৃণা করতে হবে আমি এমনটা ভাবি না। কেউ যদি বলে 'লং লিভ বাংলাদেশ'— আমি তার মর্মবাণীটিই উপলব্ধি করতে চাইব! কাজেই যারা 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলতে চান, বলুন। আমি আপনাদের বাঁকা চোখেও দেখব না। কিন্তু দয়া করে জয় বাংলায় লাথি দেবেন না। জয় বাংলায় লাথি দেয়ার মানে যে আমার ভাষার অপমান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার অপমান, আমাদের ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের অবমাননা!

৪

ফারুক ইকবালের কথা মনে পড়ে যায়। আবুজর গিফারী কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফারুক ইকবাল। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধুর জনসভা। মিছিল যাচ্ছে রামপুরা এলাকা থেকে। মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফারুক ইকবাল। টিভি ভবনের সামনে পাহারারত পাকিস্তানি মিলিটারি। তারা বলল, মিছিল থামাও, মিছিল এদিকে এনো না।

এগিয়ে গেলেন ফারুক ইকবাল। তিনি জানাতে চান, টিভি ভবন নয়, তারা যাচ্ছেন পল্টনে। কিন্তু হঠাৎই গর্জে উঠল পাকিস্তানি মিলিটারির আগ্নেয়াস্ত্র। লুটিয়ে পড়লেন ফারুক ইকবাল রাজপথে।

অস্ফুট শব্দ করলেন...পানি। এক মহিলা দৌড়ে এল পানি হাতে। কিন্তু দেখতে পেলেন, পানি পানের জন্য অপেক্ষা নয়, বুকের রক্ত দিয়ে ফারুক ইকবাল রাজপথে লিখছেন... জয় বাংলা। তারপর মৃত্যু...

৫

স্বাধীনতাকামী মানুষের বুকের রক্তে লেখা স্লোগান 'জয় বাংলা'য় তোমরা লাথি মারতে চাওয়ার ধৃষ্টতা দেখিও না।

প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ১৯৯৯

আমাদের গায়ে আমরা গণ্ডারের চামড়া জড়িয়েছি!

বিমানের নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইটটি ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে। এখন বাংলাদেশে সকাল। আলোয় ঝকমক করছে আকাশ। এতক্ষণ বিমান ছিল মেঘের উপরে, এবার মেঘের ভেতর দিয়ে নেমে আসছে নিচে। বাংলাদেশে এখন বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। মেঘের নিচে নামলে কি বৃষ্টি দেখা যাবে!

দীর্ঘসময় বিমান ভ্রমণের কারণে কবির আহমেদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত। কিন্তু দেশের কাছাকাছি হতেই তার মন চনমনে হয়ে উঠছে। এই মেঘ, এই আকাশ বাংলার। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফুল, বাংলার ফলের টান তাকে উজ্জীবিত করে তুলছে।

বাংলাদেশে এখন শ্রাবণ মাস। এমন সোঁদা গন্ধময় কদম ফোটা বর্ষা পৃথিবীতে আর কোথাও কি আছে! আমেরিকা খুব সবুজ, ওখানে বৃষ্টিও হয় খুব কিন্তু আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর, টোকা মাথায় জলডোবা আলে কৃষক— এই যে বাংলার বর্ষার ছবি, তা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

কবির আহমেদের চোখ জল ছলছল করে। কী কারণে যেন তার মনে পড়ে মায়ের কথা। কেবিন ক্রুস, টেক ইয়োর সিট প্লিজ... মাইক্রোফোনের ধাতব শব্দ তার কানে যায় না। মায়ের মুখে মেছতা পড়েছে। সেই মেছতার রং ও আকার ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

দীর্ঘ ৮ বছর পর কবির আহমেদ দেশে ফিরছে। বুয়েট থেকে গ্রাজুয়েশন নিয়ে সে চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। ওখানে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে সে উচ্চশিক্ষা নিয়েছে। এমএস করেছে। পিএইচডি করেছে। এখন সে ডক্টর কবির আহমেদ। তার প্রফেসর তাকে খুব পছন্দ করেছিল। বারবার বলেছে, কবির, থেকে যাও। এই কলেজেই কাজ করতে থাকো।

না। কবির সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশে ফেরার। দেশপ্রেম হয়তো একটা কারণ, আত্মপ্রেমও একটা বড় ব্যাপার। আমেরিকার সে কে ? ভিড়ের একজন। আর বাংলাদেশে তার একটা আইডেনটিটি থাকবে।

কিন্তু তার বাঙালি বন্ধুরা তাকে নিরুৎসাহিত করেছে। বলেছে, দেশে যাচ্ছিস যা। মায়ের সঙ্গে দেখা করে আয়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, ঘরদোর। তবে থেকে যাবি, এটা আগে থেকে অত বড় মুখ করে বলার কী আছে! সবাই অমন ভাবে। কিন্তু এয়ারপোর্টে নেমেই আস্তে আস্তে চিন্তা পাল্টাতে থাকে। নিজেকে মনে হয় ফিশ আউট অফ ওয়াটার। কাস্টমস থেকে শুরু। তারপর ট্যাক্সিঅলাদের টানাটানি, এয়ারপোর্টে দেখবি কী ভিড়। মনে হয় কবর থেকে মানুষ উঠে এসেছে— এত ভিড়। একজন যায় মরতে, দশজন যায় ধরতে। একজনকে রিসিভ করতে বা সি-অফ করতে ফরটিন জেনারেশন হাজির এয়ারপোর্টে।

শুনে কবির আহমেদ হেসেছে। এটাই তো প্রাচ্যের রীতি। একজনের বিপদে-আপদে সম্পদে-আনন্দে ছুটে আসবে দশজন। ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ? ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই মাটিতে জন্ম যেন এই মাটিতে মরি...।

'আর তা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো না। কথায় কথায় হরতাল। ভাঙচুর। সব জায়গায় দুর্নীতি। ঘুষ ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না, ডাক্তার নাড়ি ধরে না, ট্রেনের টিকেট মেলে না, ফুল ফোটে না, টেলিফোনের লাইন জোটে না,...নাই রে, মানুষের ভ্যালুজটাই আর নাই। বদলে গেছে।'

সকাল এগারোটার মধ্যে বড়আপার বাসায় পৌঁছে গেল কবির। এয়ারপোর্টে যথারীতি মা এসেছিলেন ভাইবোন, ভাগ্নেভাগ্নিরা এসেছিল। গোসল করে খেয়েদেয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা। বাইরে তখন আত্মীয়সকল তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাক পাড়ছে। সবচেয়ে উদগ্রীব তার তিন বছরের ভাগ্নি শ্রেয়তী। 'মামা, সুটকেস কখন খুলবে! গিফটগুলো দেখার জন্য পেট ফেটে যাচ্ছে', শ্রেয়তী বলেই ফেলল।

শ্রেয়তীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে কবির বসল চায়ের টেবিলে। খুব মাথা ধরেছে। কড়া এক কাপ চা না খেলেই নয়।

টেবিলে খবরের কাগজ পড়ে আছে। তিনটা খবরের কাগজ। ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো। প্রথম আলো পত্রিকাটা মনে হয় নতুন বেরিয়েছে। ১ আগস্ট ১৯৯৯-এর কাগজ। দৈনিক জনকণ্ঠের একনম্বর খবরের শিরোনাম হলো : 'ধর্ষক গ্রুপ' 'কিলার গ্রুপ'-কে হটিয়ে জাবির ক্যাম্পাস দখল করেছে! সর্বনাশ! ছাত্র সংগঠনের মধ্যে

উপদলগুলো এখন এ ধরনের নামে পরিচিত হচ্ছে নাকি ? ধর্ষক গ্রুপ, কিলার গ্রুপ! তাদের সময়ে পরিচিত হতো নেতার নামে ফ-চু, জা-জা— এমন সব নামে। জনকণ্ঠ রেখে কবির হাত দিলো প্রথম আলোয়। এটারও প্রধান খবর একই— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন, পরীক্ষা স্থগিত, আজ মহাসড়ক অবরোধ; ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ক্যাডারদের ক্যাম্পাস দখল। নাহ্! কবির আহমেদ ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। এসব নতুন পত্রিকা। তার সময়ের পত্রিকা হলো ইত্তেফাক। এটি একটু দেখা দরকার। একটু খুঁজেই প্রথম পাতাতেই সে পেয়ে গেলো খবরটা— 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ধর্ষণকারী সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপের তিনটি হল দখল ॥ হামলায় আহত ৭'।

কবির মাথাব্যথার কথা গেল ভুলে। ব্যথায় ব্যথা বিনাশ। একেকটা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এত বড় বড় হেডলাইন দিয়ে ছাত্রলীগের কোনো একটা গ্রুপের পরিচয় দেয়া হচ্ছে 'ধর্ষণকারী গ্রুপ'/কিলার গ্রুপ'। আশ্চর্য তো! এর পরে নিশ্চয় সরকারের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভবিক। কবির বিকল্পগুলো ভাবতে থাকে :

১. সরকার প্রচণ্ড বিব্রতবোধ করবে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগের সব কমিটি বাতিল করে দেবে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে ধর্ষণকারী ও কিলার এই উভয় ধরনের ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে। তার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এদের ত্বরিত বিচার নিশ্চিত করা হবে।
২. বিরোধীরা সরকারি ছাত্র সংগঠনের নামে এসব বিশেষণ দেখে প্রথমে নিজেরাই লজ্জা পাবে! তারপর তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে। তারা সরকারের পদত্যাগ দাবি করবে।
৩. কিছুই যদি না হয় অন্তত সরকার বলবে, এই ধর্ষণকারীরা ছাত্রলীগের কেউ নয়। ছাত্রলীগ বিবৃতি দিয়ে বলবে, এরা বহিরাগত সন্ত্রাসী। ছাত্রলীগের সদস্য নয়।
৪. যাদের সম্পর্কে এসব খবর, অন্তত তারা প্রতিবাদপত্র পাঠাবে সংবাদপত্রে। তারা বলবে, তাদের ধর্ষক বা হন্তারক বলাটা সত্যের অপলাপ, মাত্র।

এসব ভাবতে ভাবতে কবির আহমেদ চায়ের কাপে চুমুক দেন। খানিক পরে ওয়াক থু করে ওঠেন। মনের ভুলে তিনি চায়ে চিনির বদলে লবণ দিয়ে ফেলেছিলেন।

কবির আহমেদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত নিতে তার বুক ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি কিছুতেই তার ভাগ্নেভাগ্নি, ভাস্তেভাস্তির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না। বিশেষত নিষ্পাপ শ্রেয়তীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে কী করে তাকাবেন তিনি। তিনি এদের সকলকে বাংলাদেশ নামক একটা দেশে ফেলে রেখে কাপুরুষের মতো, স্বার্থপরের মতো পালিয়ে যাচ্ছেন। সেই দেশে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে মানুষের মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেদেশে মানুষ কোনো বড় অসঙ্গতি দেখলেও তাকে অসঙ্গতি বলে মনে করে না। প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

এই দেশে রাজনীতি কোন্ পর্যায়ে নেমে গেছে যে, সরকারি দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনটির নামের আগে 'ধর্ষণকারী', 'কিলার' এসব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, অথচ সরকার প্রতিবাদ করে না, ছাত্রলীগ প্রতিবাদ করে না, মানুষ লজ্জিত হয় না, নেতৃবৃন্দ অধোবদন হয় না। সবকিছুই গতানুগতিকভাবে চলতে থাকে। যেন এটাই স্বাভাবিক। অস্ত্রধারী ছাত্র রাজনীতিকরা ধর্ষণ করবে, খুন করবে, হল দখল করবে— সব স্বাভাবিক। এতে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কিছু নেই।

দেশের মানুষের মূল্যবোধ এতটা বদলে গেছে! মানুষের অনুভূতি এতটা ভোঁতা হয়ে গেছে! সরকারের দুটো কান এত গভীরভাবে কাটা পড়েছে। রাজনীতি এত স্থূল, এত নির্লজ্জ, বেহায়া হয়ে পড়েছে!

এই দেশে থাকলে আরো বেশি দুঃখ পেতে হবে। বরং দূরে থেকে দেশপ্রেম দেখানোই ভালো।

প্রথম আলো, ৫ আগষ্ট, ১৯৯৯

শিক্ষা

আজ কী নিয়ে লিখছি জানেন, শিক্ষা নিয়ে! নিশ্চয় আঁতকে উঠছেন। ভাবছেন, সে কী কথা! গদ্যকার্টুন-লেখকের মতো নিম্নশিক্ষার মানুষ লিখবে শিক্ষা নিয়ে! আপনাকে দোষ দেয়া যায় না। প্রথম প্রথম আমিও একই কথা ভেবেছি। পরে চিন্তা করে দেখলাম, লেখা যায়। আমিও লিখতে পারি শিক্ষা নিয়ে। কেন পারি, সেই কথাটা বলি।

ছেলেবেলায় আমাদের স্কুলে যে কয়েকজন ছাত্রকে গবেট টাইপ বলে জানতাম, আবদুল খালেক তাদের অন্যতম : পড়া পারত না, সারাক্ষণ শার্টের কলার চিবাত। এসএসসি প্রথম দফায় পাস করতে না পেরে গিয়েছিল গ্রামে। উচ্চশিক্ষার্থে গ্রামে যাত্রা। মানে হলো, যে কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল হয়, সেখানে গমন। অতঃপর মামা, চাচা, ভাইজানদের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ফের ঠেকল। আবার গ্রামে যাত্রা। এবারে দ্বিতীয় বিভাগ। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রয়াস। আমাদের বুয়েটের এক ছেলে, যে স্টান্ড-টেস্টান্ড করা, তাকে সে হায়ার করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরতি পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য।

একজনের পরীক্ষা আরেকজনকে দেয়ানোর মাধ্যমে আবদুল খালেক ভরতি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তারপর আর খোঁজ রাখিনি বহুদিন। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা। সে আমাকে তার ঠিকানা লিখে দিল শাদা কাগজে। এলিফ্যান্ট রোডে থাকে। এলিফ্যান্ট বানানটা সে লিখল Alephan, বুঝলাম গবেট খালেক গবেটই রয়ে গেছে। তার পরের ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

দেখি আব্দুল খালেক টেলিভিশনে আলোচনা করছে। তার নামের আগে বলা হলো, সে কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক।

আমি আবদুল খালেকের উন্নতিতে যারপরনাই বিস্মিত। তবে মনে মনে আনন্দও লাগল, আমার বন্ধুটি নিশ্চয় এখন বেশ 'শিক্ষিত' হয়ে উঠেছে। সে কী বলে, তা শোনার চেষ্টা করলাম। লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গেল।

সে বলছে, আমাদের সাংস্কৃতি বাঙালি সাংস্কৃতি। দারিদ্র্যতা আমাদের সমস্যা। উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে।

ইশ। তিনটা বাক্যে চারটা ভুল।

তো এই আব্দুল খালেকেরা যদি জাতিকে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে, তবে আমিই বা পারবো না কেন?

অবশ্য আবদুল খালেক, যে কিনা কিছুদিন জাসদ-ছাত্রলীগ করত, ইদানীং জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু বলতে অজ্ঞান, তার উন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী। তবে আমার কাছে শিক্ষা হলো দুই ধরনের— সাধারণ শিক্ষা ও উচিত শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা কম ডোজের শিক্ষা। যেমন বৃষ্টিতে ভিজে ছেলে যখন জ্বর আনে, মা-বাবা ছেলেকে এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেন।

কিন্তু ধরা যাক, আপনার খুবই উন্নতি হচ্ছে। আমি আপনার ঈর্ষান্বিত প্রতিবেশী। চাইছি যে আপনার একটি উচিত শিক্ষা হোক।

পরে শুনতে পেলাম, আপনি গেছেন ডেন্টিস্টের কাছে। ডেন্টিস্ট আপনার দাঁত তুলবে। এজন্য প্রথমে 'লোকাল এনেস্থেসিয়া' দেবে। অর্থাৎ ব্যথা নিরোধক ইনজেকশন। দাঁতের গোড়াটা অনুভূতিহীন করে দেবে আর কী! কিন্তু ভুল করে 'ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার' ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে। তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে যে দাঁতটা তুলেছে সেটা আসলে সুস্থ দাঁত। এরপর পোকায় খাওয়া দাঁতটা নিয়েই আপনি ঘরে ফিরে এসেছেন।

ব্যথায় আপনি রাতে তিনবার অজ্ঞান হয়েছেন।

এ কথা শুনে আমি কী বলব? বলব, উচিত শিক্ষা হয়েছে! এখন বোঝ, মাসের কয় দিন যায়। এহ্‌। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে উন্নতি করা হচ্ছে!

আপাতত শিক্ষা বিষয়ে আমি এইটুকু বললাম। আরেকটু বিদ্যার্জন করে নেই, আরো বলব। কবি বলেছেন,

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে
কর্মী হওয়ার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে
পাহাড় শেখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌনমহান
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র...

বিশ্বজোড়া সবাই আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে, প্রতিনিয়ত। এ লেখা প্রকাশ হওয়ার পর নিশ্চয় আপনারা আমাকে খুঁজবেন, উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য।

প্রথম আলো, ১২ আগস্ট, ১৯৯৯

একটি প্রেমের গল্প

মুমুকে আমি পছন্দই করি। তেমন গুরুতর ধরনের পছন্দ অবশ্য করা সম্ভব নয়। কারণ মুমুরা একটু বেশি-বেশি বড়লোক। আর আমরা প্রায় গরিব প্রজাতির প্রাণী।

আমি আড্ডা দেই পাড়ার চায়ের দোকানে। মুমু এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। আমি দেখি। দেখতে ভালো লাগে। আমি গরিব। সেটা সবসময় মনে করে বসে থাকতে পারি না। হৃদয়ের মধ্যে নানা ভাবসাব খেলা করে। কবিতার পঙ্ক্তি জন্ম নেয়। বড়ই লজ্জার ব্যাপার হলো, গোপনে আমি কবিতা লিখি। কাউকে দেখাই না। কোথাও ছাপাতে দিই না।

কবিতা লিখতে গেলে একজন 'নারী' দরকার। যেমন ছিল জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন। গোপন নারী। গোপনে প্রেরণা দেয়। প্রণোদনা যোগায়। আমার এই গোপন নারীটি হলো মুমু।

মুমু আসছে। রিকশায়। কোথাও যেন গিয়েছিল! কোথায় ? যেখানে ইচ্ছা যাক— সে যে ফিরে এসেছে, এই বেশি। আমি যখন চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছি, তখনই তো এসেছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। আজ ও পরেছে হালকা হলুদ-সবুজ কামিজ। ওকে দেখাচ্ছে একটা চলিষ্ণু সর্ষেক্ষেত।

সর্ষে ভূত তাড়ায়। আবার সর্ষের মধ্যেও ভূত থাকে। আমি হলাম ওর ভূত। ও আমাকে তাড়ায়। কিন্তু আমার বসত ওর মধ্যেই। ও জানে না।

আবার আমার মধ্যে কবিতার পঙ্ক্তি এসে যাচ্ছে। কবি-সাহিত্যিকদের এ ধরনের সমস্যা হয় বৈকি।

আল্লার কী ইচ্ছা। মুমুর ভাঙতি দরকার। রিকশাঅলাকে সে ভাঙতি দিতে পারছে না। আমি এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমার পকেট ভরা ভাঙতি। দশটাকার ভাঙতি, বিশ টাকার ভাঙতি, পঞ্চাশ টাকার, একশ টাকার। গরিব হলেও টাকাটা আমি জমিয়ে রেখেছি। যদি মুমুর দরকার হয়।

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, ভাঙতি লাগবে ? কত টাকার।

মুমু হাসল। সম্মতির হাসি। অনুমোদনের হাসি।

ইশ। জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। মাঝেমধ্যে এমনি হয়। কখনো সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে, ঠিক যেন পড়ে পাওয়া ১৪ আনা! ১৪ আনা, লাখ টাকা।

আবার দুঃসময়ও আসে। আমার বাবা নেই, নিখোঁজ। মা আছেন, স্কুল শিক্ষিকা। তো কী হলো, মার স্কুলে গোলযোগ। নতুন গর্ভনিং কমিটি হলো। নতুন হেডমিসট্রেস। মাকে ওরা দেখতে পারে না। মার বেতন বন্ধ।

মা আর আমি অগত্যা বেরুলাম গয়না বেচতে। মার শেষ গয়না। বাবার শেষ চিহ্ন। দুটো চুড়ি।

চুড়ি দুটো বেচে ফিরছি। এমন সময় পথ আগলে ধরল ছিনতাইকারী। দুজন। একজনের হাতে রিভলবার। অন্যের হাতে ছুরি। ভেবেছিলাম ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলি একটাকে— কী জানি, পারলাম না। মা একহাতে আমাকে আটকে রেখেছিলেন— সেটাই হয়তো না-পারার কারণ।

এবিক! একটা মোটরসাইকেল গলির মুখে ঘুরল কেন! তারা তো এদিকেই আসছে। হ্যাঁ। এল। আমার সামনে মুমু। ওরা দ্রুতই মুমুর গলায় হাত দিয়ে ছিনিয়ে নিল চেনটা। তারপর ছোটাল মোটরসাইকেল। দ্রুত। বড় রাস্তার দিকে।

না। শুধু কবিতা লিখলে চলবে না। একটা কিছু করা দরকার। মুমুর চেন নিয়ে কেউ চলে যাবে, তা হতে দেয়া যায় না। আমি ধাওয়া করলাম মোটরসাইকেলটাকে চিৎকার করতে করতে।

মোটরসাইকেল ছুটছে। আমিও ছুটছি। আমার পেছনে পেছনে ছুটছে আরো কজন। মোটরসাইকেল বড় রাস্তায় গিয়ে কী কারণে থেমে গেল। দুই ছিনতাইকারী বাইকটা ফেলে রেখে দৌড়াচ্ছে।

এবার তারা পারবে না। আমি ধরব। ধরবই। আমি ছুটছি। ওরা আমাদের পাড়া থেকে বেশ কিছুদূরে বড় রাস্তায়। আমি ওদের পেছন ধাবমান চিৎকার দিচ্ছি। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে।

আমি প্রায় ধরে ফেলেছি একটাকে। ওই ব্যাটা মুখের মধ্যে চেনটা পুরে ফেলেছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপরে। ব্যাটা পড়ে গেল রাস্তায়। আমি একটা লাথি মারলাম ওর পেটে। কোঁক শব্দ হলো। চেনটা বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে। সেটা কুড়িয়ে নিতে গেছি। ব্যাটা উঠে কোন্ গলিতে গায়েব হয়ে গেল।

ধুশ শালা।

চারদিক থেকে লোকেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমার হাতে চেন।

এই চেনটাই। কে যেন বলল।

এই ব্যাটারে ধরছি। লাগা। লাগা।

লোকজন আমাকে ধোলাই দিতে শুরু করেছে। আমি চিৎকার করে বলছি, আমি না। আমি ছিনতাইকারীকে ধরতে এসেছি।

লোকে শুনছে না। 'জিভ কাইটা নেন', 'চোরের মার বড় গলা', 'পুলিশে দেন, মাইরেন না'— নানা কথা। আর মার।

আহা, মুমু। তোমার চেনটা আমার হাতে। এটা আমি তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই। সেটা বুঝি আর সম্ভব হলো না।

প্রিয় পাঠক, কল্পকাহিনীর এখানেই সমাপ্তি, এবার সত্যিকারের খবর।

ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনি, নিহত ২

মেডিকেল প্রতিবেদক : নগরীর ব্যস্ততম বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে ছিনতাই করার অভিযোগে ক্ষুব্ধ জনতা কালাম ও শাহআলম নামে দুই তরুণকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। বকুল নামে অপর এক সহযোগীকে পুলিশ গণধোলাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় এ ঘটনা ঘটে। (প্রথম আলো ৪ আগস্ট, ১৯৯৯)।

প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট, ১৯৯৯

ইতর প্রাণীদের ঘরবসতি

দুবছরের রাবুর নাকে সর্দি। সর্দি ঝুলে আছে নখের মতো। সে জিভ দিয়ে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে সর্দি খাচ্ছে।

তার গার্জিয়ান এখন চার বছরের রানু। রানুর মনটা খুব খারাপ। আজ তার কথা ছিল সোলেমানের সঙ্গে বিয়ে-বিয়ে খেলবে। সোলেমানের বয়স চার কি পাঁচ। সে তাদের পাশের ছাপড়ায় থাকে। বিয়ের মন্ত্র পড়া হলে রানুর কোলে বাচ্চা আসবে। রাবু হবে সেই বাচ্চা।

বাস্তবে অবশ্য রাবু হলো রানুর ছোটবোন। কিন্তু খেলায় সব চলে। ছোটবোনকে বাচ্চা বানানো হলে খেলার মধ্যে কোনো অসুবিধা হয় না।

আজকের বিয়ে উপলক্ষে রানু বেশ প্রস্তুতি নিয়েছিল। কতগুলো লাল-নীল কাগজের নিশান তৈরি করা ছিল। সুতোয় সেসব ঝুলিয়ে বেড়ার গায়ে টাঙানো হবে— এমনই ছিল তার পরিকল্পনা। বিয়ের আগে গায়েহলুদ হওয়া আবশ্যক। এজন্যে সে চুরি করে একটুকরো কাঁচা হলুদ রেখে দিয়েছে নিজের প্যান্টের কোঁচড়ে।

কিন্তু আজ বিয়েটা হচ্ছে না। কারণ হলো, তাদের বস্তিঘরটাই ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাদেরটাও, সোলেমানদেরটাও। সোলেমান আর তার বাবা-মা-ফুপুরা কোথায় গেছে রানু জানে না।

তাদের ভাঙা ঘরবাড়ি আর সম্পত্তি নিয়ে সে বসে আছে মগবাজার রেললাইন থেকে খানিক দূরে, একটা রাস্তার মোড়ে। সে আর তার ছোটবোন রাবু। রাবু সর্দি খাচ্ছে খাক। পেটের খিদায় খায়। তারা সকলেই তো কিছু খায় নাই। রানু বিড়বিড় করে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে।

রানু ভেজে। রাবু ভেজে। রাবুটা বেশ হাঁটা শিখেছে। এক জায়গায় তাকে বসিয়ে রাখা কঠিন। রানু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছে। এত এত জিনিসপত্র সে একা সামলাবে, নাকি এই বোনটাকে সামলাবে। আবার রাবু হাঁটতে শুরু করেছে। মনে হয় বৃষ্টিতে এখানে বসে সে থাকতে চায় না। ছাদ চায়। শখ কত। দুইনার ভাও বুঝে না। ছাদ চায়! রানু ক্ষিপ্ত হয়। চড় বসায় রাবুর গালে। রাবু কাঁদে। তখন রানুর কান্না পায়। মা-টা যে কই গেল! হেরেও দোষ দিয়া কী লাভ! সরকার হালার পো হালা বস্তি তুইলা দিলে হে কী করব! মাথার চুল আছড়ে তার মা কী কান্নাটাই না কেঁদেছে। তাদের ছাপড়ার উপরে মা একটা পুঁইয়ের লতা তুলছিল। সেই লতার কথা বলে বলে মা কাঁদে। বাপ তার খেপে গিয়ে তাই তার পশ্চাদ্দেশে একটা লাথি ঝেড়েছে। ঝাড়ারই কথা। থাকনের জায়গা নাই, হে কান্দে পুঁইশাকের লাইগা। অবুঝ।

২

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই তারা গেল গুলিস্তান। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে। বাপ তার জয়বাংলা ভক্ত। নেতাদের পেছন পেছন বহুদিন ঘুরেছে। বহু মিছিল মিটিঙে থেকেছে। এখন নেতারা তাদের বিপদে দেখবে না! নিশ্চয় দেখবে।

সেখান থেকে জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দিতে দিতে তারা চলল হাইকোর্টের সামনে। নেতারা বলেছেন, যারা যারা হাইকোর্টে যাবে, তাদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখা

হবে। তারপর তাদের জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়া হবে। রাবুর মা মোমেনা খাতুন আশ্বস্ত হয়। রাবুর বাবাকে সে কোনোদিনও কাজের লোক মনে করেনি। আজ তাকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

তারা আবার সব জিনিসপত্র কাঁধে-পিঠে নিয়ে চলল হাইকোর্ট।

৩

রানু বসে আছে একটা রিকশাভ্যানে। রাবুকে সে ধরে আছে শক্ত করে। এর আগে সে জীবনে রিকশাভ্যানে চড়েনি।

তাদের সংসার আবার ভাসমান হয়েছে। হাইকোর্টও ছাড়তে হবে— নেতারা বলেছেন। এবার তারা কোথায় যাবে, তারা জানে না।

তার মা কাঁদছে। মাথা আছড়ে আছড়ে কান্না। তার বাবা রেগে গেছেন। মনে হয় মার কপালে আবার লাথি আছে।

তার মা চিৎকার করে বলছেন, এমন মরদ আমি কুনুদিন দেখি নাই। কই যামু, কিছু ঠিকঠিকানা নাই। হে খালি কয়, নেতা মানতে হয়।

'চোপ হারামজাদি, একটা কথা না'— বাপে হুংকার ছাড়ে।

'আমরা কি কুত্তাবিলাই! দূর দূর ছেই ছেই করে ক্যান তোমার সরকারে! একবার খেদায় দিছে, সেই সুম একটা জায়গা খোঁজান দরকার আছিল না? এইবার আর যদি ভোট দিছি।' মা কাঁদে!

'চুপ কর! কুত্তাবিলাই না তো কী! ভোটার লিস্টে নাম নাই, যার ভোট নাই, হে কি মানুষ !' বাবা বলে।

তাদের ভ্যান চলতে শুরু করে। হঠাৎ রাবুর চোখে পড়ে পিছনে পিছনে তাদের বস্তির কুত্তা কালু আসছে। আহারে কুত্তাডা! রানুর আবার কান্না আসে। হেরও মনে হয় ভোট নাই কা!

প্রথম আলো, ২৬ আগস্ট, ১৯৯৯

আধুনিক ধানচাষ প্রদর্শনী

পেছনে লেখা : আলোক ধান।

ধনধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরা। আর বাংলাদেশ! এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!

ধান দেখে কানটা তাই খাড়া করে ফেলি। ব্যাপার কী! হচ্ছেটা কী! টিভির দিকে চোখ রেখে চশমাটা কানে গুঁজি।

ধানচাষের কোনো নতুন পদ্ধতি প্রদর্শিত হচ্ছে বুঝি! হবে তাই!

কৃষকদের দেখেও বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। দেশটা এগুচ্ছে তাহলে! জার্সি পরে কৃষকরা মাঠে নেমেছে। দু-রঙের জার্সি।

মাঠ চষা হচ্ছে। ধানচাষ করতে পানি লাগে। প্রচুর পানি। এত পানি ঢাকা ওয়াসা সাপ্লাই দিতে পারল! মনে সন্দেহ হয়।

আমার পাশে বসে যিনি টিভি দেখছেন তাকে জিজ্ঞেস করি :

'এত পানি! এল কোত্থেকে ?'

'বৃষ্টি হয়েছে না।' তিনি বলেন।

তখন মনের দ্বন্দ্ব নিরসিত হয়। তাই তো! এ যে বৃষ্টির পানি! ধানচাষের পানি সাপ্লাই দেয় গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ আর প্রকৃতির অপার উৎস— বৃষ্টি!

ঢাকা ওয়াসার কথা কেন মনে এল?

সহজ করে সহজ ভাবনাটা আর ভাবতে পারি না তাহলে! সব জটিল করে যান্ত্রিকভাবে ভাবতে হয়।

হ্যাঁ। মাঠটা খুব ভালোই চষা হচ্ছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষ! আধুনিক চাষারা দৌড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাদায়-পানিতে হুটোপুটি-লুটোপুটি। ইশ, একজন আধা হাত কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কী যেন খুঁজছে। কে জানে, হয়তো পেয়ে যাবে শিং কিংবা মাগুর, নিদেনপক্ষে টাকি মাছ।

ধানচাষের জন্য মাটি তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। ইমা! একজন দেখি ইন্সট্রাক্টরও আছেন। হাতে বাঁশি। তার মানে কী। ইনি হলেন ধানচাষের কোনো বিদেশী বিশেষজ্ঞ। হতে পারে দেশীও। হয়তো ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষক। তাকে সাহায্য করছেন আরো দুজন কৃষিবিদ। তাদের হাতে পতাকা।

আসলেই দেশটা এগুচ্ছে! গাজি ট্যাংক, আবার দেখো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান চাষের প্রদর্শনী। দর্শনীর বিনিময়ে!

'এই এটা দেখতে কি টিকিট লাগে?' পাশের জনকে জিজ্ঞেস করি।

নিশ্চয়ই! ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা টিকেট।

দারুণ! আমিও তাই ভেবেছিলাম।

আমার পাশের ভদ্রলোক খবরের কাগজে ডুবে আছেন। মাঝেমধ্যে শুশুকের মতো নাক বাড়িয়ে দিয়ে জবাব দিচ্ছেন আমার প্রশ্নের। আমার সর্বশেষ বাক্যের পিঠে তিনি কোনোকিছু বললেন না অবশ্য।

আমি দাঁত বের করে ব্যাপারটা দেখছি।

কৃষকদের পোশাকের উজ্জ্বলতা এখন আর অবশিষ্ট নেই। সব কাদায় কাদায় কাদাকার।

উ মা! একটা গোলমতো জিনিসও দেখছি। ওটাতে কেউ কেউ লাথি দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী ঘটছে, আপনাদের বোঝানোর জন্য সহজ করে বলি, ফুটবল খেলায় যেমন হয় তেমনি ঘটছে।

ভালো ভালো! ধানক্ষেতে নাইলোটিকা চাষ, এটা আমরা দেখেছি। একের ভেতরে দুই। ইদানীং আবার শুরু হয়েছে ক্ষেতের আলে গাছ লাগানো।

ক্ষেতে আলে গাছ লাগাই
ধান কাঠ দুইই পাই।

টিভির এ অনুষ্ঠানেও তাই হচ্ছে। ধানচাষ করতে করতে ফুটবল খেলাটাও খেলা হচ্ছে।

এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। সারা বাংলার চাষীদের বিনোদনের কোনো সুযোগ নেই। সুবিধা নেই। ধানচাষ ও ফুটবল খেলা একসঙ্গে হওয়ার এ আইডিয়াটা কার? আমি তাকে অভিনন্দন জানাই।

আইডিয়া আর কার হবে? যারই হোক বিটিভি এটাকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বলে চালাবে। এর আগে সরকার ক্ষমতায় থাকলে বলা হতো এটা শহীদ জিয়ার স্বপ্ন। তার আগের আমলে বলা হতো পল্লীবন্ধুর স্বপ্ন!

ওই তো আমার প্রিয় মুখখানি— জননেত্রী শেখ হাসিনা। উনিও এসেছেন এ ধানচাষ দেখতে। বাংলার কৃষকদের উৎসাহ দিতে। দেবেনই তো। আওয়ামী লীগ কৃষকদের দল।

পাশে মেয়র হানিফও আছেন। উনি কেন ? কী জানি! হয়তো ঢাকার রাস্তাগুলোতে ধানচাষ করা যায় কিনা— নিরীক্ষা করছেন। যাবে যাবে। বেইলি রোডে যাবে, সার্কিট হাউস রোডে যাবে, পরীবাগ রোডে যাবে। মনে মনে হিসাব করি! আমার চলাচলের মধ্যেই যদি তিনটা রাস্তায় ধানচাষ করা যায়, এর বাইরে ঢাকা শহরে ধানচাষের উপযোগী না-জানি কত রাস্তা আছে।

প্রধান কৃষিবিদ বাঁশি বাজালেন। গোল গোল! ভালো। খেলা চললে গোলও হবে। আমার তাতে উৎসাহ নেই। আমার উৎসাহ ধানবীজ বপন, চারা রোপণ, এসবে।

পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ধান লাগানোটা কখন দেখাবে ?

পত্রিকা থেকে চোখ তুলে তিনি বিরক্তিভরে তাকান আমার দিকে।

জি বলছিলাম কী! ধানচাষই যদি ডেমোনস্ট্রেট করতে হয় সেটা দেখাচ্ছে না কেন? তাকে বলি।

কী বলছেন ?

এই যে ধানচাষ দেখাচ্ছে সরকার, তো ধানের চারা...।

'ওই মিয়া। কী কন! এটা তো ফুটবল খেলা হচ্ছে। ঢাকা স্টেডিয়ামে। বঙ্গবন্ধু কাপ। পাগল-ছাগলের পাশে বসে আছি দেখছি।'

আমি স্তম্ভিত। নিজের মূর্খতায় খানিক। জাতির ইজ্জতের কথা ভেবে বাকিটা।

একি বঙ্গবন্ধু কাপ! আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। বিদেশীরা এসে এটাতে খেলছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সেটা বসে দেখছেন। জাতির পিতার নাম এ খেলার আগে লাগানো হয়েছে।

এই ধানচাষ প্রক্রিয়াকে সবাই ফুটবল বলে মেনে নিচ্ছে ? কেউ প্রতিবাদ করছে না। সেই বোকা রাজার গল্পের মতো। সবাই বলছে রাজার পরনে কত সুন্দর পোশাক। কিন্তু নিজেকে বোকা প্রমাণিত করা থেকে বিরত রাখতে কেউ বলছে না, রাজা তোর পোশাক কই ?

প্রধানমন্ত্রী মৃদু মৃদু হাসছেন। সবাই মৃদু মৃদু হাসছে। খেলা রীতিমতো জমে উঠেছে।

আসলে তো জমেনি। পাগল-ছাগল গোত্রের লোক বলে আমি তা বলে ফেলেছি।

'আচ্ছা ভাই। এমন কাদামাঠে ফুটবলটার মানে কী ?' পাশের বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করি।

'বৃষ্টি পড়লে সরকার কী করবে! স্টেডিয়ামটা ছাতা দিয়ে ঢেকে দেবে ?'

'কেন ? আরেকটা স্টেডিয়াম আছে না! মিরপুর।'

'ওখানে খেলা হয়েছে তো এক-আধটা। বিদেশীরা বলেছেও, এত সুন্দর মাঠ থাকতে তোমরা এই খানাখন্দতে খেলাচ্ছ কেন ?'

'আমারও তো প্রশ্ন সেটাই। কেন ?'

'উজবুকেরাই অমন প্রশ্ন করে বটে! বঙ্গবন্ধু কাপ খেলা হবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের পাশে আওয়ামী লীগ অফিসের সন্নিকটে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। ওটা কি ২ নং জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে পারে।'

'কিন্তু এ তো ফুটবল হচ্ছে না। ধানচাষ! তাতে কি টুর্নামেন্টের ভাবমূর্তি ভালো দাঁড়াচ্ছে ?'

'না। দাঁড়াচ্ছে না। তাতে কী!'

'তাতে কী মানে! মিরপুরে ফুটবল চলে গেলে যদি ক্রিকেটাররা দৌড়ে এসে ঢাকা স্টেডিয়ামের দখল নিয়ে নেয়, তখন ? মেয়রের ইজ্জত থাকে! উনি আবার ফুটবলেও অধিপতি কিনা! তাই যদি না হবে, এত টাকা ব্যয়ে নির্মিত এত সাধ্য-সাধনার ধন পিচগুলো খুঁড়ে ফেলা হয়েছে কেন!' আমি ভাবি!

টিভিতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ ভেসে ওঠে! তিনি হাসছেন। হাততালি দিচ্ছেন। হঠাৎই তার জন্য মায়া লাগে! কী জানি কেন!

মানুষের মন বড়ই বিচিত্র! কখন যে কার জন্য মায়া হয়!

একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য উদ্বোধনের গল্প

রংপুর গিয়েছিলাম সম্প্রতি। দুদিনের জন্য।

এরই ফাঁকে একবার বের হয়েছিলাম প্রথম আলোর রংপুর প্রতিনিধি আরিফুল হক রুজুর সঙ্গে।

রুজু বললেন, চলো তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাব। একটা মোটরসাইকেলের পেছনে উঠে চললাম মজার জিনিস দেখতে। রুজু চালাচ্ছেন। মজার জিনিসটা দেখতে যেতে হলো রংপুর কারমাইকেল কলেজের পেছনের দিকে।

সেখানে বেশ কজন পুলিশ। একটা মাঠের মধ্যে শিবির গেড়ে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে।

কী পাহারা দিচ্ছে ? একটা ভিত্তিপ্রস্তর। একটা ছোট্ট স্মারকস্তম্ভ। রংপুরে একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাঁকা মাঠের মধ্যে সেই ছোট্ট ভিত্তিপ্রস্তরখানি তথা শেখ হাসিনার নামধারী ফলকখানি পড়ে আছে। বিশাল চত্বরের মধ্যে তার অবস্থান সামান্যই, কিন্তু এ সামান্য ফলকখানি পাহারা দিচ্ছে একদল পুলিশ। দিনের পর দিন। আকার-আকৃতিতে ফলকখানি সামান্য হলেও গুরুত্বের দিক থেকে এটি সামান্য নয়। এর গায়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর নাম। আর সে ফলকখানিই নাকি রংপুরের মানুষ ভেঙে ফেলতে চায়!

এ তো এক সমস্যাই দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় এমন ভিত্তিপ্রস্তর বসাবেন, আর প্রশাসন আশঙ্কায় থাকবে ওটি ভেঙে ফেলা হবে, তাই সেই জায়গায় পুলিশ-ক্যাম্প হবে স্থায়ী। যেমন হয়েছে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

২

রংপুর কারমাইকেল কলেজের জায়গা নিয়ে একটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হোক, এটা রংপুরের মানুষ চায় না। কেন চায় না, আমি ঠিক জানি না। তারা সম্ভবত কারমাইকেল কলেজকেই বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চায়। অথবা চায় আলাদা জায়গায় আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি অবশ্য রংপুরবাসীর এই সেন্টিমেন্টটা ধরতে পারছি না। কারমাইকেল কলেজকেই কেন বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে ? অথবা, কারমাইকেল কলেজের এত এত জমি থেকে অংশ ভাগ নিয়ে একটা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বানালেই বা কী ক্ষতি ? কী জানি নিশ্চয় রংপুরবাসীর কোনো প্রগাঢ় আবেগ বা যুক্তি আছে! কিন্তু দেখুন প্রধানমন্ত্রীর অবস্থাটা! তার সরকার অর্থ বরাদ্দ করে একটা নতুন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে, তিনি কষ্ট-শ্রম-সময় বিনিয়োগ করে সেটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন, কিন্তু জনগণ তা চোখের মণির মতো নিজেরাই রক্ষা করছে না। পুলিশ-প্রহরায় তা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

৩

রংপুরের কথা থাকুক, এবার বরং একটা ছোটগল্পের খসড়া লেখা যাক।

একটা জেলা শহর। সে শহরের প্রগতিশীল মানুষেরা স্বপ্ন দেখেন একটা মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য স্থাপনের। তারা বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেন। একজন ভাস্করকেও পাওয়া যায়। কিন্তু যতবার ভাস্কর্য বানানোর কাজ শুরু হয়, ততোবারই মৌলবাদীরা তা ভেঙে দেয়। শেষপর্যন্ত এটা প্রগতিশীল মানুষদের একটা জেদে পরিণত হয়।

বছরের পর বছর যায়। আসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার। শহরের উদ্যোগী সংগঠকেরা সহযোগিতা চায় জেলা প্রশাসনের। এবার কি শহরে একটা মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য হবে না!

জেলা প্রশাসন এগিয়ে আসে। তাদের বুদ্ধি হলো কেজো লোকের বাস্তববুদ্ধি। ঠিক হয়, একটা বিমূর্ত-স্থাপনা করা হবে, যাতে কোনো পক্ষই এর বিরোধিতা করতে না পারে। ওই ভাস্করকেই দায়িত্ব দেয়া হয় ডিজাইনের।

শিল্পী নিজের সব কল্পনা ও ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে নকশা বানান। নকশা অনুমোদিত হয়। এরপর তা হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি।

ব্যাপারটা চলে যায় ঠিকাদারি, টেন্ডার, কাজ, কন্সট্রাকশন, বিল ইত্যাদির চৌহদ্দিতে।

শিল্পী আর পাত্তা পান না।

কন্ট্রাক্টর কাজ করতে থাকে।

শিল্পী সেখানে যান কাজের অগ্রগতি দেখতে— তাকে পাত্তাই দেয় না ঠিকাদারের লোকেরা। ইতিমধ্যেই জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শহরে আসছেন। তাড়াতাড়ি কাজ সারো, তাড়াতাড়ি— রব পড়ে যায়।

শিল্পী ব্যথিতচিত্তে দেখেন— তার নকশায় যেখানে ছিল মুরালের কাজ, সেখানে রঙ্গি পেইন্ট দিয়ে রঙ করা হচ্ছে। যেখানে ছিল পিতলের কাঠামো, সেখানে লাগানো হচ্ছে কাস্ট আয়রন।

এ তো আমার নকশা নয়— শিল্পী বলেন।

তার কথা কেউ শোনে না।

উদ্বোধন হয়। হাততালি বাজে। শিল্পী কাঁদতে থাকেন। ভেউ ভেউ করে। তার কান্না ঠিকাদার আর তার অভিভাবক প্রশাসনের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।

প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

এই বিষচক্র থেকে বেরুব কী করে ?

ফুয়াদের গল্প বলার গল্পটা কি আপনাদের মনে আছে ?

রাজা গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। রাজসভায় এসে একে একে লোকে গল্প বলছে। কিন্তু কারো গল্পই রাজার পছন্দ হয় না। শেষে পছন্দ হলো কিনা ফুয়াদের গল্প।

ফুয়াদ একটা ছোটছেলে। সে বলল চড়ুই পাখির গল্প। গল্পটা এমন :

এক ছিল চড়ুই পাখি। সে সারাক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে। এ-ই ঘরে তো পরক্ষণেই বারান্দায়। ফুড়ুৎ। আবার ঘরে। ফুড়ুৎ। আবার বারান্দায় ফুড়ুৎ।

রাজা বললেন : ফুয়াদ, তোমার গল্প আর কতক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করবে।

ফুয়াদ বলল : মহারাজ, আমি কী করব! চড়ুই পাখি সারাক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে।

রাজা বললেন, তারপর ?'

'ফুড়ুৎ।'

'তারপর ?'

'ফুড়ুৎ। চড়ুই পাখি যতক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করবে আমার গল্পও ততক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করবে।'

এই গল্পটা আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে গেল। আমাদের সরকার আর বিরোধীদল সারাটি জীবন হরতাল-হরতাল খেলে।

সুতরাং এই অধম গদ্যকার্টুন লেখককেও বারবার একই ধুয়া ধরতে হয়।

২

একদল ক্ষমতায় থাকে। অন্য দল হরতাল ডাকে। অন্য দল ক্ষমতায় যায়। তখন সাবেক সরকারি দল হরতাল ডাকে। এই অচ্ছেদ্য চক্রে পড়ে দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠে গেছে।

আমারো অনেক বড় ক্ষতি হচ্ছে। আমি বারবার একই গল্প বলছি গদ্যকার্টুনের নামে। কী করব ? বারবার যে দেশে একই ঘটনা ঘটে।

এই যে ফুয়াদের গল্প বলার গল্পটি বললাম, এই গল্পটাও আগে বলেছি।

৩

আর দেখুন, সবসময়ই বিরোধীদলগুলো হরতাল আহ্বানের জন্য বেছে নেয় সেই সময়টি, যে সময় দেশে সাহায্যদাতা দেশগুলোর কোনো বৈঠক থাকে; দাতাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যখন বাংলাদেশে আসেন।

এ বছরও তাই করা হলো। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে দাতাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ব্যস, সেদিন থেকেই হরতাল।

১২ সেপ্টেম্বর ছিল ট্রানজিটের প্রতিবাদে সচিবালয় ঘেরাও। তাহলে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে হরতাল কেন ? কারণ সরকার সচিবালয় ঘেরাওয়ে বাধা দিয়েছে।

কিন্তু ১২ সেপ্টেম্বরের প্রথম আলোতেই তো বেরিয়ে গিয়েছিল হরতালের খবর। প্রশ্ন ছিল, হরতাল কত ঘণ্টার ? ১২, ২৪, ২৮, ৭২ ?

অর্থাৎ কিনা, হরতাল কর্মসূচি আগে থেকেই তৈরি ছিল। এটা ঘেরাওয়ে হামলার প্রতিবাদে নয়।

৪

এমন নয় যে, দাতাদের বৈঠক সামনে রেখে হরতাল কর্মসূচি বিরোধীদল এই প্রথম দিল। আগেও দিয়েছে। আওয়ামী লীগও দিত। আওয়ামী লীগ তো খালেদা জিয়া কর্তৃক যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনেও হরতাল দিয়েছিল।

এই নিয়ে আমি ইতিপূর্বে একটা গদ্যকার্টুন লিখেছি। তার নাম বস্তির গল্প।

গল্পটা এমন :

আমাদের বাসার পেছনে একটা পতিত সরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে বস্তিমতো। আমরা ওই বস্তিবাসীদের সাহায্য করি। আমাদের খেয়ে-পরেই ওরা অনেকটা ভালোভাবে বেঁচে আছে।

কিন্তু ওখানে মাতব্বর আছে দুজন। ছয় মাস এক মাতব্বর বস্তি নিয়ন্ত্রণ করে। আর পরের ছয় মাস নিয়ন্ত্রণ করে অন্য মাতব্বর।

যখন এক মাতব্বর মাতব্বরি করে, অন্য মাতব্বর এসে আমাদের বাসায় ঢিল মারে। খবরদার! ওকে সাহায্য করবেন না। ও খুব খারাপ। খুব খারাপ। এই চলছে। আরে, এ তো মহাযন্ত্রণা! তোরা খেয়ে-পরে বেঁচে আছিস আমাদেরটা, আবার যন্ত্রণাও করিস আমাদেরকেই।

৫

সেই পুরনো গল্পটা আবার বলতে হলো। কারণ সেই পুরনো ঘটনাই ঘটছে। সাহায্যদাতারা দেশে এলেই হরতাল!

আমাদের লজ্জাশরম বলতে আর কিছু নেই। জাতীয় মর্যাদাও নেই।

দাতারা এই তামাশা দেখে আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা করেন ? ভাবেন যে, আমরা জংলি, বর্বর!

বর্বরদের নিয়েও আমি গদ্যকার্টুন লিখেছি। পাহাড়ের ওপারে থাকে জংলীরা। তাদের খুব পানির কষ্ট। আমরা কয়েকজন অভিযাত্রী গেছি তাদের কাছে পানি নিয়ে। অমনি জংলীরা আমাদের ঘিরে ধরেছে। খবরদার! এখন পানি দেবেন না, আগে আমাদের সর্দার ক্ষমতা পাক, তারপর দেবেন। এদিকে পানির কষ্টে মারা যাচ্ছে শিশুরা, নারীরা।

৬

সচিবালয় ঘেরাওয়ের আগে-পরে দেশের মানুষের মধ্যে ছিল সীমাহীন উদ্বেগ। সবাই জানত লোক মারা যাবে! সবার জিজ্ঞাসা ছিল, কজন মারা গেছে ?

ভেবে দেখুন, এই রাজনীতির অমানবিক দিকটা! কেউ-না-কেউ মারা যাবে, তার প্রতিবাদে হরতাল ডাকা হবে— সব যেন সাজানো নাটক!

না। এ ধরনের কর্মসূচিতে যদি কেউ সচেতনভাবে যান এবং সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুকে বুকে ডেকে নেন; তার সাহস, আত্মত্যাগ, আদর্শের প্রতি তার অঙ্গীকারকে আমি খাটো করে দেখছি না। তিনি মহান। তিনি শহীদ।

৭

কিন্তু তার এই আত্মত্যাগকে ব্যবহার করা হয় কিসের জন্য। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পারমিট, টেন্ডার লাইসেন্সবাজি করার জন্য।

তাদের কাছে ওই আদর্শের শহীদ ক্ষমতার বাঘ শিকারের টোপ মাত্র। ছাগল মাত্র।

৮

আচ্ছা, হরতালের বিকল্প কি বেরুবেই না! অন্বেষণ করা হবেই না?

ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম, রাস্তার ধারে ফেলে রেখে ভিক্ষা করানোর জন্য ছোট্ট শিশুকে হাঁড়ির ভেতরে শুইয়ে রাখা হয়। বড় হয়েও সে আর বড় হয় না। পরে, তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়।

আমাদের দেশটার যে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তাকে হাত-পা বেঁধে বিনষ্ট করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি হরতাল।

আমাদের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদেরা কি কথাটা একবার ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করবেন?

৯

আমি মনে করি, হরতাল অন্যায়। কিন্তু হরতালে বাধা দেয়া আরো বড় অন্যায়। রাজপথে বিক্ষোভ-মিছিল করতে না-দেয়া সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

আমি নিজে ট্রানজিট ইস্যুতে হরতাল সমর্থন করি না। কিন্তু দেশের মানুষ তো বেশিরভাগ ট্রানজিটবিরোধী হতে পারে। কিংবা দেশের কিছু মানুষ তো যে-কোনো ইস্যুতে সরকারের পদক্ষেপের বিরোধী হতে পারে। তাদেরকে তাদের মত প্রকাশের রাস্তা দিতে হবে। তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করার পথ করে দিতে হবে। সেটা না-দেয়া অগণতান্ত্রিক। অন্যায়। শুধু তাই নয়— ক্ষতিকরও।

গণতান্ত্রিক উপায়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে না দিলে তা চোরাগোপ্তা সংহিস পথ খুঁজে নেবে। আমাদের মতো শান্তিকামী মানুষের দেশে তা হবে একটা আত্মঘাতী পথ-রচনা।

আমি মনে করি, দেশের মানুষের এক বড় অংশের সমর্থন আছে বিএনপির প্রতি। তাদের সেই মর্যাদাটা দিতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। তাদের বিক্ষোভ প্রকাশের রাস্তা খোলা রাখতে হবে। তাদের হরতাল চলাকালে মিছিল করতে দেব না— এটা অত্যন্ত বাজে মানসিকতা। ক্ষতিকর মানসিকতা। অগণতান্ত্রিক মানসিকতা। স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা।

প্রথম আলো, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

ব্যাঘ্রসভার কার্যবিবরণী থেকে

চিড়িয়াখানার বাঘেরা লোকসভা করছে। তাদের মধ্য থেকে একে একে ঝরে যাচ্ছে রাজসিক বাঘেরা। যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে একেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে সঙ্গীদের তারা হারিয়েছে, তাদের শূন্যস্থান কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়। এটা কোনো মুখের কথা না। মানুষদের জরিপের কথা। পৃথিবী থেকে বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে। একেকটা বাঘের মৃত্যু তাই পৃথিবীর জন্যই এক অপূরণীয় ক্ষতি!

চিড়িয়াখানার শোকসভায় বক্তারা এসব কথা বলছেন। মেছো বাঘ, গেছো বাঘ, কালো বাঘ, চিতা বাঘ, কেঁদো বাঘ আর এখনো বেঁচে থাকা রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরা সব অশ্রুপাত করছে।

সবচেয়ে বেশি কাঁদছে বিড়াল। গত কয়েক রাত ধরেই বিড়ালের কান্নায় অন্য পশুপাখিদের ঘুম হারাম। একজন বাঘ তাই ফোড়ন কাটছে, মায়াকান্না! মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

হঠাৎ একটা বাঘ উঠে দাঁড়াল। হালুম! তরুণ প্রতিবাদী এই বাঘটি বসেছিল সভার পেছনের দিকে। শুধু বসে বসে কাঁদলে চলবে না। শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমরা প্রতিশোধ নেবো! বাঘ হয়ে ভাইরাসের কাছে আমরা হেরে যেতে পারি না।

অন্য একজন প্রাজ্ঞ ব্যাঘ্র বলল, কেবল ভাইরাসের কাছে না, আমরা মার খাচ্ছি মানুষেরও হাতে।

কেবল কথা বললে চলবে না। স্বপ্ন দেখতে হবে। কল্পলোকে গড়ে তুলতে হবে প্রকল্প। আমরা চিরটাকাল চিড়িয়াখানায় বন্দি থাকব না। এবার আমরা নিজেরাই গড়ে তুলব চিড়িয়াখানা। সেই চিড়িয়াখানায় আমরা রাখব মানুষকে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ। ডোরাকাটা মানুষ, গোঁফঅলা মানুষ, মেছোমানুষ, গেছোমানুষ।

আমাদের চিড়িয়াখানায় আমরা কোনো অনিয়ম রাখব না। খুবই সুশৃঙ্খল হবে সে চিড়িয়াখানা— বলল আরেকজন বাঘ।

'সেই চিড়িয়াখানায় মানুষের জন্য বরাদ্দ মাছ-ভাতে আমরা থাবা বসাব না। কারণ আমরা হলাম বাঘ। মাছ আমরা খাই না।'

মেছোবাঘের জিভ দিয়ে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

'মানুষদের আমরা ঠিক সময়ে টিকা দেব। যেন কোনো ভাইরাস মানুষদের অসময়ে আক্রমণ করে কুপোকাত না করে।'

'আচ্ছা মানুষদের আমরা টিকা দেবো কেমন করে! তাদের কাছে গিয়ে, নাকি ওরা আমাদের যেভাবে গুলি ছুড়ে টিকা দেয়, সেভাবে?'

'মানুষ বড় হিংস্র প্রাণী! ওদের কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। গুলি ছুড়েই দেব।'

'আচ্ছা, চিড়িয়াখানায় মানুষ সাপ্লাই দেয়ার কন্ট্রাক্টটা কে পাবে?'

'বাঘদের মধ্যেই কেউ পাবে! বললো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

'মানুষ সাপ্লাই দেয়ার কাজ পটাতে কেউ আবার মানুষদের খাবারে বিষ মেশাবে না তো!'

'না না। আমরা তেমন করব না।'

'কিন্তু আমাদের যদি খিদে লাগে, কিংবা আমাদের যদি মাথা গরম হয়ে যায়, তখন দু-চারটা মানুষ কি আমরা মুখে পুরব না?' প্রশ্ন তুলল একটা বাঘ।

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, কে করিবে তবে রক্ষা?' অন্য এক বাঘ বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের বানানো চিড়িয়াখানা মানুষদের বানানো চিড়িয়াখানার মতোই ভয়াবহ হতে যাচ্ছে।'

'না না। তা হতে দেয়া যাবে না।' সমস্বরে বলল সব বাঘ।

'আমাদেরকে মানবচিকিৎসালয় গড়ে তুলতে হবে। অসুস্থ মানুষদের আমরা সেখানে চিকিৎসা করব।'

'সে তো আছেই। মানুষেরা বানিয়েই রেখেছে তাদের কাছে গেলেই হলো!'

'না না। ওদের হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা হয় না। ওদের চিকিৎসার ভার আমাদেরই তুলে নিতে হবে।'

কোন্ কোন্ মানুষকে চিড়িয়াখানায় রাখা হবে তার একটা তালিকাও করতে লাগলো বাঘেরা।

নানা খ্যাতিমান মানুষের নামই তারা উচ্চারণ করল। এর মধ্যে রাজনৈতিক তারকা থেকে সিনে-তারকারা আছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভোট পেল এরশাদ শিকদার। কারণ সে বহু মানুষকে মেরেছে আর তাকে পাওয়া যাবে খাঁচায় পোরা অবস্থায়। অন্য মানুষদের পেলে ভালো হতো, কিন্তু তাদের ধরবেটা কে?

হঠাৎ করে একজন ক্ষুদ্র বাঘ একটা নতুন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করল। বলল, আচ্ছা, চিড়িয়াখানায় মানুষের মড়ক দূর করতে আমরা কী ব্যবস্থা নেবো। যদি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুজ্বর ছড়িয়ে পড়ে।

'সেজন্য মশা মারতে হবে' বলল একজন বৃদ্ধ বাঘ।

'মশা কে মারবে?'

'আমাদের মধ্যে একজনকে মেয়র বানাতে হবে!'

'কে হবে মেয়র?'

'যে মশা মারতে পারবে।'

'কে মশা মারতে পারবে?'

শুনে সমস্ত ব্যাঘ্রসমাজ নীরব হয়ে গেল।

শেষে একজন বলল, আমরা আমাদের চিড়িয়াখানায় কোনো ভালোমানুষ রাখব না। মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া মানুষকে রাখব। এরা হবে ভয়াবহ গোছের মানুষ। এদের মশা কামড়ালে এরা তো মরবেই না, উল্টো মশাই মরে যাবে!

(প্রথম আলোর ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শিশিরের কার্টুন দেখে)

প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

ভূতের সঙ্গে সর্ষের বসবাস

হাশেম সাহেব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। রাত ৮টা কি ৯টা বাজে, তার খেয়াল নেই। তাকে আজ একটা আইডিয়া বের করতেই হবে। আগামীকাল শিশু সংস্থার একজন অফিসার আসবেন। তাকে সেটা দেখাতে হবে।

একটা আন্তর্জাতিক শিশু সেবা সংস্থা এবার শিশু গৃহপরিচারক-পরিচারিকার দিকে সবার দৃষ্টি ফেরাতে চাইছে।এ উপলক্ষে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো, টিভির জন্য দু-তিন মিনিটের বিশেষ বিজ্ঞাপনচিত্র প্রদর্শন— নানা ধরনের কাজই তো করা যায়।

হাশেম সাহেব একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রধান। এই শিশু সংস্থার সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ। এদের অর্থকরী বিজ্ঞাপনী কাজ সব তিনিই করেন।

নিজের ঘরে বসে নানা কথা ভাবেন হাশেম সাহেব। সমস্যাটা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কীভাবে সেটা থেকে একটা সলিড আইডিয়া বের করা যায়— তিনি কিনারা করে উঠতে পারেন না।

তার চিন্তার গ্রন্থি হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। তার স্ত্রী কাজের মেয়ের সঙ্গে চিল্লাচিল্লি করছেন। হাশেম সাহেবের স্ত্রী গুলনাহার একটি সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা।

হাশেম সাহেব স্ত্রীর বাক্যগুলো ফলো করতে থাকেন।

১। 'এই নার্গিস, তুই কী করিস! টিংকু কই! টিংকু ওই ঘরে একা একা গেল কী করে! তোকে তো রাখাই হয়েছে টিংকুকে দেখাশোনা করার জন্য। টিংকু ওই ঘরে, আর তুই ওর খেলনা নিয়ে নিজেই খেলতে লেগেছিস। এই হারামজাদী, তোকে কি রাখা হয়েছে নিজে খেলার জন্য, নাকি টিংকু খেলবে, তুই ওকে দেখবি সেজন্য।'

২। 'এই নার্গিস, কুত্তার বাচ্চা ? টিংকু কী করছে দ্যাখ বিছানার মধ্যে রংটং ফেলে। হারামজাদী তুই কী করতেছিস। বসে বসে নাটক দেখিস। টিভি দেখার জন্য তোকে আনা হয়নি। ওই কুত্তার বাচ্চা, টিংকুর সাথে তো কার্টুনও দেখিস। আবার নাটকও দেখিস। আয়, এদিকে আয়। ঠিকভাবে বল্, তুই কোন্‌টা দেখবি। নাটক না কার্টুন।'

৩। 'বুয়া এদিকে আসো। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে ? বোনপ্লেট কই ? পানি কই? লবণ কই ?'

'ওই তো লবণদানি। এই যে বোনপ্লেট।'

'খুব লবণদানি বোনপ্লেট দেখাচ্ছ। পানি কই ?'

'দিতাছি।'

'দিতাছি। কতক্ষণ লাগে দিতে। একঘণ্টা ধরে তো টেবিলে খাবার দিচ্ছ।'

'না। এক ঘণ্টা হয় নাই।'

'ওহ্! উনি ঘড়ি দেখে চলছেন। মুখে মুখে তর্ক করো কেন ?'

'কই মুখে মুখে তর্ক করলাম!'

'ফের মুখে মুখে তর্ক।'

'না আপা, আমি তর্ক করি নাই।'

'বুয়া। পোষালে কাজ করবা, না হলে বিদায় হবা। এক কাপড়ে আসছ এক কাপড়ে চলে যাবা। ভাত ছিটালে কাকের অভাব হবে না।'

হাশেম সাহেব ভাবেন, বেশ তো। এক কথায় চাকরি নট। এখন যদি গুলনাহারের প্রিন্সিপ্যাল কাল তাকে ডেকে বলে— গুলনাহার, শোনেন। কাল আপনাকে বলেছিলাম একটা আর্টিকেল লিখে আনতে। এনেছেন...

'আপা, লিখছি। কালকে দেব।'

'কালকে দিলে তো চলবে না। একটু পরে ওটা রেডিওতে পড়তে দিতে হবে।'

'সে কথা তো আপা বলেন নাই।'

'সব কথা খুলে বলতে হবে ? এতদিন ধরে কাজ করছেন, নিজের বুদ্ধিতে কোনো কাজ করতে পারেন না।'

'নিজের বুদ্ধিতেই তো করি।'

'মুখে মুখে কথা বলবেন না।'

'মুখে মুখে তো কথা বলছি না।'

'বলছেন। শোনেন। কাল থেকে আর কলেজে আসবেন না। এক বস্ত্রে এসেছিলেন, এক বস্ত্রে চলে যাবেন। ভাত ছিটালে কাকের অভাব হবে না।'

কদিন আগে গুলনাহার দেশে গিয়েছিল। তখন নার্গিস নামে ছয়-সাত বছরের এ-বালিকাটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ওখান থেকেই একে আনা!

ওর বাবা এল মেয়েকে দেখতে। নার্গিস সোজা গিয়ে বাবার কাঁধে চড়ে বসল। তারপর আর কাঁধ থেকে নামে না। বাবার সঙ্গে যতক্ষণ ছিল, বাবার কাঁধে কাঁধেই ছিল। এই নিয়ে গুলনাহারের কথা :

'শোন্, বাপকে দেখে আল্লাদে গলে পড়লি। অত বড় ছেড়ি, বাপের কাঁধে ওঠো। বাপকে সামনে রেখে কী কান্না। ঢাকায় যেন ওকে আমরা খালি মারধর করি। যেই বাপ বিদায় নিয়েছে, অমনি কী হাসি। এই, আসলি ক্যান! থাকতি! ওই যে আছে না বোনগুলান। হাড্ডি গোনা যায়। মুখ শুকায়া দাঁত বের হয়ে গেছে। থাকতি....আসলি ক্যান....আবার আল্লাদ দেখো।'

হাশেম সাহেব ভাবেন, আহা! তার টিংকুকে যদি কেউ এমনি করে বলে, এই হারামজাদা, সেদিন দেখি বাপের কোলে উইঠা বসছোস, এত বড় ছ্যাড়া, বাপের কোলে কোলে চলো। না!.....

হাশেম সাহেব আর ভাবতে পারেন না। তার টিংকুমণি। ছোট্ট ছেলেটা। খাড়া খাড়া চুল। পুতুলের মতো তুলতুলে গাল। তাকে কি কেউ কখনো এইভাবে গালিগালাজ করতে পারবে!

প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

সোনা জয়ের নেপথ্যে আসলে কে ?

হাশেম আলী অপেক্ষা করছিল এ প্রসঙ্গটি শুনবার জন্য। কান উঁচিয়ে। যাকে বলে উৎকর্ণ হয়ে!

অবশেষে সে শুনতে পেল কাঙ্ক্ষিত কথাগুলো। একজন প্রতিমন্ত্রীর বিবৃতিতে। বিটিভির আটটার খবরে।

উপলক্ষ বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাফ গেমসে সোনা অর্জন। বড়ই আনন্দদায়ক উপলক্ষ! ১৭ বছর লড়াই করে, প্রার্থনা করে, হা-পিত্যেশ করে, মরিয়া বেড়ালের বাঘ হয়ে ওঠার কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, হাজার হাজার টাকার মধু খেয়ে, গালি খেয়ে, জম্বুরা-প্র্যাকটিস পর্যন্ত করে যা হয়নি, আজ কিনা তাই সম্ভবপর হলো!

সাফ ফুটবলে সোনা!

সেটা কী করে সম্ভব হলো!

হ্যাঁ। প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকেই জানা গেল আসল কারণটি। প্রতিমন্ত্রী অভিনন্দন জানালেন খেলোয়াড়দের, প্রশিক্ষককে, কর্মকর্তাদের— এবং অভিনন্দন জানালেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে।

নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতিত্বের দাবিদার। কারণ তার ক্রীড়া-প্রেম, ক্রীড়া-সেক্টরের প্রতি তার আগ্রহ, ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রদত্ত তার উৎসাহ অনুপ্রেরণা— এ-সবই খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছে সোনা জয় করতে।

ব্যাপারটা তো খুবই সহজ— সিঁড়ি-ভাঙা সরল অঙ্কের মতোই সরল।

খেলোয়াড়রা ভালো খেলেছে, জয় আনতে চেয়েছে— কারণ এভাবে তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা জোগানো হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা যুগিয়েছে প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও দেশের মানুষ।

এই প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও দেশের মানুষকে নেতৃত্ব কে দিয়েছেন ?

শেষ বিচারে, তা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অতএব, হাশেম আলী একটা চিঠি লেখে। চিঠিটা এ রকম :

হে প্রিয় নেতৃবৃন্দ,

আমার সালাম নিবেন।

আমি একটা স্বপ্ন দেখছি।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সাফ ফুটবলে সোনা বিজয় উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী (বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী, বাংলার ১৪ কোটি মানুষের নয়নের ২৮ কোটি মণি) শেখ হাসিনার সংবর্ধনা। এতে সভাপতিত্ব করবেন জননেতা, জাতীয় নেতা, আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমু। (শুধু এলাকার মানুষই তাকে চিনল না, এমপি বানাল না। সে তার জন্য ভালোই হয়েছে। এমপি হলে মন্ত্রী হতেন, মন্ত্রী হলে তো আর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হতে বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে পারতেন না।)

আর এতে বিশেষ বক্তা হিসেবে ভাষণ দেবেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধুর এককালের সহযোগী জিল্লুর রহমান।

এতে বক্তারা বলবেন, সোনা-জয়ে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান রয়েছে। এ অবদান যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা কেন তাদের আমলে সাফ ফুটবলে সোনা অর্জন করে দেখাল না? আমরা কি নিষেধ করেছিলাম ? সেদিন যদি তাদের নেতা-নেত্রী সোনা জয় করতে পারত, তবে আমরা তাকেই সংবর্ধনা দিতাম। এক্ষেত্রে আমাদের উদারতার অভাব হতো না।

আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন তো হতে পারত তাদের আমলেই। হয়নি কেন ? আর দেখুন আমাদের নেত্রীকে। তিনি তসবিহ নিয়ে বসেছিলেন সারাদিন, আল্লার ইচ্ছায় তার দোয়ায় খেলোয়াড়দের খেলায় আমরা আইসিসি ট্রাফিতে চ্যাম্পিয়ন হলাম। তারপর বিশ্বকাপ। রাজার পুণ্যে প্রজার সুখ, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট— এটা সবাই জানেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ায়, খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রেখে তার পক্ষ থেকে উৎসাহদানের ফলে বিশ্বকাপেও বাংলাদেশ ভালো করেছে। পাকিস্তানকে হারিয়েছে।

এবার এল সাফ ফুটবলের কাঙ্ক্ষিত সোনা।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারে যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনার কারণেই বাংলাদেশ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভালো করছে। অতএব হে প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা, সংবর্ধনা গ্রহণ করুন।

ভবিষ্যতেও আপনার নেতৃত্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে ও শান্তির ক্ষেত্রে আমরা চাই আরো আরো পুরস্কার / সম্মান / সোনা / পদক।

আপনি অতীতে ক্রিকেটের জন্য আলাদা স্টেডিয়ামের ঘোষণা দিয়েছেন, এবার ফুটবলের জন্যও আলাদা স্টেডিয়ামের ঘোষণা দিন। ঘোষণা দিতে পয়সা লাগে না, ইনশাল্লাহ। জয়বাংলা।

ইতি

হাশেম আলী

হাশেম আলী তার চিঠিটি সব আওয়ামী লীগ নেতার নামে পোস্ট করল।

তারপর তার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। শান্তির জন্য শেখ হাসিনা সক্রেটিস, মাদার তেরেসা প্রমুখের সঙ্গে তুলনীয়; ক্রীড়াক্ষেত্রে কী তুলনা করা যায়? এ নিয়ে তো একটা প্যারাগ্রাফ রাখা উচিত ছিল।

দুরো। আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ। আমি কি অত জানি নাকি। জিল্লুর রহমান প্রমুখ এটা ঠিকই বের করে নেবে।

প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর, ১৯৯৯

মানুষ, তোমাকে বলি...

একটা টিয়াপাখি। কথা বলতে পারে। সকালবেলা বলে গুড মর্নিং, সন্ধ্যায় বলে গুড ইভনিং। আর রাত্রি যখন গভীর হয়, তখন যদি হঠাৎ কোনো শব্দ-টব্দ হয়, সে বলে ওঠে : শব্দ কিসের, চোর নাকি!

বাড়িতে দুলাভাই এসেছেন। তিনি তো আর এতকিছু জানেন না। রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন— সদুদ্দেশ্যেই, অমনি টিয়াপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার : শব্দ কিসের, চোর নাকি!

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল লোকজন। চোর নাকি, চোর নাকি। চোরই বটে। শ্যালক-শ্যালিকাগণ দাঁত কেলিয়ে হাসে।

একদিন দুদিন তিনদিন। টিয়াপাখি আর দুলাভাইকে চিনে উঠতে পারে না। প্রায়ই দুলাভাই ধরা খান। বাচ্চারা তাকে 'চোর খালু' বা 'চোর ফুপা' বলে ডাকতে শুরু করে।

শেষে দুলাভাই খেপে যান। একদিন বাসায় কেউ নেই। দুলাভাই একা। পাখিটাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য দুলাভাই খাঁচার ধারে যান। খাঁচার দরজা খুলে খপ করে সেটাকে ধরে ফেলেন। শক্ত তার দিয়ে তাকে ভালো করে বাঁধেন। তারপর শিলপাটার কাছে যান। পাটার ওপর রাখেন পাখিটাকে। আর শিলটা হাতে তুলে নিয়ে *পাখিটার মাথা বরাবর সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেন। পাখির মাথাটা থেঁতলে যায়।* মগজ ছিটকে এসে পড়ে দুলাভাইয়ের কপালে। রক্ত ফিনকি দেয়। আর্তনাদ, গোঙানি, রক্ত, মগজ, থেঁতলানো পালক-মাংস-হাড়— দুর্বিষহ এক দৃশ্য রচিত হয়।

পাখিটা মারা যায়।

২

প্রিয় পাঠক, এই পাখির মৃত্যুদৃশ্যটা কি আপনাকে ব্যথিত করছে না! আপনার মন খারাপ করে দিচ্ছে না।

আমি জানি, দিচ্ছে। মানুষ মাত্রই সহৃদয়, মমতাময়। এ ধরনের দৃশ্য বা ঘটনা বা বর্ণনা সে সহ্য করতে পারে না।

আর বাঙালি-হৃদয় খুবই নরম।

এর আগে আমি লিখেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষের মূলধারাটা সহৃদয় বিবেকবান। তারা যা সত্য বলে জেনেছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে না। নইলে বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই— এ দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে কতজন প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কেউ মোশতাক বা স্বঘোষিত খুনিদের গাড়িতে একটা ঢিল পর্যন্ত মারেনি। একই কথা আমরা বলতে পারি, গোলাম আযমের ফাঁসির দাবি প্রসঙ্গে। গণআদালতের ফাঁসির রায় কার্যকর করো, এ দাবিতে কতজন প্রাণ দিয়েছে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে— কিন্তু গোলাম আযমের ছায়াটিকেও কেউ আঘাত করেনি।

এটা হলো বাঙালিদের সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এরা করুণাময়, ক্ষমাশীল।

কিন্তু এর উল্টোপিঠটা ভয়ঙ্কর। মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধ-অন্ধকারের শক্তিরা বড় নির্মম। বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র কিংবা বঙ্গবন্ধুর গর্ভবতী পুত্রবধূকে তারা হত্যা করেছে। '৭১ সালে এরা তালিকা করে করে বাড়ি থেকে হাত বেঁধে, চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষককে, এবং হত্যা করেছে— তাদের মতাদর্শ তাদের কতটা অন্ধ, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর করে তোলে।

৩

একটা টিয়াপাখির মাথা একটা পাথরে রাখা হলো। আরেকটা পাথর তুলে থেঁতলে দেওয়া হবে তার মস্তক। এ ঘটনা ঘটানোর আগে আপনি আঁতকে উঠবেন, মিনতি করবেন : থামো।

কিন্তু চিন্তা করুন খুলনার কলেজছাত্র জাহাঙ্গীরের কথা। কলেজে পড়ে সে। টগবগে যুবক। তার ওপরে কত আশা তার বাবা-মার, ভাইবোনের, আত্মীয়স্বজনের। হয়তো দুপুরবেলা ঘর থেকে বেরোবার আগে বলে গেছে— দেখিস, আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলায় পাইলট সেঞ্চুরি করবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। খেলা এগিয়ে চলছে। পাইলট করল অপরাজিত ৫৩। কিন্তু জাহাঙ্গীর আর ফিরল না ঘরে।

দুপুরবেলা সে গিয়েছিল তাদের মসজিদে, নামাজ পড়তে। ওখানে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে উড়ে গেল তার হাত-পা। ওই তো পড়ে আছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এখানে-ওখানে পড়ে আছে মানুষেরই রক্ত, মাংসের দলা, উড়ে যাওয়া কান।

এভাবে মরে গেল ছয়জন। আহত হলো আরও কতজন। মানুষের আহাজারিতে-আর্তনাদে-চিৎকারে-গোঙানিতে ভারী হলো মসজিদ চত্বর, হাসপাতাল। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল স্বজন হারানোর কান্না।

৪
এমন মৃত্যু কারোরই পাওনা নয়। মানুষ কেন মানুষকে মারতে যাবে এভাবে। ওদের অপরাধ, ওরা একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করে— যার সঙ্গে অন্যদেরটা মেলে না!

কিন্তু মতপার্থক্য, বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য মানুষ হত্যা করবে মানুষকে— এটা হতে পারে!

যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, বাস্তবে তাই ঘটল! শুধু মসজিদ ? সংবাদপত্র অফিসে পর্যন্ত বোমা পাতা হলো! ওই বোমা বিস্ফোরিত হলে আরও কত মায়ের বুক খালি হত, হায়রে!

এটাকেই বলে সন্ত্রাসবাদ। কে মরবে, কে বাঁচবে— বিন্দুমাত্র মানবিকতা প্রদর্শন না করেই নির্বিচার মৃত্যুফাঁদ পেতে রাখা।

৫
মনে হচ্ছে জামায়াতের আদর্শিক গুরু মওলানা আবু আলা মওদুদীর প্রেতাত্মা আমাদের পিছু ছাড়েনি। মওদুদী, 'মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে' গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছিলেন— ইসলাম থেকে চ্যুত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নানাভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাদের মতে যারা ইসলাম থেকে চ্যুত, তাদের কতল করতে।

অথচ হাদিসে আছে : 'কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে (মুসলমান) কাফের বলবে না। কোনো-না-কোনো ব্যক্তি অবশ্যই কাফের, কিন্তু কাউকে কোনো ব্যক্তি কাফের বললে, সে যদি কাফের না হয় তাহলে যে-ব্যক্তি তাকে কাফের বলছে সে নিজেই তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যাবে। আর যাকে কাফের বলেছে, সে যদি সত্যি সত্যি কাফের হয়, তাহলে সে আর কাফের থাকবে না, তার কুফরত্ব যে-ব্যক্তি কাফের বলেছে তার উপর তৎক্ষণাৎ বর্তাবে (বোখারি ও মুসলিম শরিফ)।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওদুদীরা অন্যদের কাফের, মুরতাদ বলেই চলেছিল (এখনো চলছে না কি ?)। জামায়াতিরা তেপ্পান্নো সালে পাঞ্জাবে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সৃষ্টি করে। 'আহমদীয়া' সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণা করে। শত শত আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে হত্যা করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, সম্পদ লুট করে, নারীধর্ষণ করে।

পরে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস রুস্তম কায়ানী এবং পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের চিফ জাস্টিস মোহাম্মদ মুনীর এই নরহত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার অপরাধে মওলানা মওদুদীসহ আরও ১৭ জন তথাকথিত উলেমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। এই মৃত্যুদণ্ড শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি, কমিয়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাত্র পঁচিশ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৫ সালের ২৮ এপ্রিল তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে বলেই হয়তো বারবার মায়ের বুক খালি হয়।

৬
আমরা জানি না, খুলনার মসজিদে বোমা হামলা কারা করেছে। জানি না, জনকণ্ঠ অফিসসহ অন্যত্র বোমা কারা পেতেছে। কিন্তু মানবতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী মানুষের বেশে পশুর চেয়েও অধম এ অপরাধীদের প্রতি তীব্র ধিক্কার আমরা জানাই।

জানি না, এই সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্ধত্বের ও পশুত্বের কোন্ স্তরটি কাজ করছে। নিছক ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অন্ধত্ব ? নাকি রাজনৈতিক গূঢ় অভিসন্ধি ? প্রতিশোধস্পৃহা ? ক্ষমতার খেলা ?

শুধু বলি, পশুত্বের বিরুদ্ধে জেগে উঠুক মানুষের মনুষ্যত্বটুকু।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯

প্রবাদ-প্রবচন যখন সত্য হয়ে ওঠে

একদিন সকালবেলা উঠে হাবিব সাহেব দেখলেন, তার আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে।

এই যে কথাটা বলা হলো, তা কিন্তু বাস্তবে কোনোদিন সম্ভবপর হয় না। এমনকি কখনো হয় যে, সকালবেলা উঠে দেখব আমার হাতের দশটা কি একটা আঙুল ফুলে গেছে—এতটাই ফোলা যে, তা একেকটা কলা তো কলা, কলাগাছের সমান ? তা কী করে সম্ভব ? চিকন হাতে এতটা মোটা কলাগাছ ধরবে কোথায় ? আর মানুষের অঙ্গ ফুঁড়ে বেরুবে বৃক্ষ, তাই বা কী করে হয়।

কিন্তু যদি বলি, একদিন সকালবেলা উঠে দেখলাম, হাবিব সাহেবের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে– অথবা হাবিব সাহেব আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। হয়তো এ দ্বিতীয় বাক্যটিই সঠিক। কারো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় না, কেউ কেউ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়।

বাংলা বাগধারাগুলো নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। ভাবি যে, এগুলোর আদি উৎস কী? আর এসবের আধুনিকীকরণ বা যুগোপযোগীকরণ দরকার আছে কিনা। যেমন শাঁখের করাত। এটা নিশ্চয় শাঁখ দিয়ে বানানো করাত নয়, বরঞ্চ শঙ্খ কাটতে যে করাত ব্যবহৃত হয়, সেটা। করাত সাধারণত যাওয়ার সময় কাটে, আসার সময় কাটে না। কিন্তু শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। আধুনিককালে সেটা হলো মোবাইল ফোন। যেতেও বিল, আসতেও বিল।

এই বাগধারা, প্রবচন, শোলকগুলো কখনো কখনো এর ব্যবহারিক অর্থে তো বটেই, শাব্দিক অর্থেও আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারে!

ধরা যাক, চাঁদের হাট কথাটা। এমন কি হতে পারে, পৃথিবীর চাঁদ আর অন্যান্য গ্রহের চাঁদগুলো একত্রিত হয়ে হাট বসাতে পারে ?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো পারেই। যেমন, তেল দেওয়া। বড় সাহেবকে তেল দিলে কাজ হয়— এটা সবার জানা। এ তেল হলো চাটুকারিতা, মোসাহেবি, অকারণ প্রশংসা। হয়তো পল্টন ময়দানে সংবর্ধনার আয়োজন করা।

কিন্তু এমনও হতে পারে, কেউ বড় সাহেবের রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল দুই সের খাঁটি সর্ষের তেল। কেউ হয়তো নিবেদন করলো খাঁটি গব্যঘৃত। কিংবা এমনও তো হতে পারে, বড় সাহেবের গড়িতে করে বাজারটা নিয়ে সাহেববাড়ি ফেরার পথে গাড়ির টাঙ্কিতে ভরে দিল লিটার লিটার পেট্রল/অকটেন। এক্ষেত্রে আমরা বলব, তেল দেওয়া কথাটা শাব্দিক অর্থ আর ফলিত অর্থ দুটোই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে পুকুরচুরি প্রবচনটির কথা। দিনে-দুপুরে কি কেউ পুকুরচুরি করতে পারে! অনুমান করতে পারি, বাংলার স্বর্ণযুগে যখন কৃষকের গোয়াল ভরা ছিল গরু, আর পুকুর ভরা মাছ, তখন কারো কারো পুকুরে রাতের বেলা চোর হানা দিত। শব্দ না করে মাছ ধরা কষ্টকর। বড়শিতে হয়তো সম্ভব, কিন্তু জাল ফেলে? অসম্ভব! আর বঁড়শিতে দুটো মাছ ধরা হলে সেটা মাছ চুরি হয়, পুকুর চুরি হয় না। এমন অবস্থায় দিনে-দুপুরে কারো পুকুরের সব মাছ যদি চোরে নিয়ে যায়, সেটা আশ্চর্য ঘটনাই বটে! বলা যায় রাহাজানি।

বাংলার সেই স্বর্ণযুগ এখন নেই। তবে এখনো শাব্দিক অর্থে পুকুরচুরি সম্ভব। এটা নাকি একবার হয়েওছিল। অত্র এলাকায় পানীয়জলের সংস্থানের জন্য পুকুর কাটা প্রয়োজন— এই মর্মে দেন-দরবার করে বরাদ্দ পাওয়া গেল বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ। সেটা আত্মসাৎ করে ফেলা হলো। এরপর শোনা গেল ইন্সপেক্টর আসছে পুকুর কাটার অগ্রগতি দেখতে। তাড়াতাড়ি শুরু হলো দেন-দরবার। এই পুকুরে মশা-মাছির জন্ম হচ্ছে, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে ওটা ভরাট করতে হবে। আবার অর্থ বরাদ্দ হলো, পুকুর ভরাট প্রকল্পের অর্থ। এরপর থেকেই নাকি পুকুরচুরি কথাটা বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে।

এবার আসি আসল প্রসঙ্গে। আমাদের রাজনীতি যে দূষিত, এতে অন্তত জনগণের কোনো সন্দেহ নেই। পাবলিক নিত্যদিন চোখ-কান বুজে নাকে রুমাল দিয়েই রাজনীতির গলি-ঘুপচি পার হচ্ছে।

এই তো সেদিনই একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিল : সংসদে ডাস্টবিনের গন্ধ। এই শিরোনামটিকে অবশ্য শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এটা হলো অন্তর্নিহিত অর্থ। সংসদ এলাকায় ডাস্টবিন থেকে ময়লা সরানো হচ্ছে না, ডাস্টবিন উপচে পড়ছে মাছের কানকোয়, কাঁঠালের ভুতিতে, মরা বেড়ালের গলাপচা শরীরে— কথা কিন্তু তেমন নয়। সংসদ ভবন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুবাসিতই আছে। তবে স্যারেরা যে-ধরনের কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে যেন মানুষের মুখ খোলা হচ্ছে না, খোলা হচ্ছে ম্যানহোলের ঢাকনা।

আর রাজনীতিতে কাদা ছোড়াছুড়ির কথাটাও আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। শুনতে শুনতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, রাজনীতিতে কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে— এমন আর আমরা বলি না। বরং বলি, রাজনীতি আর কাদা ছোড়াছুড়ি সমার্থক হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ বলে, ওরা কাদা ছোড়াছুড়ি করছে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা রাজনীতি করছে।

তবুও এ-কথাটাও এতদিন একটু প্রতীকী অর্থেই গ্রহণ করতে হতো।

কিন্তু চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন সাহেব আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি নেতা (সাবেক মেয়র) নাসিরউদ্দিন সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা এখন বাস্তব অর্থেই কাদা ছোড়াছুড়ির পর্যায়ে নেমেছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে ১৯৯৯ সালের অক্টোবরের শেষে, যখন বিরোধীদল আহূত হরতালে সিটি করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ি হরতালকারীরা পুড়িয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে, যতদূর জানা যায়, মেয়র মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সিটি করপোরেশনের কর্মীরা গভীর রাতে বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিনের বাড়ির সামনে দুই ট্রাক ময়লা ফেলে রেখে যায়। নাসির তার প্রতিবাদে মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

আমরা হরতাল চলাকালে সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী গাড়ি ভাঙচুরের নিন্দা জানাই। এটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। আর নাসিরের বাড়ির সামনে ময়লা ফেলার মহিউদ্দিনীয় বুদ্ধিকে আমরা কীভাবে নেব? সাধুবাদ জানাব, নাকি জানাব নিন্দা?

আমরা ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমাদের রাজনীতি যে সত্যি সত্যি নোংরা বর্জ্য কাদা ছোড়াছুড়ির পর্যায়েই নেমে গেছে— সেই সত্যটা এমন জ্বলন্ত সত্য করে আর কেউই প্রমাণ করতে পারত না।

কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা খবর হয় না। কিন্তু মানুষ যদি কামড়ায় কুকুরকে, তা খবর হয়। একটি খবরের জন্ম দেওয়ার জন্য কেউ যদি সত্যি সত্যি কুকুরকে কামড়াতে থাকে, তাহলে তাকে আমরা কী বলব?

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। রাজনীতি আর কাদা ছোড়াছুড়ি সমার্থক– এটা আজ প্রমাণিত। ধন্যবাদ মেয়র মহিউদ্দিন, ধন্যবাদ নাসিরউদ্দিন।

প্রথম আলো ২৮ অক্টোবর, ১৯৯৯

ভবিষ্যতের খাদ্য

নতুন সহস্রাব্দ আসতে কতদিন বাকি! কেউ বলছেন আর মাত্র ২২ দিন। কারো মতে আর মাত্র এক বছর ২২ দিন।

যারা ২২ দিনের সমর্থক, তারা বলেন— ভাই, আর-যে বছরের আগে ১৯ লিখেতে হবে না, এটাই কি একটা বড় পাওয়া নয়? গত ১০০ বছর ধরে ১৯ লিখেছি আর নয়! আর যারা মনে করেন, নতুন শতাব্দী (এবং নতুন সহস্রাব্দ) শুরু হবে ২০০১ সালে তাদেরও কথায় যুক্তি হচ্ছে : ১ থেকে ১০০ সাল পর্যন্ত একটা শতাব্দী, ১০১ সালে না নতুন শতকের শুরু!

আমরা এত প্যাঁচঘোচ বুঝি না। আমরা বুঝি, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। ২০০০ সালের গায়েও লেখা থাকবে না নতুন সহস্রাব্দ, ২০০১ সালের গায়েও না। আমাদের দিনগুলো আগের মতোই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে কোনোমতে চলে যাবে। কারো কারো দিন হয়তো আদৌ যাবে না।

তবুও এই আমাদের নতুন সহস্রাব্দ বরণের আয়োজন— গদ্যকার্টুনের ভাবনায় নতুন শতক, সম্ভব হলে নতুন সহস্রাব্দ।

খাদ্য

বসে আছি প্রথম আলো কার্যালয়ে। কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ের সিএ ভবনের দোতলায়। রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে আঁতকে উঠি। সে কী? এত ধোঁয়া কেন? আগুন লেগেছে নাকি? না। আগুন লাগেনি। ঢাকার রাস্তা যথারীতি স্থবির। ছবির মতো অনড়। রাস্তা জুড়ে গিজগিজ করছে বাস-গাড়ি-স্কুটার-টেম্পো। আর ধোঁয়া ছাড়ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় রাস্তার ওপরের আকাশ একেবারে ধোঁয়াশাময়। একটু দূরের গাড়িঘোড়াগুলো ধোঁয়ায় আবছা হয়ে আছে। এত ধোঁয়া।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরুচ্ছে গলগল করে। বেরুচ্ছে আস্ত কার্বন আর কার্বন-মনো-অক্সাইড, সালফার, সিসা।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুধু এই ভয়াবহ রকম লক্কর-ঝক্কর বাস-টেম্পো-বেবিট্যাক্সিগুলো উগরে দিচ্ছে, তা নয়; প্রতিমুহূর্তে সিলিন্ডার সিলিন্ডার গ্যাস ভুসভুস করে উদগীরণ করছে শত শত চুলা, কলকারখানার চিমনি, আর খোদ মানুষেরা।

একদিকে অক্সিজেন গ্রহণকারী মানুষ ও কলকারখানা বাড়ছে— যে-কোনো জিনিস পোড়া মানেই তো অক্সিজেনের বিনিময়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া— অন্যদিকে প্রতিনিয়ত কাটা হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণকারী ও অক্সিজেন উৎপাদক যন্ত্রগুলো, অর্থাৎ কিনা গাছ। আমরা গাছ কাটতে ভালোবাসি, গাছকাটা আমাদের শখ, পেশা, নেশা— গাছ না কেটে আমরা থাকতে পারি না। আমরা পার্কের জায়গায় গড়ে তুলি নাট্যশালা।

আগামী শতকে তাই ঢাকা শহরের বাতাসে অক্সিজেন থাকবে না, থাকবে শুধু কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

এ অবস্থায় ঢাকাবাসী বাঁচবে কী করে?

ভাবতে ভাবতে যখন আমি মাথায় সবগুলো চুল পাকিয়ে ফেলেছি, প্রায় হঠাৎই আমাদের এক বন্ধু সাংবাদিকের মাথায় সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম। হঠাৎই দেখি, তার মাথায় চুল পেকে সবুজ হয়ে গেছে। দি আইডিয়া! এটাই হলো ভবিষ্যতে ঢাকাবাসীর বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

আমরা জানি, দুনিয়াটা অস্তিত্বের সংগ্রামের ক্ষেত্র— এখানে প্রতিনিয়ত করতে হয় স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স। আর এখানকার নিয়ম হলো— সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট। যোগ্যতমই এখানে টিকে থাকবে কেবল। যোগ্যতমেরা কীভাবে টিকে থাকে? বিবর্তনের মাধ্যমে। যখন বনের সব পাতা প্রাণীসকল খেয়ে ফেলল, জিরাফ করল কী, নিজের গলা লম্বা বানিয়ে ফেলল, যাতে মগডালের পাতাটুকুন নাগালে পাওয়া যায়।

ঢাকাবাসীও এইভাবে বিবর্তিত হবে। তার মাথার চুল হবে সবুজ। তার হাত-পাগুলো হবে ডাল, আর আঙুলগুলো হবে সবুজ পাতা। এরপর সে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য বাতাস থেকে গ্রহণ করবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর ছাড়বে অক্সিজেন। তার খাদ্যপ্রস্তুতির জন্যে শরীরে লাগবে সূর্যালোক— সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সে খাদ্যগ্রহণ করবে।

বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আকাশের সূর্যের আলো ছাড়া আর লাগবে তরল খাবার, গাছেরা যা গ্রহণ করে আর কী! আমাদের ম্যানহোলগুলো থেকে সহজেই সেটা পাওয়া যাবে অতি উত্তম সারযুক্ত তরল খাবার।

ব্যস। ভবিষ্যতের ঢাকাবাসীর জীবনের দুটো বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এক : বাতাসে অক্সিজেনের অভাব আর কোনো সমস্যা করবে না।

দুই : এত লোকের মুখে অন্ন জোগানোর কথা আর ভাবতে হবে না।

নতুন সহস্রাব্দ হবে তাই ঢাকাবাসীর সহস্রাব্দ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হলে যা লাগবে তা হলো : বেশি করে গাছকাটা, আরো আরো গাছকাটা, আর ঢাকার রাস্তায় বেশি করে এইসব বাতিল পুরনো যন্ত্রযান ও পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিষ উদ্রেককারী টেম্পো-বেবিকে অবাধে চলতে দেওয়া। সেটা যে আমরা পারব, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই!

প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

আমি কেন বহুমূত্র নিয়ে লিখলাম

সম্পাদকগণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমি প্রতি সংখ্যায় একটা করে 'যাচ্ছেতাই' লিখব। বিষয় কী হবে ? আমার প্রস্তাব : অন্যদিন যে-বিষয়টা নিয়ে প্রচ্ছদ-কাহিনী করবে, আমিও সে-বিষয়টাই বেছে নেবো। শুনে অন্যদিনের সম্পাদকগণ হাসলেন। সেটা কি সম্ভব! ধরুন, আমরা প্রচ্ছদ-কাহিনী করলাম বিপাশাকে নিয়ে, আপনি কী করবেন ?

আমি নীরব হয়ে গেলাম। সম্পাদকগণ আমাকে বাঁচার উপায় বাতলে দিলেন। বললেন, এ ধরনের সংখ্যায় আপনি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে লিখবেন।

এ ধরনের ঘটনা একবার হয়েছিল একটা ডাক্তারখানায়! ডাক্তার বললেন, আপনি খোসাসমেত ফল খাবেন। যেমন পেয়ারা, কুল, শশা। বুঝলেন ?

জি। রোগীর জবাব।

আপনার প্রিয় ফলটাই খোসাসহ খাবেন। বুঝলেন ?

জি। বুঝলাম।

আপনার প্রিয় ফল কী ?

জি, নারিকেল।

উপরের গল্পের সমস্যার সঙ্গে আমার সমস্যাটার মিল আছে। সব ফল খোসাসমেত থাকে, এ প্রতিজ্ঞা করার পর ফল হিসেবে উদিত হলো নারকেল। আর প্রচ্ছদ-কাহিনীর বিষয়টা নিয়েই 'যাচ্ছেতাই' লেখার প্রতিজ্ঞা করার পর প্রচ্ছদ-কাহিনী হিসেবে মনোনীত হয়েছে 'বহুমূত্র'।

আমাকে কি তাহলে বহুমূত্র নিয়েই লিখতে হবে ?

আমি কি পারব ?

হুমায়ূন আহমেদ তখনও বিখ্যাত হয়ে ওঠেননি।

তিনি 'এইসব দিনরাত্রি' না দিয়ে একটা এক পর্বের টিভি-নাটক নিয়ে বিটিভি কর্তার কাছে গেছেন। কর্তাটি পাণ্ডুলিপি পড়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি এই কহিনীটাই সাত পর্বে লিখে আনতে পারবেন ? হুমায়ুন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'কেউ আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে পারবে কিনা, তখন আমার খুব রাগ লাগে। জেদ চাপে। পারব না মানে ?'

হুমায়ূন পারলেন। বিটিভিতে প্রচারিত হলো এইসব দিনরাত্রি। হুমায়ূন হয়ে গেলেন সুপারস্টার। তার বাড়িগাড়ি হলো।

এখন আমার সামনে প্রশ্ন : আমি কি পারব ?

পারতেই হবে, বহুমূত্র নিয়ে লিখতে পারতে হবে। এটা আমার জেদ।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটি বাংলাদেশের এক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা অফিসের। ওই অফিসে চাকরি করেন দেশের এক প্রখ্যাত কবি— সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তো, কবি সাহেবকে সম্পাদকীয় লিখতে হয়। কী নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে, এটা মালিক সম্পাদক বলে দেন। একদিন ১৬ ডিসেম্বরের প্রাক্কালে কবি সাহেব জানতে চাইলেন, আজ কী নিয়ে লিখবে।

সম্পাদক বললেন, দেখুন ভেতরের পৃষ্ঠায় একটা খবর আছে। গ্রামের লোকেরা এখনও কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। আপনি এক কাজ করুন, কাঁচা পায়খানা নিয়েই লিখুন।

১৬ ডিসেম্বরের আগের দিন বিজয় দিবস নিয়ে না লিখে লিখতে হবে কাঁচা পায়খানা নিয়ে! কবি সাহেব মর্মাহত হলেন।

কী ব্যাপার! লিখতে পারবেন না ? সম্পাদক জানতে চাইলেন।

পারব। তবে লিখতে নয়। ওই কর্মটি এইখানে এই অফিসের মেঝেতে করে দিতে পারব।

বহুমূত্র নিয়ে মেডিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আপনারা এর আগেই জেনে গেছেন। সেদিক থেকে বাঁচা গেছে। আমাকে আর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি দিতে হবে না। আমি বরং বলি অগুরুত্বপূর্ণ কথা।

আমার বাবার ছিল ডায়াবেটিস।

ছোটবেলায় আমরা, ছোট ছেলেমেয়েরা, এই ব্যাপারটি নিয়ে বেশি কিছু জানতাম না। কিন্তু সব বিষয়েই ছোটদের কিছু নিজস্ব ধারণা থাকে। যেমন এক বাচ্চার কাছে চাকরি করা মানে চাকা ঘোরানো। আব্বা চাকরি করে মানে অফিসে বসে তিনি চাকা ঘোরান। তেমনি আমাদের কাছে ডায়াবেটিস মানে ছিল প্রস্রাব দিয়ে চিনি যায়। যদি তুমি দেখো, তোমার মূত্রত্যাগের পরে বাথরুমে পিঁপড়া লাইন দিয়ে ঢুকছে, বুঝবে তোমার ডায়াবেটিস। ছেলেবেলায় মানুষ কী অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনাই না ভাবে!

কিন্তু বড়দের চিন্তা কি অদ্ভুত হয় না ? ঢাকার মঞ্চে একটা হিট নাটক হয়ে ছিল। সেটার কাহিনী এরকম : বাংলাদেশের চিনি সমস্যা সমাধানের জন্য জ্বাল দিয়ে চিনিটা উদ্ধার করা হবে।

এই গল্প নিশ্চয়, আপনাদের, ভদ্রলোকদের রুচিতে বাধছে। আমারও বেধেছিল। এখনো বাধছে। তবে এ উদ্ভট আইডিয়ার পাশাপাশি আরো কিছু উদ্ভট আইডিয়া দেওয়া যায়— যেমন যাদের ত্বক তেলতেলে, তাদের ত্বক নিংড়ে বাংলাদেশের তেল সমস্যার সমাধান করা যায়। আর দেশের সবগুলো জোনাকিকে বেঁধে ডেসা অফিসে ছেড়ে দিলে লোডশেডিং সমস্যারও সমাধান হতে পারে।

যাক। অনেক লঘু কথা হলো। এবার গুরু কথা। আমি অনেক লোককে দেখেছি, ডায়াবেটিস হওয়ার পর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। দেখলে চেনা যায় না। কিন্তু এমন লোকও আছে, অত্যন্ত সুদর্শন এবং কর্মঠ, বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশ— আসলে ডায়াবেটিসের রোগী। তার পরামর্শ হলো : নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিন, রোগ গোপন করবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন, ওষুধ খান, বিধিনিষেধ মেনে চলুন, প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটুন। দেখবেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এই ভদ্রলোকের নাম আপনাদের সবার জানা, আমি বলেও দিতে পারি, কিন্তু বলব না। কারণ টিভিতে তিনি বয়স বাড়িয়ে এখনো রোমান্টিক হিরো হচ্ছেন।

যাক, যা বলছিলাম। আমার আব্বার ছিল ডায়াবেটিস। আব্বা চা খেতেন স্যাকারিন দিয়ে। কোনো মিষ্টি-পায়েশ খেতেন না। আমাদের ভাইবোনদের তিনি প্রায়ই বাজারে নিয়ে যেতেন। বাজার করা শেষ করে তিনি আমাদের বসাতেন মিষ্টির দোকানে। সবচে বড় রসগোল্লা, রসমঞ্জুরি ইত্যাদি দিতে বলতেন।

আমরা ভাইবোনেরা, যারা যেদিন আব্বার সহযাত্রী, চামচ দিয়ে (চামচে ব্যর্থ হলে আঙুল লাগিয়ে) একটার পর একটা মিষ্টি খাচ্ছি। আব্বা তাকিয়ে আছেন। তিনি মিষ্টি খাচ্ছেন না। খাওয়ার উপায় নেই।

বাবা, আরো কিছু নিবা ? নাও।

না আব্বা, আর খাব না।

আরে না। খাও।

আব্বা আরো আরো মিষ্টির অর্ডার দিতেন। বলতেন : বাবা, ছোটবেলায় কী করতাম জানো! নদীর ধারে চলে যেতাম। গুড়-ভরা নৌকা বাঁধা থাকত ঘাটে। মাঝিরা আদর করে তলি-তলি গুড় দিত খেতে। গুড় খেয়ে পেট ভরে পানি খেয়ে বাসায় ফিরতাম।

আমরা মিষ্টি খাচ্ছি। আব্বা স্নেহার্দ্র চোখে তাকিয়ে আছেন সন্তানের দিকে।

আমরা টের পাচ্ছি, আমাদের জিভের স্বাদে তার মুখ প্রশান্তি ও আনন্দে ভরে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! পিতা-সন্তানের সম্পর্কের এই রসায়নটি। ছেলে খেলে বাবার খাওয়া হয়ে যায়। আব্বা তার মিষ্টি না-খাওয়ার বঞ্চনা থেকে এইভাবে মুক্তি পেতেন। আমাদের খাওয়াতেই তার মন ভরে যেত, পেট ভরে যেত, জিভ ভরে যেত!

আজ আব্বা নেই। এ পৃথিবীতে আমার সবচে প্রিয় মানুষ ছিলেন আব্বা।

ডায়াবেটিস নিয়ে লিখতে গিয়ে আব্বার কথা লিখতে পারব, এই সুযোগটি গ্রহণের জন্যেই আজ আমি এ বিষয়টা পাশ কাটিয়ে গেলাম না।

বি+বাহিত

রোগজীবাণু কত প্রকার ? দুই প্রকার। জল বাহিত ও বায়ুবাহিত। এছাড়াও আরেক ধরনের রোগ আছে, যা বিশেষভাবে বাহিত। বিবাহিত বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। বিবাহিত মানে বিশেষভাবে বাহিত।

তাহলে রোগ দাঁড়াচ্ছে তিন প্রকার : জলবাহিত, বায়ুবাহিত ও বিবাহিত।

২

মানুষ কেন বিয়ে করে ? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব বৈজ্ঞানিকরা শত চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি। বিয়ে নিয়ে এ অতিপ্রাচীন ও বহুবিশ্রুত কৌতুকটি আপনি আবার স্মরণ করুন।

চিড়িয়াখানা দেখতে গেছে ছোট্ট এক মেয়ে, সঙ্গে বাবা-মা।

বাবা, বাবা, ওটা কী ?

গাধা।

বাবা, গাধারা কি বিয়ে করে ?

হ্যাঁ মা, গাধারাই বিয়ে করে।

বাবার এ-কথার মাজেজা মেয়ে কী বুঝল, সে-ই জানে। কিন্তু তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, খুকি, তুমি বিয়ে করবে ?

না না। কখনো না।

কিন্তু এর উল্টোটাও আমি শুনেছি। মাইকে প্রচারিত হচ্ছে : আগামী শুক্রবার রোজ কেয়ামত— দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুনে এক খুকি আরেক খুকিকে বলছে : হায় হায় রিংকিং, শুনেছিস, শুক্রবার দুনিয়া শেষ। হায় হায় কী হবে, আমাদের যে এখনো বিয়ে হলো না।

রবীন্দ্রনাথের প্যারডি করে বলতে হয় : খুকি, এখন শ্বশুরবাড়ি যাইবার জন্য যতখানি কাঁদিতেছ, বয়স হইলে না-যাইবার জন্য ততখানি কাঁদিতে হইবে।

ছোটবেলায় অবশ্য বিয়ে-বিয়ে খেলেনি, এমন নারীপুরুষ কমই আছে।

তবে আজকালকার বাচ্চাদের কথা আমি জানি না। বাচ্চারা খেলছে। আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : এই, তোমরা কী করছ ? হয়তো বলে বসল : আমরা লিভ-টুগেদার লিভ-টুগেদার খেলছি।

লিভ টুগেদার। বাচ্চাদের মুখে লিভ টুগেদার! আমাদের সময়ের বাচ্চারা কিছুই বুঝত না। আমাদের কালের এক বাচ্চা পাশের বাসায় খালামনির বিয়ে ও কন্যা বিদায়ের কান্নাকাটির দৃশ্য দেখে বলেছিল : মা, ওরা কাঁদছে কেন ?

ওই বাসার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ও চলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, তাই।

মা, তোমারও কি বিয়ে হয়েছিল ?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে।

তোমার বাবার সঙ্গে।

ভাগ্যি। নিজেদের মধ্যেই বিয়েটা হয়েছিল।

পুরনো কৌতুক শুনে পাঠক নিশ্চয় মহাখাপ্পা হয়ে উঠছেন। ব্যাটা, নতুন কিছু থাকলে ছাড়।

না, ভাই। নতুন কিছু নেই। কারণ বিয়ে ব্যাপারটা খুবই পুরনো ব্যাপার, এমনকি এই উপদেশটাও পুরনো।

সক্রেটিসের কাছে গিয়েছে তার এক শিষ্য। মহোদয়, আমার বিয়ের কথা চলছে। আমি কি বিয়ে করব ? বিয়ে করলে কি সুখী হওয়া যায় ?

সক্রেটিস বললেন, নিশ্চিন্তে বিয়ে করো। তাতে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। হয় তুমি সুখী হবে। আর যদি না হও, তাহলে আমার মতো দার্শনিক হবে।

সক্রেটিস নাকি বিবাহিত জীবনে খুব অসুখী ছিলেন। তার বউ নাকি ছিল মহাখাণ্ডারানি। সে কারণে ইংরেজি অভিধানে সক্রেটিসের বউয়ের নামটা স্থায়ী হয়ে গেছে। বউয়ের নাম ছিল জেনথিপ্পি। এখন (*XANTHIPPE*) জেনথিপ্পি মানে ঝগড়াটে রমণী। যেমন মীরজাফর মানে বিশ্বাসঘাতক।

তবে বাংলাদেশে বিবাহিতের পক্ষেও দার্শনিক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এদেশে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয় এবং ম্যানহোলগুলো হা-করা অবস্থায় থাকে।

৩

আমাদের চাকরির বাজার খুবই আক্রা। সব নিয়োগবিজ্ঞপ্তিতেই প্রার্থীর পূর্ব-অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। শুধু বিয়ের বাজারে প্রার্থীর পূর্বাভিজ্ঞতার কোনো দাম নেই। কাজেই সব বরই বিয়ের আগে নানা ভুল পদক্ষেপ

ফেলে সহাস্যে বলে : ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন, এর আগে কোনোদিন বিয়ে করিনি তো !

এ ব্যাপারে যদি উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ পূর্ব-অভিজ্ঞতাই বেশি কাম্য হয়, আর আপনার যদি পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন।

বুকে সাহস সঞ্চয় করে বলবেন : পূর্বাভিজ্ঞতা চাইছেন। তারও অভাব হবে না। আসলে এটা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। খানদানি বংশ তো ! আমার দাদা বিয়ে করেছিলেন, আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন, আমার চোদ্দ গোষ্ঠী বিয়ে করেছিল, হ্যাঁ। বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর পূর্বাভিজ্ঞতা কাজে না-লাগলেও একজন দ্বিতীয় বিবাহকারী পুরুষের একটা মূল্যবান উপলব্ধি আমি আপনাদের জানাতে পারি। সেটা হলো— আপনি যদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন, তাহলে তৃতীয় বিবাহ করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৪

বিয়ে নিয়ে নয়, বিবাহিত সুখী দম্পতিদের নিয়ে একটা মার্কিন জরিপের ফলও আমি আপনাদের জানাতে পারি।

৯০% পুরুষ বলেছেন— সুযোগ পেলে তারা তাদের বউকে নয়, অন্য কাউকে বিয়ে করে জীবন শুরু করতেন। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ৭৫%। এজন্যেই বোধ হয় বলা হয়, দি মোস্ট বিউটিফুল ওম্যান ইজ আদার ম্যান'স ওয়াইফ।

৫

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া সংসার জীবনে সুখী হওয়ার কৌশল জানিয়ে দিচ্ছি।

স্বামীদের কর্তব্য (অসম্পূর্ণ)

১. সব সময় বউয়ের প্রশংসা করুন।
২. সুযোগ পেলেই সোনার গয়না কিনে দিন। সোনা খুবই শস্তা একটা জিনিস। মাত্র ছ'হাজার টাকা ভরি। গত ৬ বছরে সোনার দাম এক পয়সা বাড়েনি, এবং আধা ভরি সোনা তিন হাজার টাকায় কিনে একই দোকানে বেচতে গেলে বলবে— দুরো, এতে সোনা কই, সবই তো খাদ— নিন, এই বলে দেবে নে ধরিয়ে এক হাজার টাকা। তবু সোনার গয়নাই দিন।
৩. বউয়ের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এসব কিছু মনে রাখুন এবং আকস্মিক উপহার দিন।
৪. নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ কম রাখুন।
৫. বউয়ের বাবা-মা, ভাইবোনদের খোঁজখবর ভালোভাবে রাখুন, এবং নানা উপলক্ষে তাদের উপহার দিন।
৬. বউয়ের সব কথায় 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' করুন। (নিজের মত মতো চলতে হলেও বউয়ের কথায় না করবেন না।)
৭. মশারি নিজে টাঙাবেন। বাথরুমে বাতি নেভাতে ও ট্যাপ বন্ধ করতে ভুল করবেন না।
৮. গৃহপরিচারিকা বিষয় থেকে আপনার মোটা নাকটা দূরে রাখুন।
৯. সব সময় বেশি বেশি আয় করুন এবং বউয়ের হাতে বেশি বেশি করে টাকা তুলে দিন।

১০. বউকে নিয়ে বেড়াতে যান।
১১. বউয়ের সাজগোজ, শাড়ি ও রূপের অকুণ্ঠ প্রশংসা করুন।
১২. বউয়ের রান্নার উচ্চ প্রশংসা করতে থাকুন।
১৩. রাত্রিবেলা বাচ্চার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিন।
১৪. ভুলেও অন্য নারীর প্রশংসা করবেন না। কোনো দুর্বল মুহূর্তেও প্রাক্তন সম্পর্কের কথা বলে দেবেন না।
১৫. শপিঙে বাধা দেবেন না। বরং 'দারুন জিতেছ' বলে উৎসাহ দিন।
১৬. আরো অনেক কিছু।

স্ত্রীদের কর্তব্য (মাত্র দুটি)

১. ঠিকভাবে খাবার সরবরাহ করুন।
২. স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে সব সময় প্রস্তুত থাকুন ও অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করুন।

৬

এই গল্পটিও ইন্টারনেট থেকে পাওয়া।

গল্পের শিরোনাম : কেন আমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বরখাস্ত করেছি।

আজ আমার জন্মদিন, আজ মানে খানিক পরে। ১২টা ১ মিনিটে।

আমি কাউকে কিছু বলিনি। দেখি, বউয়ের কিংবা বাচ্চাদের মনে আছে কিনা।

১২টা বাজল। ১টা বাজল। না, বউ নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। বাচ্চাদের ঘরেও বাতি বন্ধ। কেউ আমাকে পোছে না। এ সংসারে আমার কোনোই দামই নেই।

পরদিন অফিসে গেলাম। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারিটি আজ সুন্দর করে সেজে এসেছে। আমাকে দেখেই হেসে বলল, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ স্যার।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ।

টেবিলে বসতেই পেলাম সুদৃশ্য কার্ড। চমৎকার চমৎকার পঙ্‌ক্তি-লেখা কার্ডে। আমার সেক্রেটারি দিয়েছে।

তারপর সে এলো। সেক্রেটারি। সুদৃশ্য একটা মোড়ক দিল : সে আমার হাতে তুলে। তারপর বলল : স্যার, আজ কি আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি ?

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' এ যে আমার মনের কথা।

দুপুরে ওর সঙ্গে বেরুলাম। বললাম, কোথায় যাচ্ছি ?

ও বলল : স্যার, যদি কিছু মনে না করেন যদি আমার ফ্ল্যাটে যেতেন।

আমার বুক কাঁপতে লাগল। দুপুরবেলা। নির্জন ফ্ল্যাটে।

গেলাম তার বাসায়। সে নিয়ে গেল সোজা বেডরুমে।

বেডরুমে! একেবারেই বেডরুমে ? একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না ?

ও বলল : স্যার আপনি একটু বসুন, আমি একটু ড্রেসটা পাল্টে আসি। অফিসের ড্রেসে ইজি হওয়া যায় না।

এরপর আর কথা চলে না! ইঙ্গিত স্পষ্ট।

এরপর যা ঘটল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দরজায় একসঙ্গে অনেকগুলো মুখ। সবার কণ্ঠে ধ্বনি : হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। চেয়ে দেখি, আমার বউ, বাচ্চারা,

পিএস। ও, এই তাহলে ষড়যন্ত্র! আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে বউ-বাচ্চা পিএস মিলে ফন্দি করেছে।

কিন্তু আমি আমার পিএসকে চাকরিচ্যুত করেছি। কারণ ওরা সবাই যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আমি ছিলাম নগ্ন।

৭

কী ভাবছেন ? বিয়ে করবেন কি করবেন না ? বিবাহিত জীবন ভালো না খারাপ ? না, আবদুস সামাদ আজাদ কিংবা পন্নীর সাক্ষ্য দরকার হবে না; আমি আপনাদের ভরসা দিচ্ছি, বিয়ে করুন।

বিয়ে যতদিন না করছেন, ততদিন আপনার মনে শান্তি থাকবে না— ইশ কী যেন নেই, কী যেন হারাচ্ছি। বিয়ে করলে আপনার মনে এই অপ্রাপ্তির আফসোসটা থাকবে না। বরং আপনি এই ভেবে শান্তি পাবেন যে, বিয়ের আগে আপনি কিছুই হারাননি।

৮

হে বর ও কনেগণ, আপনাদের নবজীবন সুখের হোক।

আমাদের ছেলেবেলায় শোনা গল্পগুলি যদি আমরা পুনর্লিখন করি

টোনা ও টুনি

এক ছিল টোনা। আরেক ছিল টুনি। টোনা বলল, টুনি পিঠা তৈরি করো।

টুনি বলল, পিঠা খায় খ্যাতেরা। আমি তোমাকে পিজা বানিয়ে খাওয়াব। যাও, বাজার থেকে ময়দা, মাংস, ক্যাপসিক্যাম ইত্যাদি এনে দাও।

টোনা বাজারে গেল। ময়দা কিনল। মাংস কিনল। টুনি বেগুনগাছে চুলা বসিয়ে পিজা বানাতে বসে গেলো।

পিজা গরম হচ্ছে। বেশ গন্ধ বেরুচ্ছে। তখন এল শেয়াল, বাঘ, ভালুক, কুকুর। একে একে। বলতে লাগল : ওই মিয়ারা, মাইনষে ভাত পায় না, আর তোমরা পিজা খাও। চান্দা দিতে হইব। চান্দা না দিয়া খাইতে পারবা না।

কুকুর, ভালুক চাইল শুধু পিজার ভাগ। আর শেয়াল, বাঘ বলল : পিজা তো দিবাই, সঙ্গে মালপানি ভি ছাড়ন লাগব। কাইলকা আসুম। ট্যাকা জোগাড় কইরা থুইবা।

আমরা টোনাটুনি, টাকা পাবো কোথায় ?

পিজার ময়দা-মাংস কেনার টাকা পাইছ কই ?

টোনাটুনির ঘুম হারাম। এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তারা বাঁচবে কী করে ? সন্ত্রাসীরা বলে রেখেছে, পুলিশে খবর দিবা না। খবরদার।

তবু টোনাটুনি গেল পুলিশের কাছে। থানা বলল, আমরা মামলা নেব না। মামলা নিলেই আমাদের রেকর্ড খারাপ হবে। অপরাধের সংখ্যা বেশি দেখা যাবে।

মামলা নেবেন না কেন ?

কারণ এটা মানুষের থানা। পশুপাখির না।

কেন ? আপনারা না ডগ-স্কোয়াড বানিয়েছেন ? কুকুর আছে না আপনাদের ?

তাতে কী ? ওই কুকুররা এখন ব্যস্ত বোমা-হামলার তদন্তে। টোনাটুনির ব্যাপারে তাদের পাওয়া যাবে না।

টোনাটুনি এখন ঘরছাড়া। সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা ঠিক করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিলছে না।

কচ্ছপ ও খরগোশ

কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতা। কদমতলা থেকে দৌড় শুরু হবে। কাশবনের পাশ দিয়ে শালবনের নিচ দিয়ে তারা বাজে-পোড়া বটগাছ পর্যন্ত যাবে। যে জিতবে, তার জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

দৌড় শুরু হলো।

খরগোশও দৌড়ায়। কচ্ছপও দৌড়ায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই খরগোশ চলে গেল কচ্ছপের দৃষ্টির আড়ালে।

মধ্যপথে গিয়ে খরগোশ দেখে, পথ আগলে দাঁড়িয়েছে শেয়াল। শেয়ালকে পশুসমাজে পরিচিত চাঁদাবাজ বলে। বলল, এ পথ দিয়ে যেতে হলে চাঁদা দিতে হবে।

ভাগ্যিস, সঙ্গে কিছু টাকা ছিল খরগোশের। চাঁদার টাকা সে তুলে দিল শেয়ালের হাতে। তারপর আবার দৌড়। এবার তাকে ধরল নেকড়ে। খবরদার। এই পথ দিয়ে যেতে হলে আগে নগদ টাকা ছাড়ো।

খরগোশ পড়ল ভীষণ মুশকিলে। তখন তার মনে পড়ল, যমুনায় বঙ্গবন্ধু সেতু হয়েছে। তবু এই পথ দিয়ে উত্তরবঙ্গের গাড়িগুলো যেতে পারছিল না। কারণ পথে পথে চাঁদাবাজ। শেষে ক্ষিপ্ত গাড়িঅলারা আবার ফিরে গেছে আরিচাঘাটে।

খরগোশ শেয়ালকে চাঁদা না দিয়ে ফিরে গেল আগের পথে। তারপর অনেক ঘুরে যখন সে পৌঁছল গন্তব্যে, বটগাছটার নিচে, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ছোট্ট কচ্ছপ চাঁদাবাজদের চোখের আড়াল দিয়ে আগেই এসে পৌঁছেছে সেখানে।

আঙুর ফল টক

এক ছিল শেয়াল। সে যাচ্ছিল দ্রাক্ষাবন দিয়ে। মানে হলো, আঙুর বাগানের ভেতর দিয়ে। মাথার উপরে গাছের ডালে জাংলায় আঙুর ধরে আছে। কী সুন্দর, থোকা থোকা রসে ভরা আঙুর। ইশ! শেয়ালের জিভে জল এসে যায়। সে যদি আঙুরটা খেতে পারতো।

শেয়াল উপরে তাকায়। তারপর সামনের পা দুটি তুলে লাফাতে থাকে। না, কিছুতেই লাগাল পাওয়া যায় না। সে বলে, আঙুর ফল টক। এটা মাইনষে খায় কেমনে ? শেয়ালের মতো উন্নত প্রাণীর কিছুতেই এটা খাওয়া উচিত নয়।

তখন একটা কাক এসে বসে ওই জাংলায়। বলে : ওই মিয়া, কি কও, আঙুর ফল খুবই মজার! তোমার ব্যাপারটা কী ? তুমি কে ? তুমি কি বাংলাদেশের বামপন্থী দল,

যারা জীবনেও নির্বাচন করে ভোট পেয়ে ক্ষমতায় যেতে পারবে না এবং বিপ্লব করারও যাদের মুরোদ নেই ? তুমি কি সেই জনপ্রিয় শিল্পী-লেখক যে কোনোদিনও শিল্পসম্মত, জীবনঘনিষ্ঠ রচনা লিখতে পারবে না ? নাকি তুমি সেই অক্ষম শিল্পী-লেখক, যার লেখা বা শিল্পকর্ম বাজে বলেই লোকে গ্রহণ করে না, আর সে ভাবে— না না, জনপ্রিয়তা একটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার ?

শেয়াল বলে, আমি কে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী ? তুমি কি আমাকে দুএকটা আঙুর খাওয়াবে ?

খাওয়াব, যদি বলো, আঙুর খুব মিষ্টি।

আচ্ছা, বলছি, আঙুর খুব মিষ্টি।

কাক তখন দুটি আঙুর ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে নিচে ফেলে দেয়। শেয়াল খায়! ভারি মজা পায়!

কাক বলে, কাল এসো, ফের খাওয়াব। শুধু আমার নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবে। আর বলবে, আঙুর ফল মিষ্টি।

দিনে আসতে পারব না। রাতে আসব। দিনে আমার জনসভা আছে।

দিনের জনসভায় গিয়ে শেয়াল বলল : ভাইসব, ওই বাগানে কতগুলো আজাইরা গাছ লাগায়া রাখছে। আঙুর না কী নাম। টক। ওয়াক থুঃ।

রাতের বেলা শেয়াল আঙুরবাগানে গিয়ে বসে রইল। চোখ আকাশে। লোভে জিভ চকচক করছে।

চলতিপত্র ২৯ মার্চ ১৯৯৯

পান্তাবুড়ির গল্প

কল্পগল্পের গত পর্বে আমরা প্রচলিত কিছু শিশুতোষ গল্পের রিমেক করেছিলাম।

এবার পান্তাবুড়ির গল্প।

এক ছিল বুড়ি।

রাতের বেলা সে ভাতের হাঁড়িতে পানি দিয়ে রাখত, সকালবেলা খেত পান্তা।

কিন্তু এল দুঃসময়। এক চোর রোজ রাতে তার হাঁড়ি থেকে পান্তা বের করে খেয়ে যায়।

কী করা! পান্তাবুড়ি চলল রাজার বাড়ি, বিচার দিতে। পথে দেখা গোবরের সঙ্গে। গোবর বলল, বুড়িমা, আমাকে নিয়ে চলো সঙ্গে, তোমার কাজে লাগবে। বুড়িমা বলল, এখন যাচ্ছি রাজার বাড়ি, বিচার চাইতে, ফেরার পথে দেখা যাবে।

এমনিভাবে তার দেখা বেল, শিংমাছ আর ক্ষুরের সঙ্গে। সবার সঙ্গেই বুড়ির হলো একই রকম কথা।

রাজদরবারে বহু অপেক্ষার পর দেখা মিলল রাজার। রাজা বললেন, না, এ হতেই পারে না। দেশে এখন শান্তির লহর বইছে। এদেশে একটাও চোর নেই।

বুড়িকে ঘাড়ে ধরে বের করে দিল রাজার সেপাইরা। কাঁদতে কাঁদতে ফিরল বুড়ি। পথে দেখা শিংমাছ, বেল, গোবর আর ক্ষুরের সঙ্গে। সবাইকে নিজের ঝোলায় পুরে নিয়ে এল বুড়িমা।

সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িতে ভাত আর পানি রেখে ছেড়ে দিল শিংমাছ। চুলায় রাখল বেল। ঘরের দুয়ারে ছড়িয়ে রাখল গোবর। আর খড়ের পালায় রেখে দিল ক্ষুর।

তারপর নিশ্চিত ঘুম।

এদিকে হলো কী, চোর এল। সিঁদ কেটে ঢুকল বুড়ির রান্নাঘরে।

তারপর যেই-না সে হাত দিয়েছে হাঁড়িতে, অমনি কাঁটা বিঁধিয়ে দিল শিংমাছ। শিংমাছের বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে সে দৌড় ধরল চুলার দিকে। ছাই দিতে হবে হাতে। আর অমনি বেল ফেটে গেল ফটাশ। চোখেমুখে চুলার আগুনের ছাই লেগে তো চোরের যা-তা অবস্থা। দৌড়ে চোর গেল দরজার দিকে, অমনি গোবরে পা হড়কে হয়ে গেল পপাতধরণীতল। হাতেপায়ে গোবর লেগেছে, খড়ের পালায় চোর গেল মুছতে। অমনি ক্ষুর লেগে তার হাত গেল কেটে।

এরপর আর কোনোদিন চোর বুড়ির বাড়িমুখী হয়নি।

এখন আমাদের সময়েও সমাজে পান্তাবুড়ি গল্পের প্রাসঙ্গিকতা বিচার :

১. সামনে পহেলা বৈশাখ। পান্তা খাওয়ার দিন। এখন পান্তাবুড়ির গল্পটিই আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

২. চুরি-ডাকাতি খুবই বেড়ে গেছে। ঢাকাবাসীই চুরি আর ডাকাতির ভয়ে তটস্থ। এই তো আজই দেখলাম, কাওরানবাজারের সামনে ভিআইপি রোডে এক বাসে বসা মহিলার কান-সমেত দুল ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় ধরল ছিনতাইকারী।

৩. তারপর পান্তাবুড়ি চলল রাজার কাছে বিচারে। ওই জায়গাটায় গল্পটা বদলাতে হবে। গেল থানায়। থানা বলল, মামলা নেয়া যাবে না। কারণ, মামলা নিলে এটা এলাকার রেকর্ড খারাপ করবে। অপরাধের সংখ্যা বেশি দেখাবে। আমাদের চাকরিতে অসুবিধা হবে।

তখন বিচারের দাবিতে বুড়ি যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে।

প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আর তাছাড়া তারা বলবেন, বুড়ি নিশ্চয় স্যাবোটাজ করছে। নির্ঘাত এরা সব বিএনপি। নইলে সরকারের দুর্নাম করছে কেন! দেশ এখন খুবই শান্ত। দেশে কোনো অপরাধ নেই বলেই হয়তো তারা বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো নদীর নামকরণ করতে লেগে পড়বেন। নয়তো কোনো ফুফাতো ভাইবোনকে দেবেন স্পেনে রাষ্ট্রদূতের চাকরি।

৪. তখন বুড়ি বুঝবে, বিচার রাষ্ট্রের কাছে পাওয়া যাবে না। নিজের নিরাপত্তার ভার নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে। সে তখন বেল, শিংমাছ, গোবর, ক্ষুর ইত্যাদি সংগ্রহ করবে। এটা হতে পারে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা সিকিউরেক্সের কর্মী নিয়োগ। অথবা পাড়ার সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে রাতে পাহারার ব্যবস্থা।

৫. তারপর চোরের গৃহে প্রবেশ। চোরের দশদিন, সাধুর একদিন। সিকিউরেক্সের কর্মীর হাতে ধরা পড়ল ওই চোর। কিংবা চুলায় বেল ফেটে চোখ গেল চোরের কানা হয়ে। কিংবা শিংমাছের কাঁটায় চোর করতে লাগল আহা-উহুঁ।

তখন দেখা গেল এই চোর কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী।

সে যদি বিরোধীদলের কর্মী হয়, তাহলে বিরোধীদল তার মুক্তির দাবিতে ডেকে বসল হরতাল।

আর সে যদি সরকারি দলের হয়, তাহলে পত্রপত্রিকায় যতই তাকে 'চোর' 'চোর' বলে লেখালেখি হোক না কেন, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

আর বুড়ির বিরুদ্ধে মামলা হবে সন্ত্রাস দমন আইনে। কেন সে শিংমাছ বা বেলের মতো মারাত্মক অস্ত্র নিজগৃহে রেখেছিল! এটা কি মগের মুলুক নাকি!

৬. তারপর ডিবির লোকেরা ঢুকল পাড়ায়। বুড়ির সঙ্গে যাদের সংশ্রব ছিল তাদের সবাইকে বলল, মালপানি ছাড়ো, নইলে চলো ডিবি অফিসে।

পান্তার মধ্যে শিংমাছ—

আর ডিবির ট্যাঙ্কে জালাল-আব্বাস।

চলতিপত্র ১২ এপ্রিল ১৯৯৯

গাছের জন্যে শোকগাথা

ওয়ারিতে থাকতাম কিছুদিন আগেও। অফিসে আসতে যেতে রোজ পথে পড়ত ওসমানি উদ্যান, ওসমানি মিলনায়তন। ওখানেই রেলওয়ে ভবন। ওই ভবনেই যেতে হয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলবিভাগের একজন সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিতে। সরকারি অফিস, সকাল ৯ টায়। গুলিস্তান মোড়ে রিকশা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে চলেছি রেলওয়ে ভবনের দিকে। হেমন্তের সকাল। একটু একটু কুয়াশা। আর হলুদ উজ্জ্বল আলো। বাঁদিকে তাকিয়ে উদ্যানের গাছের হলদে লাল সবুজ পাতায় শিশির আর কমলা রঙের রোদ। এত আলো, এত রঙ, রঙের বর্ণালি, পাতার প্রাণময় স্পন্দন— এত সুন্দর দৃশ্য এ জীবনে আমি আর কখনো দেখেছি কি! রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন— আলোর নাচন পাতায় পাতায়— শুধু আলো নয়, রঙও, পাতায় পাতায় নেচে চলেছে। আর একটু শিশির, তার স্নেহ আর হিরেকুরি সৌন্দর্য।

আমি ওই দৃশ্যের কথা জীবনে ভুলব না। আমাদের ধূলিমলিন পৃথিবীর ক্লান্তিময় জীবনে ওই এক স্বর্গদেখার আনন্দ আমার।

ওই গাছগুলো তবে উঠে যাবে?

অমিয় চক্রবর্তী যেমন বহুকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, এই গ্রাম তাহলে উঠে যাবে?

ওই গাছগুলো কেটে ফেলা হবে। এককেটি স্নেহময় শুশ্রূষাময় ছায়াছায়ী বৃক্ষ। কুড়ালের ইস্পাত-ফলা, করাতের নিষ্ঠুর শক্ত ধারালো দাঁত কেটে ফেলবে গাছের গোড়া, রক্তের মতো হলুদ কাঠের গুঁড়ো বেরুবে, ছড়িয়ে থাকবে এদিক ওদিক।

একে একে কেটে ফেলা হবে ঢাকার শেষ গাছটি ও বুজে ফেলা হবে ঢাকার শেষ জলাভূমিটিও!

কী খ্যাতিই না ছিল ঢাকার, ঢাকার রমনার, গাছের জন্যে, বৃক্ষের জন্যে। রমনায় একসময় সেগুনবন ছিল। প্লট বরাদ্দ দিয়ে সেসব কেটে ফেলেছে কর্তৃপক্ষ। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি ঘেঁটে পাই— ঢাকা ছিল এক পরিকল্পিত নগর, তার পথের দুধারে বড় বড় গাছ— রেনট্রি; এখনো কিছু গাছ অবশিষ্ট আছে মেডিকাল কলেজের ওদিকটায়। আর কত সব গাছ ছিল বড় বড় বৃক্ষ কিংবা কদম, কৃষ্ণচূড়ার মতো নাতিদীর্ঘ গাছ— তার আগুন লাগানো রূপ-রঙ।

বৃক্ষের ঘাতক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নামটাও রয়ে গেছে ইতিহাসে।

শ্বাস নেয়া যায় না ঢাকায়। বাতাসে বিষ। ভিআইপি সড়কের পাশে যতক্ষণ হাঁটি, কিংবা যদি চলি স্কুটারে, মনে হয় শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবো এক্ষুনি। ইটে ইটে কলকারখানায় যানবাহনের ধোঁয়ায় ঢাকা গরম হয়ে থাকে। তাই বৃষ্টি যদি হয় রমনায়, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়— প্রচণ্ড গরমে আবার বাষ্প হয়ে ফিরে যায় আকাশে। শীতের দিনে মনে হয় গরমে চামড়া পুড়ে যাবে। শুধু যদি যান রমনায়, কিংবা চন্দ্রিমা উদ্যানে— হ্যাঁ, মনে হয়, এটা শীতকাল।

কে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে এ ঢাকা শহরে। গাছ। আর জলাভূমি। ঢাকা শহরে আরো আরো গাছ চাই। আরো বাগান চাই। চাই আরো জলাভূমি।

অথচ ওসমানি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মিলনায়তন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। সকালবেলা ডেইলি স্টার (৭.৫.১৯৯৯) খুলে বসে আছি। ওসমানি উদ্যানের সেই গাছগুলোর ছবি। এইসব গাছ কেটে ফেলা হবে! হায়! এ সিদ্ধান্ত দিতে একটুও হাত কাঁপল না সাক্ষরদাতার!

আবার এতগুলো গাছ কেটে যে মিলনায়তন হবে, তার নাম হবে বঙ্গবন্ধুর নামে। বঙ্গবন্ধু তো আমাদের জাতির জনক। একটা বৃক্ষবিনাশী প্রকল্পের সঙ্গে জাতির জনকের নামটা কেন জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ?

রফিক আজাদ এটা লিখেছিলেন :

পাখি তার খুব প্রিয় ছিলো
মাঠভরা শস্য তিনি ভালোবাসতেন

পাখিপ্রেমিক সবুজপ্রেমিক হিসেবে কবিরা যে-বঙ্গবন্ধুকে আমাদের চিনিয়েছেন, সবুজহন্তা একটি দালানের সঙ্গে কেন তার নাম যুক্ত করা হবে ?

হুমায়ূন আহমেদের একটা প্রচারমূলক নাটিকা বিটিভিতে দেখানো হয়েছে অনেকবার। তাতে আসাদুজ্জামান নূরকে দেখা যায় বৃক্ষকর্তনের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে।

আমাদের এদেশে কি একজনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নেই, যে সরকারের এই জুলুমমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের নেত্রীর মতো।

আছে। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল ইয়ারস এসোসিয়েশন (বেলা) আইনগতভাবে লড়াই করছে। পরিবেশবাদীরা এখানে সেখানে প্রতিবাদে জড়ো হচ্ছেন। ছাত্র ইউনিয়ন মিছিল করেছে।

প্রতিবাদ শুরুতে ছোট থাকে। যদি ন্যায্য প্রতিবাদ হয়, তা ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করে। ওসমানি উদ্যানের গাছকাটার বিরুদ্ধেও মানুষ সোচ্চার হবে। মানুষ ঘিরে ধরে থাকবে প্রতিটা গাছ। ভারতে স্কুলছাত্ররা এমনটা করেছে। বাংলাদেশেরও একটা ছাত্রীহলের মেয়েরা তাদের হোস্টেলের গাছগুলোকে একবার ঘিরে ধরে বাঁচিয়েছে কুড়ালের কোপ থেকে।

ওসমানি উদ্যানের গাছগুলোও রক্ষা পাবে। ওরা যে আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের অম্লজান দেয়, আমাদের শ্বাসের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। আমাদের জন্য বৃষ্টি আনে, তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখে।

আর যদি আমরা ওই গাছগুলোকে বাঁচাতে না পারি, যদি ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ মানুষগুলো তাদের দাম্ভিকতা, জেদ, একগুঁয়েমির কুঠার আর করাত নিয়ে হামলে পড়ে ওই সবুজটুকুনের ওপর, যদি কাটা পড়ে একেকটা গাছ ! ভেঙে পড়ে পাখির বাসা! সীসার বিষে বুদ্ধি খুইয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া শিশুদের অভিশাপ তাদের প্রতি! 'বউ কথা কও' বলে মাথার ওপর দিয়ে যে পাখিটি শিস দিয়ে উড়ে যাচ্ছে— পৃথিবীর সব নববধূর আর ওই পাখিটির অভিশাপ সেই ক্ষমতান্ধদের প্রতি।

কংক্রিটের জঙ্গল নয়, ঢাকা হোক বৃক্ষে-পুষ্পে-গুল্মে ছাওয়া এক সবুজ শহর। আমাদের বাতাসে সীসা আর কার্বনমনোঅক্সাইড নয়, আমরা চাই বিশুদ্ধ অম্লজান! আমাদের কান যেন শুধু যন্ত্রের শব্দে বধির না হয়, পাখি আর কোকিলের ডাক যেন আমরা শুনতে পাই। আমাদের শহরটাকে তেমনি সুন্দর করে গড়বেন, কোথায় তেমন স্বপ্নবান নেতা!

চলতিপত্র ১০ মে ১৯৯৯

আপনার শিশুকে টিকা ও ব্যাট দিন

হানিফ সংকেত যখন মঞ্চে দর্শকদের সামনে দাঁড়ান, একটা কৌতুক প্রায়ই বলেন এবং হাততালি পান।

বিড়ালে-বিড়ালে যুদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের বিড়াল বনাম আমেরিকার বিড়াল। দেখা গেল, আমেরিকার বিড়াল হেরে গেছে।

এরপর পৃথিবীর যত মারকুটে বিড়াল অছে, সবার সঙ্গেই একে একে লড়াই করল বাংলার বিড়াল। আফ্রিকার ভয়ঙ্কর বনবিড়াল, অস্ট্রেলিয়ার ইয়া বড় গেছো বিড়াল, এমনকি ইসরায়েলের দুর্ধর্ষ বিড়াল পর্যন্ত হেরে গেল বাংলার বিড়ালের সঙ্গে। ব্যাপার কী? কেউ কেন পারছে না তার সঙ্গে!

শেষে বাঙালি বিড়ালের মালিক গোমর ফাঁক করলেন। জানালেন, আমারটা তো বিড়াল না, এটা আসলে বাঘ। না-খেয়ে না খেয়ে বেচারা বিড়ালের মতো দেখতে হয়েছে।

স্কটল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদশের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ম্যাচ নিয়ে এ গল্পটা মনে পড়ল। স্কটল্যান্ড ক্রিকেটের বিড়াল বই তো নয়। তাদের তো ওয়ান-ডে স্ট্যাটাস নেই। তারা পাকিস্তান-ভারত-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের মতো খেলেওনি। আমরা তো চাইছি স্ট্যাটাস। অর্থাৎ ক্রিকেটের বাঘদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই। সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে যে আমরা হারালাম, তাতে আমাদের অবস্থাটা হয়ে গেছে না-খেতে-পাওয়া বাঘের মতো। সবাই ভেবেছে, এ হলো বিড়াল। স্কটল্যান্ডের বিড়ালের সঙ্গে লড়ছে।

২

স্কটল্যান্ডের সঙ্গে বিজয়টা তাই সে অর্থে খুব বড় বিজয় নয়। কিন্তু এটাকেই আজ আমাদের উদযাপন করতে হবে। কারণ পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ হতে যাচ্ছিল। বাংলার বাঘ হেরে যেতে বসেছিল স্কটল্যান্ডের বিড়ালের কাছেই। অল্পের জন্য এ যাত্রা বাঁচা গেছে।

চিন্তা করুন, স্কটল্যান্ডের কাছে হেরে দেশে ফিরে এলে কী অবস্থা হতো ক্রিকেটারদের! বাংলাদেশের সবগুলো কেকের দোকান অন্তত সাতদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। কারণ পচা ডিমের অভাব। কেক বানাতে আর ব্যর্থদের সংবর্ধনা দিতে আবার পচা ডিম অপরিহার্য কিনা!

৩

বাংলাদেশের মানুষের মতো এমন উন্মাদনাপ্রিয় জাতি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। স্কটল্যান্ডে যেদিন স্কটল্যান্ড-বাংলাদেশ খেলা, সেদিন সকালে বিবিসি দেখাচ্ছে জনৈক স্কটিশের সাক্ষাৎকার—

আজকে এখানে একটা খেলা আছে, জানেন ?

না তো।

আচ্ছা, ধারণা করুন তো, এ শহরে কী খেলা হতে পারে ?

ফুটবল।

আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে! অজপাড়া গাঁয়ের কোনোদিন ক্রিকেট ব্যাট স্বচক্ষে না-দেখা বৃদ্ধটিও হয় তো হিসাব করছেন, আজ প্যাকিস্তান না-জিতেই যায় না, ইনশাল্লা....

বিশ্বকাপ ক্রিকেট মৌসুমে তাই মানুষের মুখের ভাষা ও শরীরের ভাষা বদলে গেছে।

আগে আমি আড়মোড়া ভাঙার জন্য হাতদুটো উপরে তুলতাম, পাশে ছড়াতাম, স্কুলে শেখা পিডিপ্যারেড অনুসারে সামনে পেছনে দুটো তালি দিতাম। এখন ? দুহাতে কল্পিত ব্যাটটা ধরে একবার ডানহাতি ব্যাটসম্যান, একবার বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, দুদিকে দুটি কভার ড্রাইভ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সামনের ফ্লাটের জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ গেল। একটা বাচ্চাছেলে ভেতরে আপন মনেই খালিহাতে আমার মতো ব্যাট করছে। ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোতে যেমন বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে, গৃহিণী বাজার করতে গিয়ে টমেটো বাছছেন, না তো ক্রিকেট বল ধরেছেন।

আমাদের দৈনন্দিন ভাষাতেও এসে গেছে ক্রিকেট পরিভাষা! সকালের নাশতার ইনিংসটা ভালো হয়নি, দেখা যাক দুপুরের ভাতের ইনিংসটা কেমন যায়! অরুণ কবিযশপ্রার্থী, তার কবিতাটা সম্পাদকের সামনে মেলে ধরে বলছেন, হাউজ দ্যাট! সম্পাদক এমনভাবে মুখ বাঁকা করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, উনি একজন কঠোর আম্পায়ার না, কবিতা-বলে লক্ষ্যভেদ হয়নি। আরেকটু চাপাচাপি করলে উল্টো 'নো বল' ডিক্লেয়ার করা হতে পারে।

যাই, একটু ফিল্ডিং দিয়ে আসি, এটা তো অনেক পুরোনো এক্সপ্রেশন! বা তোকে ও আজ কেমন বোল্ড করল! এ-কথা আমরা অনেক শুনেছি। অবস্থা খারাপ, আমাকে এবার ব্যাকফুটে খেলতে হচ্ছে— এ কথা কোনো মুশকিলে-পড়া ব্যক্তি যদি বলেন, আমরা সহজেই অর্থটা বুঝতে পারি।

তবে যেসব কথা আমরা এখনো শুনিনি, সেসবও অচিরেই শোনা যাবে। তোমার সংসারে রানিং বিটুইন দ্য উইকেট করতে করতেই তো জীবন গেল, বিনিময়ে কী পেলাম!

কিংবা, পিংকি টিংকুকে বেশ ঝুলিয়ে বল দিচ্ছে! অথবা অত স্পিন করো না তো, যা বলার ফাস্ট বলের মতো বলে ফেল!

৪

এই মৌসুমে মিস করেছি। তবে আগামী বিশ্বকাপ মৌসুমে মিস করবো না। একটা কোচিং সেন্টার দেব। সেটা হলো ক্রিকেট কুইজ কোচিং সেন্টার। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লাখ লাখ টাকার কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশ্নের একটা অংশে থাকে ক্রিকেট-জ্ঞান, অন্য অংশে থাকে ভবিষ্যদ্বাণী।

আমার কোচিং সেন্টারে ক্লাস করলে পাওয়া যাবে সবগুলো ক্রিকেট-জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর। এ ছাড়া কীভাবে পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে রেজাল্টের ভবিষ্যদ্বাণীও সঠিকভাবে করা যাবে তাও শেখানো হবে কোচিং সেন্টারে।

ট্রেড সিক্রেট ফাঁস করে দিলাম। দেখেন ভাই, কেউ আবার মেরে দেবেন না।

৫

চিন্তা করুন সেই প্রবাসী বাঙালিটির কথা, যে স্কটল্যান্ড গেছে ক্রিকেট দেখতে। বসেছে গ্যালারিতে। তার পাশে বসে আছে একজন স্কটিশ। স্কটিশটির কাছে বাংলাদেশ মানে একটা হতদরিদ্র দেশ। খেলা শেষ, বাংলাদেশের জয় আর স্কটল্যান্ডের পরাজয়। ওই বাঙালিটির মাথা কতটা উঁচু হয়েছে সেদিন।

হায়! এমন মুহূর্ত কেন আমরা বারবার ফিরে পাই না।

৬

১৪ কোটি মানুষের দেশ। ভালোভাবে খোঁজা হলে কেন এখানে থেকে ১৪ জন ভালো ক্রিকেটার পাওয়া যাবে না ? চাই খোঁজার মতো খোঁজা। চাই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। এই বিশ্বকাপে পারিনি, অন্তত ৮ বছর পরের বিশ্বকাপে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। এজন্য দরকার এখন যাদের বয়স ১০ থেকে ১৬, তাদের মধ্যে খেলোয়াড় খোঁজা।

চাই স্কুলে স্কুলে ক্রিকেট। থানায় থানায় ক্রিকেট। জেলায় জেলায় ক্রিকেট। প্রতি বছর ৬৪ জেলা শহরে ক্যাম্প বানিয়ে খুঁজে ফেরা হোক ক্রিকেট প্রতিভা। তারপর খুবই সম্ভাবনাময়দের জন্য নেয়া হোক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

হ্যায়! নির্মাণ স্কুল ক্রিকেটটাও বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই অপি উঠে এসেছেন নির্মাণ স্কুল থেকে। আর স্কুল পর্যায়ে খেলায় শচীন-কাম্বলি জুটির বিশ্বরেকর্ডের কথা তো এখন ক্রিকেট ইতিহাসের অংশ। এসব কথা বলতে গিয়ে গর্ডন গ্রিনিজ অপ্রিয় হয়েছেন বিসিবি কর্মকর্তাদের। তাদের যে চাই নগদ ফল।

৭

জিয়াউর রহমান তাই বলতেন কলাগাছ লাগানোর কথা। কারণ কলাগাছ বছরখানেকের মধ্যেই ফল দেবে।

কিন্তু ৮ বছর, ১২ বছর পর ফল দেবে, আর তা বহু বছর ধরে ফল দেবে, এমন গাছও যে আমরা চাই। সেই গাছ যে লাগাতে হবে এখনই!

বাংলাদেশের বহু মা এখন প্রস্তুত আছেন, যারা এ স্লোগান চান— আপনার শিশুকে ৬টি টিকা ও একটি ক্রিকেট ব্যাট দিন।

আমরা বসে আছি সেই দিনটির জন্য, যেদিন বাংলাদেশ পিটিয়ে সোজা করবে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। আমাদের মেয়েরা আফ্রিদিকে বিয়ে করার জন্য দুপায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। বিশ্বকাপের আসরে বাংলার যে লাল-সবুজ পতাকা আজ পতপত করে উড়ছে, ওর মধ্যখানে লাল রঙে যে মিশে আছে লাখ শহীদের রক্ত। এ-কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

চলতিপত্র ৩১ মে ১৯৯৯

ভেড়ার পাল এবং প্রধানমন্ত্রী

একপাল ভেড়া নিয়ে হাশেম আলী, ভর দুপুরবেলা, হোটেল সোনারগাঁর পাশে ফুটপাতের মধ্যে আটকা পড়ে গেল। এই ভেড়ার বাচ্চা, খাড়ায়া পড়, এক পাও নড়বি না— জনৈক পুলিশ-সদস্যের এই সংলাপ হজম করতে হাশেম আলীর কষ্টই হচ্ছিল; সে ভেড়া ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মানুষের বাচ্চা হিসেবেই এ শহরে তার আগমন ও সঞ্চালন, তাকে ভেড়ার বাচ্চা বলাটা রীতিমতো বাড়াবাড়ি। হাশেম আলী ভেবেছিল সে রেগে যাবে, এটা রীতিমতো অপমান! কিন্তু পাশে একজন মহিলা, তার হাতে একটা কলস— রোদে জ্বলছে রুপার মতো, আসলে অ্যালুমিনিয়াম— তার উদ্দেশে পুলিশ-লোকটা যখন খেঁকিয়ে উঠল : ওই খানকির মাইয়া, আবার ফির কলসি মারাইতে লাগছ— তখন হাশেম আলী রীতিমতো হতভম্ব।

ভূতে ঠেলা মারতে পারে— এমন ধরনের দুপুর মাথার উপর। সূর্য নিজেই গরম মোমের মতো গলছে আর মানুষের চোখে কানে পিঠে পড়ছে। এই গরমের মধ্যে পুলিশ ভাইজান মোটা কাপড়চোপড় পরে আছে আর মাথায় কী মোটা কাপড়ের টুপি— মনে হয় লোকটার মাথা গরম হয়ে গেছে।

গোনাগুনতি ২৬টা ভেড়ার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে হাশেম আলী পুলিশ-সদস্যের দিকে নিতান্তই করুণাভরে তাকাল। ভাগ্যিস লোকটার হাতে বন্দুক নেই, আছে একখানা লাঠি মাত্র; বন্দুক থাকলে মাথার গরমে সে কিন্তু উল্টাপাল্টা করে ফেলতে পারে। লাঠি দিয়ে তার পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।

পুলিশটি একটা লাঠি দিয়ে কী কী করতে পারে ? হাশেম আলী তালিকা প্রস্তুত করে মনে মনে :

১. রেগেমেগে লাঠিটা কামড়াতে শুরু করতে পারে।

২. লাঠিটা সে নির্বিচারে আশপাশের সব মানুষ ও ভেড়ার ওপর প্রয়োগ করতে পারে। এটাকে বলা হয় লাঠিচার্জ। তাদের 'সোনালী টকিজ' সিনেমাহলে ঈদের ছবির টিকেট কাটতে লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় ও ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে একবার পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ হাশেম আলী খেয়েছিল। দুটি পিঠে, একটি পাছায়। এরপর তিনদিন সে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। তার ভাবী তার পিঠে হাতকাটা

মহাশংকরের তেল মেখে দিয়েছিলেন, পাছায় দিতে পারেননি— শালা পুলিশ পাছায় মেরে একেবারে গুহ্যদেশের সম্ভ্রমই হরণ করেছিল। ঘামে-ভেজা লুঙির উপর দিয়েই পশ্চাদ্দেশের সেই পুরনো ক্ষতে হাশেম আলী একবার হাত বুলিয়ে নিল।

৩. পুলিশ-সদস্যটি লাঠিটিতে তেল মেখে নিজের কিংবা অন্য কারো পশ্চাদ্দেশে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে। সফল হবে কি হবে না, সেটা তার ব্যাপার।

কিন্তু এই শালার হাতে যদি লাঠি না থেকে বন্দুক থাকতো, তাহলে সর্বনাশ হতে পারত। এ শালা গুলি করে তার মতো ভেড়া। খেদাত হাশেম আলী তো হাশেম আলী, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির দিকেও....

এক রাইফেলে একটা গুলি।

হাশেম আলী জানে।

যুদ্ধের সময় সে শিখেছিল।

একটা গুলি দিয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর কচুটা করতে পারবে! তার আগেই, হাশেম আলী প্রধানমন্ত্রীর অন্ধভক্ত, ঝাঁপিয়ে পড়বে এই পুলিশ-সদস্যের ওপর। তার রাইফেল কেড়ে নেবে, তখন মিলিটারির লোকজন এসে হাশেম আলীকে বলবে : শাব্বাশ বেটা, এই নাও তোমার পুরস্কার।

এহ্, কী জ্যামটা না লাগছে। হাশেম আলী হোটেল সোনারগাঁর বাইরের লোহার বেড়ায় পাছা ঠেকিয়ে পাঁচদিকের পাঁচটা রাস্তায় তাকায়। —খালি সোনারগাঁও হোটেল থাইকা বারাইয়া যে রাস্তাটা ফারমগেটের দিকে গেছেগা, হেই একটা রাস্তা কিলিয়ার আর ধরেন বাকি পাঁচটা রাস্তার দশটা সাইডের আটটাই গিজগিজ করতেছে গাড়িঘোড়া টেম্পো বাস ট্রাক।

পান্থপথের দিকে তাকায় হাশেম আলী, এক মাইল কি আধমাইল দূর পর্যন্ত সে দেখতে পায়, যত দূর চোখ যায়, খালি গাড়ি আর গাড়ি; লাইগা গেছে, গিট্টু লাইগা গেছে। ফারমগেটের রাস্তাটার দিকে একবার তাকাও, হায় আল্লাহরে কত কত গাড়িঘোড়া সব রোদের মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছে, সীমা পরিসীমা নাই!

এইদিকে জ্যাম গেছে গা শাহবাগ পর্যন্ত, ওইদিকে হাতিরপুল আর এদিকে মনে হয় এফডিসি ছাড়াইব। ইশরে, ভেড়া কয়টা হাতিরপুল মার্কেটে পৌঁছে দিয়ে তার একবার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এফডিসির গেটে, ফিলিমের নায়িকারা দুপুরের শিফটে যখন গেট দিয়ে বেরুবে, সে একবার তাদের চর্মচক্ষে দেখে মনের আশা পূরণ করতে চায়! চোখের সামনে একটা বেবিট্যাক্সি। তাতে এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা। কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাঁদছে। মনে হয় বাচ্চাটার বয়স চল্লিশদিন পুরো হয়নি। এমন একটা বাচ্চাকে নিয়ে তারা দুপুরবেলা বেবিট্যাক্সিতে উঠেছে কেন? ভদ্রমহিলা আঁচলের তলে ঢেকে বাচ্চাটাকে দুধ দিচ্ছেন। না, তবু বাচ্চার কান্না থামে না। মনে হয় ঘন্টা আধেক এই জ্যামে আটকা পড়ে বাচ্চাটা গরমে ভাজা ভাজা হয়ে গেল।

আর দেখো, সোনারগাঁর সামনের ঝরনাটার উপর চড়ে পুলিশের কয়েকজন অফিসার এমন ভাব করছে যেন আসমান ফুটো হয়ে কোনো অজগর সাপ নেমে আসছে। তাদের হাতের ইশারায়-ইঙ্গিতে দুদিকের পুলিশ সকল— তাদের কারো কারো কাঁধে রাইফেল— এমন তৎপর হয়ে পড়ল যে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি কিছু একটা হয়ে যাবে!

সোনারগাঁও হোটেলের সামনের এই জায়গাটায় ফুটপতের দুদিকে লোহার বেড়া, তারই চিপায় সে ২৬টা ভেড়াসমেত আটকা পড়েছে। নড়াচড়ার উপায় নাই। কেউ এক পা নড়বা না— পুলিশের মাথাগরম সদস্যটি ফের বলে। শুধু ২৬টা ভেড়া না, হাশেম আলী আর ওই কলসিঅলা মহিলা না, আরো আরো লোকজন— তাদের নানা বয়স, নানা পোশাক— আটকা পড়েছে এই ফুটপাতে।

কারোরই নড়াচড়া করার হুকুম নেই।

ওই মিয়া, কী হইছে, যাইতে দ্যান— একজন প্যান্ট-শার্ট পরা তরুণ বলে। চ্যাংড়া বয়স, রক্তে গরম বেশি।

প্রধানমন্ত্রী যাইব, সব চুপ— পুলিশটি জবাব দেয়।

গণতন্ত্রে আবার প্রধানমন্ত্রী কী ? এইটা কি মার্শাল ল' নাকি ? এরশাদ আটকুড়া যাইব— তরুণটি ফের বলে।

তখন তার পাশে দাঁড়ানো আরেকজন বলে : এই সাগর, চুপ কর হারামজাদা। এসএসএফ চিনস।

তুই চেন গা! আমার ঠেকা পড়ে নাই এসএসএফ চিননের।

আরে এরশাদের আছিল পিএসএফ। প্রেসিডেন্টস সিকিউরিটি ফোর্স। এখন হইছে এসএসএফ। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স। একই জিনিস। এরা কোনো অভিযোগ ছাড়াই যে কাউকে যখন খুশি গুলি চালাইতে পারে। লাইসেন্সড টু কিল।

সামনে একটা রাস্তা ফাঁকা। ওই রাস্তায় বাতি-জ্বালানো এক পুলিশি মোটরসাইকেল। হোটেল সোনারগাঁ থেকে বেরিয়েছে এই মোটরসাইকেল। তখন পুলিশ সকল অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়।

অহনি পিএম বারাইব, এক তরুণ বলে!

কিন্তু পিএম বেরুতে পারেন না। কারণ তিনজন বিদেশী, তাদের মধ্যে একজন মহিলা, গল্প করতে করতে সোনারগাঁর বাঁ গেটের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হেগো বালটাও তো ছিঁড়বার পারব না— এক তরুণ বলে!

বিদেশী তিনজন, তাদের লাল মুখ, লাল চুল, চারদিকের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

আর এদিকে ভেড়াগুলোর অবস্থা খারাপ। ফুটপাতের মানুষের স্রোত এসে আটকা পড়েছে এখানে, ভিড়ে জায়গাটা অকুলান হয়ে পড়েছে, লোকজন সব উঠে পড়ছে ভেড়ার গায়ে।

একজন পুলিশকর্তা দৌড়ে আসে। তিন বিদেশীকে ইংরেজিতে বোঝানোর চেষ্টা করে পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিংবা গুরুত্ব।

হাশেম আলী হি হি করে হাসে। ট্যাং টু ট্যা টু গুড মর্নিং, ইয়েস নো ভেরি গুড। বাপরে, কী ইংরেজি !

তরুণ দুটো গল্প করে।

ভেড়ার ঠিক মাঝখানে দুই চ্যাংড়া, তাদের কী তেজ !

এই তরুণ বলে : ওই মিয়া, ওই আটকুড়া রাজার গল্পটা মনে আছে। রাজা বলে, আজ সকালে আমি কার মুখ দেখেছি, তাকে ধরে আনো! আমার নাস্তার পাতে মাছি

পড়ল! তাকে ধরে আনা হলো! সে বলল, রাজামশায়, আমার মুখ দেখে আপনার পাতে পড়েছে মাছি। আর আপনার মুখ দেখে আমার হচ্ছে ফাঁসি। কে অধিক অপয়া?

আশপাশের সমবেত জনতা এই গল্প শোনে। তারা গুঞ্জন করে ওঠে।

এই সম্বন্ধির পুত, চুপ চুপ— একজন পুলিশ খেঁকায়।

এই ভেড়াগুলান, চুপ চুপ— হাশেম আলী বলে।

ওই ওদিকে একটা অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়েছে, তার বাতি জ্বলছে নিভছে। অনেকটা দূর হবে এখান থেকে। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর কে আছে? কোনো মুমূর্ষু রোগী! মনে হয় কোনো পোয়াতি মহিলা। বাচ্চার পা আগে বেরিয়েছে। তারপর আটকে গেছে। ব্যথায় মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার স্বামী পাশে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছে।

কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের চাকা ঘুরছে না।

হাশেমআলী ভাবে। ভেবেই হাসে। শালা, সিনেমা দেখে-দেখে সে ভালোই ভাবনা করতে শিখে গেছে।

আর দ্যাখো, ভেড়াগুলোকে, তাদের কোনো ভাবনা নেই। আরে হারামজাদারা, প্রধানমন্ত্রী যায়, তোরা দ্যাখ, চক্ষু সার্থক কর, নয়ন জুড়ায়া ল, না তো কী, শালারা যে ভেড়া সেই ভেড়াই রয়ে গেল।

একবার একটা লাল সিগনাল বাতিঅলা জিপ বের হলো! হাশেম আলী জানে এখনই বেরুবেন তিনি। আমাদের রানী!

বেরুচ্ছেন। হায় হায়, একই রকম দেখতে দুটো গাড়ি। ভুস করে বেরিয়ে গেল। রানীমাতা যে কোন্‌টায় ছিলেন!

পুলিশ সকলের ডিউটি শেষ। তাদের মুখে হাসি। তারা দৌড়ে ট্রাকের দিকে যাচ্ছে।

আর দ্যাখো, নীরব ছবির মতো জ্যামটা হঠাৎ নড়ে সরব হয়ে উঠল। একসঙ্গে গাড়ি স্টার্টের শব্দ, হর্ন—ওহ্ কী শব্দ! মৃত পাষাণপুরী জেগে উঠল বুঝি!

তরুণ দুটো ভেড়ার পালের ঠিক মাঝখানে। বেরুতে পারছে না।

একজন বলল, উনি না ক্ষমতা নিয়ে বলেছিলেন— উনি রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করবেন না।

অন্যজন বলল, কইছে তা কী হইছে। মানুষের রাস্তা তো বন্ধ করেন নাই। ভেড়ার রাস্তা বন্ধ করছেন। তোমরা রাস্তায় ভেড়া নামইবা! তো কী করব!

হাশেম আলী বিপন্ন বোধ করে! তাই তো! মানুষের রাস্তায় সে কেন ভেড়া নামিয়েছে। সব দোষ তারই। এই বুঝি দুই বদরাগী যুবক তাকে চ্যাংদোলা করে রাস্তার মধ্যে ফেলে দেয়।

তার সব রাগ পড়ে ভেড়ার পালের ওপর। হাতের লাঠিটা বাগিয়ে সে ভেড়াগুলোকেই পেটাতে যায়।

একঘণ্টা পেরিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন। কিন্তু ভেড়ার পাল নিয়ে হাশেম আলী রাস্তা পেরুতে পারছে না। অবিরাম যানজট। গিট্টু লেগে গেছে। সোনারগাঁর সামনের ফোয়ারাটার চারপাশে নানাদিকে মাথা বাড়িয়ে অনড় ভঙ্গিমায় পড়ে আছে বিচিত্র যানবাহন।

সামনের ওই বেবিট্যাক্সিটা, একটা দিন-চল্লিশেক বয়সের বাচ্চা তাতে! একচুলও নড়তে পারেনি। বাচ্চাটার মনে হয় একটা কিছু হয়েছে।

মনে হয় বাচ্চাটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বাবা-মা দুজন কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাটাকে কোলে করে বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল রাস্তায়। ফাঁকা নেই একটুখানিও। হাঁটারও জায়গা নেই।

ভেড়ার পালের পেছনে দাঁড়িয়ে হাশেমআলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে— ও আল্লাহ্, বাচ্চাটারে বাঁচায়া রাইখো।

চলো ঘুষ খাই চলো ঋণখেলাপি হই

আইসো, আমরা ঘুষ খাই। আইসো, আমরা ঋণখেলাপি হই। আমরা সমাজপাতিরা বসিয়া আছি, আমরা রাষ্ট্র ফাঁদিয়া যন্ত্র বসাইয়া তোমাদের জামাই আদর করিব বলিয়া মালা সাজাইয়া রাখিয়াছি, আমরা জাতীয় সংসদ বানাইয়া বার্ষিক বাজেট পেশ করিতেছি— তোমাদের জন্য। তোমরা আইসো, তোমরা ঘুষ খাও। তোমরা আইসো, তোমরা ঋণখেলাপি হও।

ঘুষ না-খাইয়া এই শ্যামল বাংলায় কে কবে সুখ ক্রয় করিয়াছে ?

ঋণখেলাপ না করিয়া এই সোনার বাংলায় কে কবে বড়লোক হইয়াছে ?

না। রসিকতা নহে। ইহাই সত্য। একদম ভেজালহীন খাঁটি কথা।

হে পাঠক, এই কল্পগল্পের সৎ ভালোমানুষ গোবেচারা পাঠক, তোমরা হয়তো তোমাদের ভালোমানুষির কারণে আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না। ভাবিতেছ ইহা আবার কীরূপ কথা !

ইহা কীরূপ কথা ?

না। ইহা রূপকথা নহে। ইহা হইল আমাদের রাষ্ট্র, সরকার ও বাজেটের সারকথা। মূলকথা।

ধরো, তুমি একজন রিকশাওয়ালা। সারাদিন গতর খাটাও। আহা, কী তোমার পরিশ্রম! কী তোমার হাড়ভাঙা, মাজাভাঙা খাটুনি! রোদে তোমার ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত হয়, মগজ ফুটিতে থাকে। বৃষ্টিতে তুমি কাকভেজা হও। নিজের শরীরের চাইতে তিনগুণ-চারগুণ বেশি ওজনের বোঝা, তবু তুমি টানিতে থাকো। তাহার উপর আছে ট্রাফিক পুলিশের প্যাদানি, যাত্রীর বকবকানি। সব সহিয়া জোরে ছুটিয়া শিফটের বাহিরে দুই ঘণ্টা অধিক চালাইয়া তুমি দিনে দুইশত টাকার অধিক কামাই করো। হ্যাঁ। তাহা সম্ভব বৈকি। ঢাকায় এখন এইখান হইতে ওইখনে যাইতেই তুমি ১৫ টাকা হাঁকাও। দিনে এইরূপ কুড়িটা খ্যাপ চালানো তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। হ্যাঁ। দিনে দুইশত টাকার অধিক মানে মাসে ছয় হাজার টাকার অধিক। অর্থাৎ কিনা বছরে ৭২ হাজার টাকার অধিক। ধরা যাক, তোমার আয় বাৎসরিক ৭৬ হাজার টাকা। তাহা হইলেই হইয়াছে। তোমাকে আয়কর দিতে হইবে। তুমি ভ্যানগাড়ির চালক। দিনে তোমার আয় তিনশত টাকা। মাসে নয় হাজার। বৎসরে এক লক্ষ আট হাজার। উরে সর্বনাশ! ভাই ভ্যানওয়ালা, আপনি আয়কর দেন তো ? দেন না ? তাহা হইলে আপনি ভাই আইন অমান্যকারী। আইনের বিচারে আপনি অসৎ নাগরিক। ফাঁকিবাজ।

কিন্তু এই বঙ্গদেশে একপ্রকার আয় আছে, যাহাতে ট্যাকসো লাগে না। ইহা হইলো ঘুষ। আপনি বছরে এক কোটি টাকা ঘুষ খান। পাঁচ কোটি টাকা ঘুষ খান। দুই লক্ষ টাকা ঘুষ খান। ইহার উপরে কোনো কর নাই।

আর কে আছে এই বঙ্গদেশে, ঘুষ খায় না। আপনি পুলিশকর্তা। মাসে আট হাজার টাকা বেতন পান। আর ৪০ লক্ষ টাকার মার্ক টু গাড়ি চড়েন। ঢাকায় আপনার তিনটা বাড়ি। ও পুলিশ সাহেব, ইহা কোথা হইতে আসে ? আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সচিব। আপনার বেতন কত ? কুড়ি হাজার টাকা ? ত্রিশ হাজার টাকা? না, এত নহে। সরকারি কর্মকর্তার বেতন এত হয় না। বিসিএস বা পিসিএস পাস করিয়া কত টাকায় চাকুরিতে জয়েন করিয়াছিলেন, মনে করুন। দুই হাজার টাকায়। নাকি তারও কম। ধরা যাক, আপনার কুড়ি বছরের চাকুরিজীবনে আপনি গড়ে আট হাজার টাকা বেতন পাইয়াছেন। তাহা হইলে বছরে ৯৬ হাজার টাকা। কুড়ি বছরে মোট বেতন পাইয়াছেন কুড়ি লক্ষ টাকা। তবে যে পাজেরো গাড়িটা চালাইতেছেন, তাহার দাম ২৫ লক্ষ টাকা, উহা আসিলো কোথা হইতে! আপনার মেয়ের বিবাহে কুড়ি লক্ষ টাকার হিরার সেট গড়াইলেন কীরূপে ? ছেলেদুটি আমেরিকায় পড়িতেছে কাহার টাকায়! কুড়ি লক্ষ টাকা বিড়ালের ওজন হইলে মাংসের ওজন কোথায় ? আর কুড়ি লক্ষ টাকা মাংসের ওজন হইলে বিড়ালের ওজন কোথায় ?

এত কথা বলার দরকার নাই। আপনি ঘুষ খাইয়াছেন। সরকারি সম্পত্তি লুটপাট করিয়াছেন। সরকারি বন কাটিয়া সাফ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার ইনকামের উপরে কোনো ট্যাক্স দেন নাই। বাংলাদেশে সব ইনকামের উপর ট্যাকসো আছে, শুধু ঘুষের উপরে নাই।

আর দেখো, পোকার মতো কিলবিল-করা জনগণকে। তাহারা একটা মিষ্টি মুখে পুরিতে ভ্যাট দেয়, এবার সেলুনে বসিয়া চুল কাটিতে বসিয়া ভ্যাট দিবে। তাহাদের রক্ত চুষিয়া খাইতে আমরা জোঁক পুষিতেছি, বিরাট বড় সরকারি প্রশাসনযন্ত্র-মন্ত্রী-আমলা-গণপ্রতিনিধিরা মিলিয়া যেভাবে শুষিতেছে, তাহাতে শোঁ শোঁ রব উঠিয়াছে।

আর আছে ঋণখেলাপ। আপনি সরকারি ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করুন। ব্যস, দশ কোটি, কুড়ি কোটি যাহাই লহেন না কেন, এই আয় আয়করমুক্ত। আরে, আমি তো ঋণ লইয়াছি। ইহার আবার ট্যাক্স কী ? অন্যদিকে ইহাই আপনার আয়। এই ঋণ আর আপনি শোধ করিবেন না। ব্যস। আপনি বড় ব্যবসায়ী। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভোটে দাঁড়াইলে এমপি। কী সহজ বুদ্ধি!

আর আছে চোরাচালান। হেরোইন আনুন, ফেন্সিডিল আনুন। সারাদেশ ফেন্সিডিলে সয়লাব হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন দেশের মানুষ যত গেলাস পানি পান করে, তাহা অপেক্ষা অধিক বোতল ফেন্সিডিল দেশে আসে। পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয় হয়। এই বিক্রয়ের টাকায় অনেকেই বড়লোক হইতেছে। গাড়ি হাঁকাইতেছে। ইমারত গড়িতেছে। এই আয়ের উপরও কোনো ট্যাক্সো দিতে হয় না। শুল্ক দিতে হয় না, ভ্যাট দিতে হয় না। শুধু বছর বছর টাকার কুমির সাজিয়া বসিয়া থাকিলেই হয়। সরকার মাঝেমধ্যেই কালো টাকা শাদা করিবার সুযোগ দেয়। অর্থের উৎস লইয়া প্রশ্ন না তুলিয়া বিনিয়োগ করিবার সুযোগ দেয়। আর সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকিবারই বা কী দরকার। ব্যাংক হইতে কোটি টাকা ঋণ লইলেই তো সব পাপ মোচন হইয়া যায়। লোকে ভাবে : আরে ছো, ফেন্সিডিল কিসের, ও তো ব্যাংকের টাকায় বাড়ি করিতেছে।

অতএব, হে বোকা রিকশাচালক, মূর্খ কৃষক, প্রতারিত শ্রমিক, সরল শিক্ষক, হাঁদারাম ব্যবসায়ী, গর্দভ লেখক— সব ছাড়িয়া ঘুষ খাও, মাদকব্যবসা ধরো, ছিনতাই করো, চাঁদাবাজি করো, অন্যের জমি দখল করো, ঋণ লহো।

কদ্যপি সৎ উপায়ে জীবন ধারণ করিতে চাহিও না। তাহাতে বহুত হ্যাপা। চাঁদাবাজ জীবন অতিষ্ঠ করিবে, পাড়ার মাস্তান মেয়ে উঠাইয়া লইয়া যাইবে, আয়কর বিভাগ উত্ত্যক্ত করিবে। এক নম্বর পথ নহে, দুই নম্বর পথই হইলো উত্তম পথ—এই সরকার, এই সমাজ, এই রাষ্ট্র সেই কথাই প্রতিনিয়ত তোমার কানে বলিতেছে।

২১ জুন ১৯৯৯

আপনারা হয়তো আমার বেদনাটা বুঝবেন.....

বিবিসি ওয়ার্ল্ডে একটা তথ্যচিত্র দেখানো হলো কাশ্মির নিয়ে। বিবিসির সাংবাদিকরা ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে চলে গেছেন কাশ্মিরে। কাশ্মিরের ভারতনিয়ন্ত্রিত অংশ আর পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত অংশ— উভয় দিকেই গেছেন তারা। উভয় অংশের নানা স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকার দেখিয়েছেন।

রুদ্ধশ্বাসে অনুষ্ঠানটি দেখছিলাম।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ছোটখাটো অভিযান দেখতে গিয়ে তো রোম খাড়া হয়ে উঠল।

ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। বিরাণ এক জনপদ। এরই মধ্যে হেঁটে গেল এক কাশ্মিরি বালিকা। ভারতীয় সৈন্যরা পায়ে হাঁটছে। তাদের হাতে অস্ত্র। চোখ সতর্ক। বেশ ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ি। দোতলা। সেখান থেকে হঠাৎ করে গুলির শব্দ আসছে। শত শত সৈন্য। তারা পজিশন নিল। বিবিসির সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে ছুটে নিরাপদ জায়গায় আসছেন। বাড়িটি ঘেরাও করা হলো। তবু থেমে-থেমে গুলি আসছে ভেতর থেকে। মাইকে বলা হলো, ভেতরে কে আছে, বেরিয়ে এসো।

প্রথমে এলেন একজন বৃদ্ধ। মুখে দাড়ি। পরনে আলখাল্লা। 'হাত উপরে'— ভারতীয় সেনাকর্তার নির্দেশ। তিনি হাত উপরে তুললেন। 'আলখাল্লা খোলো'। তিনি তাড়াতাড়ি উপরের জামাটা খুলতে যাচ্ছেন। তাড়াহুড়াতে জামা আটকে যাচ্ছে। আহ্! কী দুঃসময়ের ভেতরেই তিনি আছেন। অতঃপর জামা খোলা সম্পন্ন হলো। তিনি হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসলেন। হাত উপরে।

মাইকে ঘোষণা— আর কে আছে ? বেরো। তখন বের হলো আসল জন। ভারতের ভাষায় একজন জঙ্গি। ওদের ভাষায় মুজাহিদ। সে তার হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলল। হাত ইপরে তুলল।

পরে ভারতীয় অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন উর্দুতে, তারা কত জন এসেছিল? জানা গেল, দুজন। পাকিস্তান থেকে অস্ত্র নিয়ে এসছে। বৃদ্ধটি তার বাবা।

ভারতীয় সৈন্যদের হাতে পিতার সামনে ধরাপড়া এ পুত্রটির দিকে তাকিয়ে আমার মন কেমন করে উঠল। ভারতীয় দৃষ্টিতে সে দুষ্কৃতকারী। বহিরাগত। অনুপ্রবেশকারী। জঙ্গি। দেশের শত্রু।

আর তার নিজের দৃষ্টিতে! সে একজন মুজাহিদ। সে কাশ্মিরকে স্বাধীন দেখতে চায়।

আর পাকিস্তানের দৃষ্টিতে হয়তো ভারতকে রক্তাক্ত করার একটা 'যন্ত্র' মাত্র।

কিন্তু তার বাবার দৃষ্টিতে! ওই বৃদ্ধের দৃষ্টিতে! নিজের ছেলে! নিজের বাসভবনে যে একটিবার এসেছিল। হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা করতে!

আমার বুকের মধ্যে হাহাকার বেজে ওঠে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আছে। তাতে আছে বন্ধ-কারখানার সামনে অনশনরত কয়েকজন শ্রমিকের কথা। সুনীল লিখেছিলেন— তিনি রাজনীতি বোঝেন না, কিন্তু কয়েকজন মানুষ এভাবে পড়ে আছে, না-খেয়ে আছে, এটা তার বুকে বাজছে।

২

ভারতীয় ক্রিকেটার কপিল দেব গিয়েছিলেন হাসপাতালে। কাশ্মির লড়াইয়ে আহত সৈনিকদের দেখতে।

হাত-পা কাটা, শরীরের কোনো অংশ উড়ে যাওয়া, হয়তো চোখ-কান হারানো একেকজন মানুষ শুয়ে অছে বেডে। তারা তো মানুষ। কোনো-না-কোনো বাবার ছেলে। কোনো-না-কোনো বোনের ভাই।

এই দৃশ্য দেখে কপিল দেব মুষড়ে পড়তেই পারেন— এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, এ দৃশ্য দেখার পর তিনি চান না, ভারত ক্রিকেট খেলুক পাকিস্তানের সঙ্গে।

পরে দূরদর্শনের খবরে দেখতে পেলাম— অজয় জাদেজা আর কপিল দেব সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিচ্ছেন, ক্রিকেটাররা আর সিনে-তারকারা জোয়ানদের সঙ্গে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলেবেন। উদ্দেশ্য জোয়ানদের অনুপ্রেরণা দেয়া।

৩

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসবই দেশপ্রেমিকের কাজ। যে সৈনিকরা প্রাণ দিচ্ছেন, জখম হচ্ছেন, তারা তা করছেন দেশের জন্য।

আর কাশ্মিরের মুসলিম মুজাহিদদের দৃষ্টিতে দেখলে ?

তাদেরও মায়ের বুক খালি হচ্ছে। ভাই হারানোর শোকে বোন কাঁদছে।

আজ ৯ জুলাই ১৯৯৯, প্রথম আলোয় দেখলাম, ভারতীয় সরকারি হিসাবে পাঁচশরও বেশি কাশ্মিরি (ওদের ভাষায় শত্রুসৈন্য, হানাদার) মারা গেছে এই যুদ্ধে। আর ভারতীয় সৈন্য মারা গেছে তিনশরও বেশি। খবরে বলা হয়েছে, বেসরকারি হিসাবে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি।

যুদ্ধের খবরে হতাহত হয় সংখ্যা। 'তিনশ' বা 'চারশ' মরে। কিন্তু ওই 'তিনশ' বা 'চারশ' তো কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। তিনশ বা চারশ জন মানুষ।

একজন মানুষ। তার চোখে আছে, মুখ আছে। শরীর আছে। মন আছে। আছে জন্মের ইতিহাস। তাদের প্রত্যেকের জন্মের সময় বাড়িতে উৎসব হয়েছে। প্রত্যেকে যখন হাঁটিহাঁটি পা-পা করতে শুরু করে, বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছে। প্রত্যেকের মনে আছে এক আকাশ স্বপ্ন। সে ভারতীয় হোক, পাকিস্তানিই হোক কিংবা কাশ্মিরিই হোক। হায়, রাজনীতি-কূটনীতি এসব বোঝে না। মানুষ নয়, তার চাই জমি। দেশের মাটির একটি কণাও রাষ্ট্র ছাড়তে নারাজ। ৫০টা বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে। ৫০ বছর আগে কাশ্মির ছিল একটাই দেশ। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান— ভূস্বর্গ। তারপর একদিন মধ্যখানে পড়ে গেল সীমানা, একদেশ হয়ে গেল দুদেশ। এপাশে

পড়ল কেউ, ওপাশে কেউ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। আজো ট্রেন চলে দুদেশের মধ্যে। ভাই তার ভাইকে দেখতে যায় ভিনদেশে। আলাদা পাসপোর্ট নিয়ে।

এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। ভারত ছাড়বে না। তারা অন্য কোনো দেশের মধ্যস্থতাও মানবে না। পাকিস্তান ছাড়বে না।

আর কাশ্মিরিরা! হায় ভাগ্যবঞ্চিত মানুষ! তারা জন্ম নিচ্ছে কামানের গোলার নিচে। সৈনিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন-হত্যা-ধর্ষণ-নিপীড়নের ভয়াবহ কাঁটাতারের ভেতরে! তাদের কেউ কেউ বেছে নিচ্ছে লড়াকু জীবন। কিন্তু ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান তাদের এমন— তারা কোনোদিনও হয়তো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না।

৪

না, আমি কোনো পক্ষ নিচ্ছি না। কারণ বিষয়টা সম্পর্কে আমি জানি খুব কম। আমি শুধু দেখছি— একই বিষয়, অথচ একেক দেশে তার ব্যাখ্যা একেক রকম। এক দশের দেশপ্রেমিক আরেক দেশের শত্রুসেনা। একদেশে মৃত্যুর রোল, অন্যদেশের বিজয় উৎসব। তারই নিচে আমি, খুবই সামান্য মানুষ, বেশ নিরাপদ দূরত্বে বসে, নীরবে, মানুষের ব্যথায়-বেদনায়, মৃত্যুতে-রক্তপাতে, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাহীনতায় আর অক্ষমতায় অশ্রুপাত করি।

৫

৫০ বছরের কাশ্মির সমস্যার সমাধান আমার দীর্ঘশ্বাসে সহজতর হবে না। কী করে হবে, তাও জানি না। আশাও করি না।

কিন্তু ভাবি অন্য কথা। কপিল দেব হাসপাতালে ভারতীয় সৈন্যদের দেখে মর্মাহত হন।

আর আমরা, ঢাকার হাসপাতালে আহত পুলিশদের কথা কি একবারও ভাবতে পারি না।

প্রতিটা হরতালের আগে-পরে পুলিশদের প্রতি বোমা মারা হয়। পুলিশ আহত হয়। ডিউটি দিতে গিয়ে গত পরশু ৭ জুলাই গুলিস্তানে হরতালকারীদের বোমায় মারা পড়লো পুলিশ কনস্টেবল ফরহাদ।

পুলিশও তো মানুষ। তাদেরও তো বাবা-মা, ভাইবোন আছে।

আর মারা পড়ছে নিরীহ পথচারী। রিকশাচালক। বাস-আরোহী মানুষ।

কারগিল যুদ্ধে নিহত হয়েছে শত শত মানুষ। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রতিবছর কি কম মানুষ মারা পড়ছে? আহত হচ্ছে? হরতালের কারণে হাসপাতালে পৌঁছতে না পেরে মরছে যে কতজন সে হিসাব তো লেখাও হয় না।

কাশ্মির সমস্যার সমাধান নাহয় সুদূরপরাহত। কিন্তু এই আওয়ামী লীগ-বিএনপি লড়াইটা কেন হচ্ছে?

কী কারণে ৯ জুলাই ১৯৯৯-এর হরতাল?

৬

হরতালের দিন ঢাকায় বাসে উঠেছিলেন এক বৃদ্ধ। পাকা চুল। কে জানে, কোথায় যাচ্ছিলেন তিনি। মেয়ের বাড়ি? নাতিকে দেখতে? হাতে বুঝি কিছু সবুজ পেয়ারা ছিল তার। হঠাৎ ঢিল ছোড়া হলো বাসের দিকে। এসে লাগল বৃদ্ধের কপালে।

এখন তিনি শুয়ে আছেন মর্গে। বেওয়ারিশ লাশ হয়ে।

আর হয়তো পড়ে আছে সবুজ পেয়ারাগুলো। তার নাতনির হাতে ওই পেয়ারাগুলো পৌছবে না আর কোনোদিন।

আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আকুল হয়ে চিৎকার করে বলি : মানুষের রক্তপাত বন্ধ করো, কাশ্মিরে রক্তপাত বন্ধ করতে ওরা পারছে না, মানবতা কাঁপছে, কিন্তু কী কারণে তোমরা স্বদেশের মানুষদের এভাবে মারছ— বার বার!

১২ জুলাই ১৯৯৯

একটি নিখোঁজ সংবাদ

একটা সময় ছিল, যখন নেতা মানে বোঝাত জনগণের নেতা। নেতা অনিবার্যভাবেই ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিজেও গরিব ছিলেন তিনি। যদি কেউ জন্মসূত্রে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একজন হতেন, তিনি শ্রেণীচ্যুত করতেন নিজেকে। বাবার বিত্ত-সম্পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসে যাপন করতেন ত্যাগীর জীবন, যোগীর জীবন, সাধনার জীবন। আমি একজন কমিউনিস্ট নেতার কথা জানি, বাবার জমিদারি ত্যাগ করে যিনি চলে এসেছিলেন। একটা মাত্র জামা ছিল তার, এটি নিজ হাতে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে তারপর পরতেন। সবাই যে কমিউনিস্ট ছিলেন তা নয়, সবাই শ্রেণীচ্যুতও হতে পারতেন না, তবে তারাও নিজের বিত্ত-বৈভবের প্রকাশ ঘটাতেন না। জনসভায় যাওয়ার জন্য সবাই খদ্দর কিংবা পাঞ্জাবিকেই শ্রেষ্ঠ পোশাক মনে করতেন। ঘাড়ে হয়তো ঝোলানো থাকত একটা চাদর, জনগণ যেন তাকে দূরবর্তী না ভাবে, তাকে যেন জনগণের একজনই ভাবা হয়— এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে তাদের সাধনার অন্ত ছিল না। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সত্যি সত্যি বেরিয়ে এসেছিলেন জনগণের মধ্য থেকেই। নিজের জীবনকে দেশের জন্য, মানুষের জন্য তারা উৎসর্গ করেছেন— মনেপ্রাণে এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। তারা কেউই কেন্দ্রের নেতা ছিলেন না, রাজধানীর নেতা ছিলেন না— ছিলেন এলাকার নেতা, সে তাজউদ্দিন আহমদই হোন আর কামরুজ্জামানই হোন কিংবা মনসুর আলীই হোন। মন্ত্রী হওয়ার আগে তাদের কিছুই ছিল না। মন্ত্রী হওয়ার পরেও তেমন কিছু নয়। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরও তেমন কিছু ছিল না (শুনতে পাই, তার ধানমণ্ডির বাড়িটা তাকে বানিয়ে দিয়েছিল একটা কম্পানি, ওই কম্পানির সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বচ্ছ কাজ করে দিয়ে তিনি ওটা পেয়েছিলেন)।

জাপানি যে-ছবিটা এবার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হলো তাতেও দেখতে পাই, সাধারণ জীবন যাপন করতেন একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী। ঘরে কোনো দামি আসবাব নেই, আড়ম্বর নেই। নাশতার টেবিল যেন আমারই নাশতার টেবিল। কিংবা মওলানা ভাসানী— যেন দরবেশ তিনি, দুনিয়াদারিতে যার মন নেই।

কিন্তু সেই আদর্শবাদী রাজনীতিবিদদের আমরা কোথায় হারিয়ে ফেললাম! এখন নেতা মানেই টাকা-পয়সা, হুলস্থুল বড়বাড়ি, ফোর হুইল ড্রাইভ— মোবাইল ফোনটা তো নস্যি। ছাত্রনেতার পকেটে বেনসন অ্যান্ড হেজেস। এও তো কিছুই নয়। আমাদের চোখের সামনে গত সরকারের আমলে একজন ছাত্রনেতা মাথা থেকে (সর্ষের?) তেল

মুছতে-না-মুছতেই ঢাকায় একাধিক বাড়ির মালিক বনে গেলেন। সবচেয়ে বড় গাড়িটাই হলো তার।

এবং লাজ-শরমের বালাই খেয়ে ফেলে ঢাকার রাজউকের প্লটগুলো সব বরাদ্দ করা হলো সরাসরি নেতাদের নামেই। এতদিন আমরা জানতাম, প্লট পেতে হলে মন্ত্রী ধরতে হয়, নেতা ধরতে হয়, রাজউকে লাখ লাখ টাকা দিতে হয়। এবার অবাক হয়ে দেখলাম, নেতারা নিজেরাই প্লট বরাদ্দ নিয়ে বসে আছেন। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বড়লোকের মেয়েরও প্লট চাই, প্লট চাই ইনজিনিয়ার মোশাররফের মতো চট্টগ্রামের অন্যতম শীর্ষ ধনাঢ্য ব্যক্তিটিরও।

এই প্লটগুলোর উদ্দেশ্য তো হওয়া উচিত এই যে, যাদের নগদ টাকায় উচ্চমূল্য দিয়ে ঢাকায় জমি কেনার সাধ্য নেই তাদের সাহায্য করা; বিশেষত মধ্যবিত্তদের— কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক— এদের মধ্যে যারা কীর্তিমান কিন্তু নিজের পেশায় সততার কারণেই অসামর্থ্যবান, তাদের।

আমরা এ ধরনের গল্প শুনে হাসাহাসি করি, পুত্রবধূ বাছতে গিয়ে বাবা নিজেই পাত্রীকে পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলেছেন। যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল প্লটগুলো নাগরিকদের মধ্যে সুন্দরভাবে, পক্ষপাতশূন্যভাবে, দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে বিলিবণ্টন করে দেয়ার, তারা নিজেরাই সেসব নিজেদের নামে বরাদ্দ করিয়ে নিয়েছেন— এ দৃশ্য দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

নেতারা নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেবেন, নিজের খেয়ে তারা জনগণের মোষ তাড়াবেন। এইজন্যই তারা নেতা। আমরা, সাধারণ মানুষ, অতটা নিঃস্বার্থ নির্লোভ হতে পারি না বলেই আমরা জনগণ। এ কারণেই আমরা আমাদের চেয়ে এক হাত লম্বা, সাড়ে চার হাত উচ্চতার এই মানুষদের শ্রদ্ধা করি, তাদের ছবি বাঁধিয়ে রাখি, তাতে ফুল দিই। সারা পৃথিবী মহাত্মা গান্ধীকে মহাত্মা বলে চেনে, শেখ মুজিবকে বাংলাদেশ ডাকে তার বন্ধু বলে।

কিন্তু কী দুঃসময়ের ভেতরে আমরা আছি যে, আমাদের নেতারা সবার আগে ভর্তি করতে চান নিজেদের পকেট। কোনো রাখঢাক নেই, চক্ষুলজ্জা নেই।

আমাদের এমপিদের চাই শুল্কবিহীন গাড়ি, সবার চাই ঢাকায় ন্যায্যমূল্যের প্লট। এমপি পদটাকে তারা পরিণত করতে চান একটি লাভজনক পদে। তাই যদি হয়, তাহলে নির্বাচনের সময় যেন ঘোষণা করা হয়— প্রত্যেক থানা থেকে আপনারা একটা লোক নির্বাচন করুন, যিনি পাবেন একটা সরকারি প্লট, পাবেন শুল্কমুক্ত গাড়ি, পাবেন টেলিফোন-সেক্রেটারি, গাড়ির খরচ এবং উচ্চসম্মানি এ সুযোগ সবাই পাবেন না। মনে রাখবেন প্রতি থানায় পাবেন একজন। কে পাবেন অন্য কোনো উপায়ে স্থির করা যাচ্ছে না। আপনারাই ভোট দিয়ে স্থির করুন রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নানা ধরনের সুবিধা কার নামে বরাদ্দ করা হবে। যেন বলা না হয় : আমাদের ভোট দিয়ে জনসেবার সুযোগ দিন। যেন বলা হয় : আমাকে ভোট দিয়ে আত্মসেবার ও আত্মীয়সেবার সুযোগ দিন।

আমরা খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি— যে দেশে যে সময়ে নেতারা নিজেরা ব্যবসা চান, ব্যবসা কুক্ষিগত করেন, ব্যবসা দিয়ে টাকা খান, নিজেরা কোটি কোটি টাকা করেন— সেটা এক ভয়াবহ দুঃসময়। এ ব্যাপারটা শুরু করেছেন জিয়াউর রহমান রাজনীতিকদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে। তার আগে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের দুর্নাম

ছিল রিলিফ চুরির— কম্বল বা গম চুরির। দুশো পাঁচশো মণ টাকার বেশি তারা আত্মসাৎ করেনি, করার সুযোগ ছিল না, করার কথা ভাবতেন না।

জিয়ার আমল থেকে নেতাদের আর কম্বল চুরির দুর্নাম নেই, কিন্তু তারা করছেন পুকুর চুরি। আমাদের গ্রামের নেতাটি গম সরালে আমরা সবাই ধরে ফেলি, সমালোচনা করি, কিন্তু নেতা শহরে গিয়ে পুরো মতিঝিল পকেটে পুরলেও আমাদের চোখে পড়ে না।

এখনো সেই কালচারই চলছে। ক্রয়-বিক্রয়-ঠিকাদারি-নিয়োগ বরাদ্দে চলছে হরিলুট।

আমাদের সেই খদ্দর-পরা, চপ্পল-পরা নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী নেতাটিকে আমরা আর কোথাও খুঁজে পাই না।

কিন্তু তাকেই আমাদের চাই। আমরা শহরের দেয়ালে দেয়ালে নিখোঁজ সংবাদ ঝুলিয়ে দিতে চাই। আপনারা যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সেই আদর্শবাদী, ত্যাগী নেতাটির দেখা পান, দয়া করে সন্ধান দিন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই রাজউকের ৩০১টি প্লট বরাদ্দের সিদ্ধান্তটি বাতিল করার জন্য। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সরকার এখনো সমালোচনাকে আমলে আনে! তা যদি না আনত, তাহলে আমাদের আর কিছুই থাকত না। লজ্জা না-থাকা মানে সবকিছু হারিয়ে দেউলিয়া বনে যাওয়া। শেখ হাসিনা অবশ্য বলেছেন, প্লট বরাদ্দে অনিয়ম কিছু করা হয়নি। এটা হয়তো ঠিক। কারণ প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে যদি কোনো নিয়ম না থাকে, তাহলে অনিয়ম বলেও কিছু থাকে না। তবে অনিয়ম না হলেও নির্লজ্জতার প্রকাশ ঘটেছিল। তাতে পুরো জাতির মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল। শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তে সে মাথাটা যদি কিছুটা উঁচু হয়। আরো ভালো হবে, ভবিষ্যতে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি আত্মসেবার নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করা হয়।

চলতিপত্র ১৯ জুলাই ১৯৯৯

আপনি আচরি ধর্ম

আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শেখাও। সবার আগে নিজেকে ঠিক করতে হবে, তারপর উপদেশ দিতে হবে অন্যকে। অবশ্য আমাদের কোকিলকণ্ঠী অনলবর্ষী ওয়াজবিদরা যথেষ্ট চালাক। তারা বলে রেখেছেন— নসিহতটুকু শুনো, খাসিলতটুকু দেখো না। অর্থাৎ বক্তব্যের ভালো ভালো কথাগুলো শুনো, কিন্তু বক্তার চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলো উপেক্ষা করো।

যদিও আমরা জানি হযরত মোহাম্মদের (সা.) শিক্ষা হলো, যা তুমি নিজে আচরণ করতে পারো না, তা করতে অন্যকে উপদেশ দিও না। তিনি নিজে মিষ্টি পছন্দ করতেন বলে অন্যের ছেলেকে মিষ্টি খাওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেননি। দিয়েছেন তখনই, যখন নিজে ছেড়েছেন।

এর উল্টো পিঠে কথা আছে। চোরের মার বড় গলা। যে নিজে দুর্নীতিদুষ্ট, এদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বড় কথা সে-ই বলে। এটা-যে ব্যক্তিক্রমহীনভাবে সত্য তা নয়, ব্যতিক্রমও আছে। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন,

ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে বলেন আর তিনি নিজের জীবনটুকুও যাপন করেন সততা আর নিষ্ঠার উজ্জ্বল আলোয়। আমরা জানি, একটিমাত্র স্যুট ছিল তার, যখন তিনি প্রথমবার অস্থায়ী সরকারের প্রধান হয়েছিলেন।

আবার এমন দুর্নীতিবাজও থাকতে পারে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে না। এমন ঘুষখোরও থাকতে পারে যে কথা বলে না ঘুষের বিরুদ্ধে। চুপচাপ থাকে। চুপচাপ না থেকে উল্টো দুর্নীতির পক্ষে বলে, ঘুষের পক্ষে বলে— এমন লোকও আছে। ঘুষ কেন খাব না, ঘুষ আমার ন্যায্য পাওনা— এমন কথা বলার লোকও সমাজে বিরল নয়।

যা হোক, যখন কাউকে হিতোপদেশ দিতে শুনি, মূল্যবান বক্তব্য দিতে শুনি, তখন ভালোই লাগে। সদুপদেশ হয়তো বৃথা যায় না, কোনো-না-কোনো শ্রোতার মনে হয়তো কাজ করে। কিন্তু যখন দেখি, ওই সদুপদেশদাতাই সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ, তখন মুষড়ে পড়ি।

যে অধ্যাপক জাতিকে শেখান কর্তব্যপরায়ণতার কথা— লেখায়, বক্তৃতায়, সভায়, সেমিনারে, টিভিতে—যখন দেখি, তিনিই তার ক্লাসটুকু নেন না, পরীক্ষার খাতা ঠিকভাবে দেখেন না, সময়মতো পরীক্ষার ফল দেন না; তখন সেই বেদনা খুব বড় হয়ে হৃদয়ে বাজে। যে কবি-লেখক-ভাবুককে দেখি অবিরাম নারী-অধিকারের কথা বলেন, মানবাধিকারের কথা বলেন, তাকেই দেখতে পাই তার প্রতিষ্ঠিত এনজিও বা প্রতিষ্ঠানটিতেই সবচেয়ে বেশি শ্রমশোষণ করা হয়। মাস্টার্স পাস তরুণীকে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খাটিয়ে ১৪০০ টাকা বেতন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন চোখ ফেটে জল আসতে চায়। যে অর্থনীতিবিদ সারা পৃথিবীতে নমস্য, যখন দেখি তিনিই তার সুনামকে নিছক ব্যবসায়িক মুনাফার কাছে ভুলুণ্ঠিত করতে দ্বিধান্বিত হন না, 'আমরা ইনকামিং চার্জ করি না' বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজার হাজার গ্রাহককে ফাঁদে ফেলে ইনকামিং চার্জ বসান মোবাইল ফোনে, তখন আমাদের আশার আকাশখানি মেঘে ঢেকে যায়। সামাজিক অঙ্গীকারের কথা বলে যে প্রকাশক দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখকদের বই প্রকাশ করেন, যখন দেখি তিনি এক পয়সাও রয়ালিটি দেন না লেখকদের, তখন নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া কীই বা করতে পারি আমরা! যখন দেখি সবচেয়ে বড় দুর্নীতির অভিযোগ আসে ধর্মমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তখন অধিক শোকে আমরা পাথর হয়ে যাই।

এনজিওগুলো এদেশে সোচ্চার ছিল এবং আছে সরকারি আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অদক্ষতার বিরুদ্ধে, অনুন্নয়নশীল খাতে অপব্যয়ের বিরুদ্ধে। এমনকি তারা সোচ্চার রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেও। এখন দেখতে পাচ্ছি সরকারি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকেই, গরিব মানুষের উন্নয়নের নামে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে টাকা এনে তা ব্যয় করা হয় বড় বড় গাড়িবাড়ির পেছনে, শানশওকতের পেছনে, এমনকি একই কোপে দুই ঝোপ কাটা হয়— এনজিও-প্রয়াস থেকে অর্থকরী প্রতিষ্ঠান বানিয়ে সেটাকে তালিকাভুক্ত করা হয় নিজেদের নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

আমরা জানি, বাঘ শিকার করতে টোপ লাগে, সেই টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ছাগল। এখন এদেশে ব্যক্তি আর গোষ্ঠীর নিজস্ব উন্নয়নের জন্য ছাগল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণ। এনজিওগুলো এদেশের দারিদ্র্য দেখিয়ে টাকা আনছে কিন্তু জনগণ জানে না, তাদের টাকা কোন্ খাতে কীভাবে ব্যয় হয়। সরকার টাকা আনছে আর তা হচ্ছে

হরিলুট। রাজনীতিবিদ, আমলা, টেকনোক্র্যাট, ব্যবসায়ী— সব লুটেপুটে খাচ্ছে সেই অর্থকড়ি। প্রান্তিক পর্যায়ে গরিব আরো গরিব হচ্ছে, ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে।

বাংলাদেশে একমাত্র এই অবক্ষয়ের ধারার বাইরে আছে কৃষকসমাজ। তারা দুর্নীতি করে না, বরং দুর্নীতির প্রান্তিক শিকার। অথচ তারাই খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর।

বায়ুসমুদ্রে ডুবে থাকার মতো আমরা এদেশে ডুবে আছি দুর্নীতিসমুদ্রে। এ নিয়ে কারো যেন কোনো ভাবান্তর নেই। ধরা যাক, আমি জমি রেজিষ্ট্রি করব। আমাকে বলা হবে পাঁচশ টাকা অতিরিক্ত লাগবে, অফিসে খরচ হবে। আমি নির্দ্বিধায় দিয়ে দেব। প্রশ্ন তুলব না, কেন দিতে হবে! পুলিশ আপনার ঘরে আসবে পাসপোর্ট কিংবা চাকরির জন্য আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে, আপনি পঞ্চাশ কি একশ টাকা দিয়ে দেবেন। যেন এটাই নিয়ম। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, রুট পারমিট, ট্রেড লাইসেন্স— সবখানেই দিতে হবে কিছু বাড়তি টাকা। যে দেবে না তার কাজটা হবে না বা অকারণ দুদিন দেরি হবে! সবাই তাকে বলবে— তুমি কি খোকা নাকি, কিছু টাকা ঘুষ দিলেই তো আগেবাগে কাজটা হয়ে যেত।

এখন প্রায় প্রতিটা নিয়োগে, পদোন্নতিতে, পোস্টিঙে চাই টাকা! এই যে টাকা মানে ঘুষ দিতে হয়, নিতে হয়—এটাকে কেউ আর অন্যায়-অনিয়ম ভবে না, দুর্নীতি ভাবে না, অপরাধ ভাবে না, পাপ ভাবে না।

সেটা খুবই দুশ্চিন্তার কথা।

কিন্তু তারও চেয়ে দুশ্চিন্তার কথা হল, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির কথা বলে, দেখা যায় সেই হয়তো তার নিজের কাজে ফাঁকি দেয়।

সোচ্চার ডাক্তারটি তার কর্মস্থলে যায় না, সোচ্চার অধ্যাপকটি ক্লাসে যায় না, তৎপর সাংবাদিকটি দুকলমও লেখে না।

আমি এখন ছোট সরকারের পক্ষে। সরকার যত ছোট হবে, দুর্নীতি তত কম হবে, অদক্ষতা তত কম হবে। সবকিছুর অনুমতি কেন আমাকে সরকারের কাছ থেকে নিতে হবে; যখন কেবল টাকা দিলেই দরকারি অনুমতিটি পাওয়া যায়?

কিন্তু হতাশা তীব্র আকার ধারণ করে যখন দেখি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তাটিও ঘুষ চায়, এনজিও পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

তাহলে কি বাঙালি মাত্রই খারাপ, দুর্নীতিবাজ!

তা কি হতে পারে! ঔপনিবেশিক শাসনের আগে কি দেশে দুর্নীতি ছিল!

হায়! বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মতো আরো মানুষ আমরা কবে পাব!

এ কথা যখন লিখছি তখন নিজের দিকেই আঙুল উঠে আসছে। শুরুতেই বলেছি : যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করে, সে-ই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। গণতন্ত্রের মর্ম যে বিন্দুমাত্র বোঝে না, বুঝতে চায় না, বোঝার যোগ্যতা রাখে না, গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে সে-ই মূর্ছা যায়।

এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে কি আমি নিজেই....

হে কলম, হে কলমের সঙ্গে লেপ্টে থাকা তর্জনী, বৃদ্ধাঙ্গুলি, মধ্যমা, তুমি যা লিখছ তার যোগ্য হয়ে ওঠো।

চলতিপত্র ২৬ জুলাই ১৯৯৯

মানুষের সঙ্গে পশুর মিল ও অমিল

আমাদের এক বন্ধু ছিল এখনো আছে। আর্কিটেক্ট, নাম তার আতিক। সে প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেখতে পেত কোনো-না-কোনো পশুর প্রতিকৃতি।

আতিক ছেলেটা খুবই নিষ্পাপ গোছের। ফরসা, পাতলা, পাতলা ঠোঁট, চিকণ নাক, চোখে চশমা। বুয়েটের শহীদ স্মৃতি হলে ওর কক্ষে গিয়ে দেখতে পেতাম, ও হয়তো বই পড়ছে, নয়তো গান শুনছে। গান মানে কিন্তু মোজার্ট, বিটোফেন— এই জাতীয় উচ্চমানের জিনিস।

আর বই মানে ? সেও ফরাসি কোনো ক্লাসিক বইয়ের অনুবাদ। এমিল জোলার বই দেখিয়ে সে হাসত। দেখো, জোলা বই লিখেছে।

খুবই নির্মল ধরনের হাসি। কৌতুকটা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। ও জোলা মানে তাঁতি বোঝাতে চাইছে!

প্রতিটি লোকের মধ্যে সে দেখতে পেত কোনো-না-কোনো পশু। এজন্য আমি তার সামনে দাঁড়াতে ভয় পেতাম— আমার ভেতরে না জানি সে কী পশু দেখতে পাচ্ছে?

আমার নিজের ধারণা, আমি লোকটা গোবেচারা টাইপের। সরাসরি বলতে গেলে, আমি একটা গরু। গরুর মধ্যে আমি আবার বলদ শ্রেণীতেই পড়ব। কারণ আমার পক্ষে গাই হওয়া সম্ভব নয়। শিং ভেঙে অবশ্য আমি বাছুর হওয়ার চেষ্টা করতে পারি। তাও হবে হাস্যকর প্রয়াস। আর থাকে ষাঁড় বা এঁড়ে। কিন্তু একটা পেশাদার ষাঁড় যা করে, আমি তেমন করি না। সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে একটাই গো-প্রজাতি বাকি থাকে— বলদ।

যাক, মনে মনে আমি নিজেকে যাই ভাবি না কেনো, অন্যের সামনে তা হতে চাই না। এজন্য আতিককে আমার ভয় করত।

কেউ তার সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসত। হয়তো বলত— দেখলে, একটা শেয়াল গেল! সে যে তাকে কেন একটি বিশেষ শ্রেণীতে ফেলত তার রহস্য আমি আজো ভেদ করতে পারিনি।

তার কাছ থেকে শিখে মানুষকে প্রাণী হিসেবে দেখাটা আমার নিজেও একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুকুরের মধ্যে যে মনুষ্যভাব প্রবল সেটা আমি এর পরেই আবিষ্কার করেছি। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, কুকুর অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর প্রাণী। তার প্রভুর কোনো প্রিয়পাত্র যদি মানুষও হয়, তবু সে ঈর্ষায় ভোগে। যেমন প্রভুর ছেলে, মেয়ে, বন্ধু— এদেরও সে সহ্য করতে পারে না। আর, এক কুকুর যে অন্য কুকুরকে সহ্য করতে পারে না, এটা বলে দেয়ার দরকার নেই। কুকুরের কাজই হল খেয়োখেয়ি করা।

মানুষের মধ্যে এই কুকুরভাবটা বেশ প্রবল। কুকুর প্রভুভক্ত। মানুষও প্রভুভক্ত। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দিকে দেখুন। প্রতিটি বক্তৃতা তারা শুরু করেন নেত্রীর নামে প্রশংসাবাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। ধরা যাক, কোনো গাইয়ের বাছুর হল। তবু তারা বলবেন, আজ সকালে জননেত্রী অমুকের সুযোগ্য নেতৃত্বে গাইয়ের চেষ্টায় ষাঁড়ের

অবদানে ইনশাল্লাহ আমি একটা বাছুরের মালিকানা জন্মসূত্রে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ভাইসব...

প্রভুভক্তির দিক থেকে আমলারা অবশ্য সব রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারেন। কোনো পূর্বপরিচিত আমলাকে তার বসের সামনে কখনো-সখনো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পাল্টে যায়। তার সামনে হাতদুটো সে জোড় করে। তারপর ক্রমাগত কচলাতে থাকে।

ছেলেবেলায় আমার একটা কুকুর ছিল। পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া। তাকে দুদিন আমি বাসা থেকে সরায় করে ভাত এনে খাইয়েছিলাম। তৃতীয় দিন আমি স্কুল থেকে আসতেই সে আমার সামনে এসে পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামনের পা দুটো হাতের মতো কচলাতে শুরু করেছিল। তারপর আমার গায়ের কাছে এসে আমার গায়ে তার পা-সদৃশ হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সম্ভবত আমাকে তেল দিতে চাচ্ছিল। বসের সামনে কোনো আমলাকে দেখলে আমার ওই কুকুরটার কথা মনে পড়ে।

বহু মানুষকে দেখলে আমার মনে পড়ে ফেউয়ের কথা। ডিসকভারি চ্যানেল আর বিবিসির ওয়াইল্ড লাইফের কল্যাণে ফেউ জিনিসটা আমরা চিনতে পারি। বাঘ-সিংহ কোনো প্রাণী শিকার করলে পেছনে পেছনে এসে হাজির হয় ফেউ। উচ্ছিষ্ট ভোগই তার প্রাণধারণের একমাত্র উপায়।

আমরা আমাদের চারপাশে এমন ফেউ অনেকেই দেখতে পাই। বিশেষ করে কোনো ক্ষমতাসীন দল যখন ক্ষমতার হরিণ শিকার করে, সুস্বাদু মাংসের লোভে তখন অনেকেই এসে ভিড় করে ফেউয়ের মতো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক নব্য আওয়ামী লীগারকে। 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' বলতে বলতে তারা মুখে ফেনা তুলে ফেলছে।

এই তো সেদিন একজনের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় জাসদ করতেন। জাসদ ছাত্রলীগ থেকেই ডাকসু নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। এরশাদ আমলে একবার রওশন এরশাদকে মা ডেকেছিলেন খবরের মিজান চৌধুরীর সঙ্গদোষে। তারপর একদিন দেখলাম তার সম্পাদিত মেয়েদের পত্রিকায় জিনাত মোশাররফের বড় বড় ছবি। এরশাদ বিদায়ের পর তিনি ধীরে ধীরে ভর করলেন আওয়ামী লীগের কাঁধে। এখন বেশ আছেন। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমার মনে পড়ে গেল ফেউয়ের কথা।

সাংবাদিকদের আমার মনে হয় কাক। জঞ্জাল ঘাঁটা আর জঞ্জাল পরিষ্কার করাই সাংবাদিক ও কাকের কাজ। এ ছাড়া কাক ও সাংবাদিক নিজের মাংস খায় না।

পশুর সঙ্গে মানুষের এই যে তুলনা, এটা মানবসমাজের পুরনো বিষয়। যেমন সিংহহৃদয় পুরুষ, বাঘের বাচ্চা, বাঘা সিদ্দিকী। এছাড়া কোকিলকণ্ঠী, চিকেনহার্টেড— এসব কথাও বেশ পুরনো।

প্লেবয় পত্রিকার প্রতীকচিহ্ন কেন খরগোশের দুটো কান, এটা আমি ঠিক জানি না। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের বলা হবে বাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষায় বঙ্গশার্দূল। তেমনি শ্রীলঙ্কানরা সিংহ, নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রা কিউই।

মানুষ দেখলে আমার কত পশুর কথাই মনে পড়ে। কাউকে মনে হয় কাঠবিড়ালি, কাউকে শজারু, কাউকে খরগোশ, কাউকে বিড়াল। শাদা ঘোড়া মনে হয় কাউকে দেখলে। কালো শুয়োরও মনে হয় অনেককে, দাঁতাল কালো শুয়োর। মনে হয়, এইমাত্র উঠে এল কচুবন থেকে, কাদা ঘেঁটে।

পশুদের সঙ্গে মানুষের এই যে তুলনা, মানুষ তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি না, মানুষের সঙ্গে তার তুলনাটা পশুসমাজ কী চোখে দেখে।

পশুসমাজে খুনোখুনি আছে, খেয়োখেয়ি আছে। মোরগগুলোকে যেভাবে মুরগির পেছনে ছুটতে দেখি তাতে মনে হয় রেপও আছে। কিন্তু তাই বলে পতিতাবৃত্তি নেই। জোর করে মেয়েদের ধরে এনে পতিতালয়ে বন্দি করে রেখে তাকে দিয়ে নিজের পশুপ্রবৃত্তি (!) নিবৃত্ত করার উদাহরণ পশুসমাজে নেই! কাজেই ওই প্রবৃত্তি তো পশুপ্রবৃত্তিও নয়। ওটা হলো পুরুষপ্রবৃত্তি।

আর গণিকালয় থেকে যারা চাঁদা তোলে আর নেতাগিরি করে, দারোগাগিরি করে, তারা ? তাদের পশুসমাজের কোন্ সদস্যের নামে ডাকা যাবে ?

চলতিপত্র ২ আগস্ট ১৯৯৯

পুলিশের ফাঁদপাতা ভুবনে

প্রথমেই একটা কৌতুক বলে নিই। কৌতুকটা আমি শুনেছি গীতিকার-সাংবাদিক কবির বকুলের কাছ থেকে।

জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশ থেকে পুলিশ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ,যুক্তরাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা কিছুসংখ্যক পুলিশ-সদস্যের ট্রেনিং হচ্ছে আফ্রিকায়।

প্রত্যেক দেশের পুলিশকে আদেশ দেয়া হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০টা করে হরিণ ধরে আনার।

প্রথমে বেরুল আমেরিকার পুলিশেরা। ১০ ঘণ্টার মধ্যে তারা ধরে আনল ১০টা হরিণ, জ্যান্ত এবং পেছনের পা দুটো বাঁধা।

এরপর বের হল বৃটিশ পুলিশ। তারা এল তিনদিন পর। সঙ্গে ১০টা হরিণ। এত সময় লাগলো কেন ?

বৃটিশ পুলিশ বলল : নিরপরাধ হরিণগুলোর গায়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে, এটা নিশ্চিত করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে।

তারপর বাংলাদেশের পুলিশদের পালা। তারা বের হল বটে, তবে ফেরার নামটি নেই। ৭ দিন পর তারা ধরে আনল ৭টা ছাগল। সবাই তো বিস্মিত। কী করেছ! তোমরা, ধরে আনতে বলা হয়েছে হরিণ, আর কিনা ধরে আনলে ছাগল! বলো, ৭টা কেন ? কেন ১০টা নয়।

এর উত্তর জানে বাংলাদেশের পুলিশ, মনে মনে। ১০টাই ধরেছিল, ৩ টাকে পথে ছেড়ে দিয়েছে, তদ্বিরে কিংবা টাকা খেয়ে।

আর হরিণের জায়গায় ছাগল কেন ?

কে বলেছে ছাগল, এগুলোই তো হরিণ— বলল বাংলাদেশের পুলিশ।

না। অসম্ভব। এসব যে ছাগল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

না। অবশ্যই হরিণ। আর হরিণ না হলেই বা কী! এদের রিম্যান্ড দেন, দুদিন পরে এরা নিজেরাই বলবে— আমরা হরিণ, আমরা হরিণ।

গল্পটা ভালো। তাই বলে ফেলার লোভ সামলানো গেল না। বাংলাদেশের পুলিশ কী না পারে! তারা রিমান্ডে নিয়ে ছাগলকে হরিণ বানাতে পারে।

আপনারা নিশ্চয় গল্পটা শুনে হেসেছেন। আমিও। কিন্তু একবার ভাবুন তো ওই ছাগলগুলোর কথা, রিম্যান্ডে নেয়ার পর তাদের কী অবস্থা হবে! ভাবা যাচ্ছে না। তাহলে এবার ভাবুন নিজের কথা।

ধরা যাক, একদিন সকালবেলা পুলিশ ঘিরে ফেলল আপনার বাসা। কী ব্যাপার ? ব্যাপার গুরুতর। আপনি রেপ করেছেন! ব্যস। বলা নেই কওয়া নেই, আপনার হাতে হাতকড়া পরিয়ে তারা নিয়ে চলল থানায়।

আপনি বলতে পারেন— না রে ভাই, আমি আবার রেপ করলাম কখন ?

কখন মানে, গত ১২ তারিখে, সন্ধ্যায়, অমুক থানার পেছনের পরিত্যক্ত কক্ষে।

কী আশ্চর্য! গত ১২ তারিখে তো আমি দেশেই ছিলাম না।

ক্রিমিন্যালরা এসব বলে বটে। ওইভাবে পাসপোর্ট-ভিসাও তৈরি করে রাখে। কিছু যায়-আসে না। চল্ ব্যাটা খানকির পুত।

আরে না ভাই। আপনি ভুল করছেন!

ভুল। আমরা, বাংলাদেশের পুলিশ, আমরা কখনো ভুল করি না। চল্ থানায়।

না রে ভাই। আপনারা যাকে খুঁজছেন, আমি সে নই।

ও সবাই বলে থাকে ধরা পড়ার পর। থানায় চল্। রিম্যান্ডে নিলেই সব 'না' 'হ্যাঁ' হয়ে যাবে।

ব্যস। আপনি ফাঁদে পড়ে গেছেন। এ জীবন একটা ফাঁদ। আপনি যে জন্মগ্রহণ করেছেন, কেউ আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি আদৌ জন্মাতে চান কি না ? কখন, কোথায়, কার গর্ভে জন্মাতে চান ? ছেলে হতে চান নাকি মেয়ে ? বাঙালি হতে চান, নাকি বিহারি ? হিন্দু হতে চান নাকি মুসলিম ? না, কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। একসময় আপনি দেখলেন, একটা জীবন ও পরিচয় এবং অবস্থান নিয়ে আপনাকে দিনযাপন করতে হচ্ছে। এ থেকে আর মুক্তি নেই। আবার মৃত্যুও আপনাকে বলেকয়ে আসবে না। অর্থাৎ আপনি এমন একটা কুঠুরিতে ঢুকে পড়েছেন, যার ঢোকার পথও আপনার জানা নেই, বের হওয়ার পথও আপনার ইচ্ছাধীন নয়। ওটাকেই বলে ফাঁদ।

হ্যাঁ। দার্শনিকদের অনেকে জীবনটাকে ফাঁদ বলে মনে করেন। আর আমাদের বাংলাদেশে নানা ফাঁদ পাতা রয়েছে চারদিকে, আপনার জন্যে। জীবন নামের ফাঁদের ভেতরে আছে আরো নানা ধরনের ফাঁদ। রাষ্ট্র সেটা বানিয়ে রেখেছে।

এবং এক্ষেত্রে পুলিশ হল সবচেয়ে মারাত্মক।

যে-কোনোদিন যে-কোনো কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলতে পারে— তুমিই মরা, তানিয়া নামের চার বছরের শিশুকে আদালত-প্রাঙ্গণে ধর্ষণ করেছ। যদি আপনি এ ফাঁদে পড়ে যান— আল্লাহ না করুক, এ দুর্ভাগ্য যেন আপনার কপালেই না ঘটে— তবে আর রক্ষা নেই।

অথবা আপনি হয়ে পড়তে পারেন নূরুল আবছার। পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। বলবে, তোমার সম্পর্কে ফ্যাক্স এসেছে— ইন্টারপোলের। তুমি এক বিদেশী গুপ্তচর।

মুহূর্তে— বিনা অপরাধে— আমরা যে কেউ ফাঁদে পড়ে যেতে পারি। অমন ফাঁদ অবশ্য ভূ-মাইনের মতো যেখানে সেখানে পাতা আছে।

পুলিশের নিজের জীবনেও বিপজ্জনক ফাঁদ কম পাতা নেই।

ধরা যাক, মন্ত্রী বলল, আজকের হরতালে কড়া ডোজ দিতে হবে। যেই রাস্তায় নামবে, দাও তার পাছায় বাড়ি।

ব্যস, পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। রাস্তায় নেমেছে সাংবাদিক। পুলিশ অফিসার ওয়ারলেসে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, বলছে ওরা সাংবাদিক, কী করব!

ওপর থেকে নির্দেশ হল, সাংবাদিক হোক, আর নবাব স্যার সলিমুল্লাহ হোক দাও পেদানি।

ব্যস। পুলিশ হয়ে উঠল সক্রিয়। একটুখানি লাঠিচার্জ। মৃদু।

পরদিন দেখা গেল, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় মাথা-ফাটা, পাছা-ফাটা সাংবাদিকরা শুয়ে আছে হাসাপতালে। সারাদেশে উঠল জোর প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, নিন্দার ঝড়।

ব্যস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের দেখতে গেলেন হাসপাতালে। সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড হয়ে গেল।

কতগুলো ফাঁদ আছে, যেগুলোকে আমরা জানি নিয়তি বলে। তবে সমাজ-রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল— এ জাতীয় ফাঁদ অপসারণ করা। যেমন আপনি রাস্তায় যাচ্ছেন, হঠাৎ মাথার ওপরে পড়ে গেল নির্মাণাধীন ভবন থেকে ভারি মাল-মশলা। আপনি ধরাধাম ত্যাগ করলেন। এটাকে আমরা নিয়তি বলে থাকি। কিন্তু এ তো নিয়তি নয়। এ হল হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া। রাষ্ট্রের উচিত এই ফাঁদ পাততে না-দেয়া।

কিংবা কী বলবেন ওই ঘটনাটিকে ? আদদীন হাসপাতালে জন্ম-নেয়া ওই শিশুটি, ডাক্তাররা 'মৃত' ঘোষণার পরও যে ১৬ ঘণ্টা বেঁচেছিল, তার বাবা-মা কি নিয়তির শিকার, নাকি ব্যবস্থার!

সড়ক-বিমান দুর্ঘটনা বা নৌকাডুবি সারা পৃথিবীতেই হয়! কিন্তু এদেশের মতো আর কোথাও কি ড্রাইভারের বদলে হেলপার দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব ? বিমানের একটা চাকা খুলে পড়তে পারে আকাশে ওঠার পর! ভাঙাচোরা গাড়ি চলে রাস্তায়! ভাঙাচোরা লঞ্চ পানিতে!

সংবাদমাধ্যম নিজেও কিন্তু ফাঁদে ফেলে ইঁদুরের মতো মারছে নিরীহ মানুষকে! এইতো সেদিন একজনের নামের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল অন্য একজন অভিনেত্রীর নাম, পরকীয়া বিষয়ে। ব্যস। ঘটনার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা না-থাকা সত্ত্বেও একদিন রিপোর্টার হাজির— নির্দোষ অসংশ্লিষ্ট অভিনেত্রীর বাসায়। পরদিন তার নামে পত্রিকায় নানা স্কান্ডালস, কিস্‌সা।

অভিনেত্রীটি অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন— কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে! কিন্তু সংবাদপত্রটি ভুলটি বুঝতে পেরেছিল দেরিতে।

ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্যে উদাহরণ দিই। আনিসুল হক নামে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫০০ জন আছে। আনিস নামে তো হাজার হাজার।

কোনো এক আনিস, ধরা যাক, ব্যাংককে গিয়ে দোকান থেকে জিনিস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। এই সংবাদ অবগত হয়ে কোনো একটা দৈনিক বেচারা কল্পগল্প লেখকের (চোরের) ছবিসহ খবর ছাপিয়ে দিল।

এরপর আমি কী করতে পারি। প্রতিবাদ ? মামলা ?

যাই করি না কেন, লোকের মনে কিন্তু সন্দেহের বীজ ঢুকেই গেল। আমি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটব, লোকে বলবে : ওই যে চোরা আনিস যায়।

চলতিপত্র ৯ আগস্ট ১৯৯৯

পল্টু মিয়ার এক দুপুর

ইদানীং পল্টুর ভাগ্যটা অসম্ভব ভালো যাচ্ছে বলতে হবে। গতকাল ডাস্টবিন ঘাঁটতে গিয়ে সে যা পেয়েছে তা তার কাছে সাত রাজার ধন মাণিকের সমান। আলাউদ্দিনের প্রদীপ ঘষলে, অতঃপর দৈত্যের দেখা পেলেই মানুষ এমন একটা বর পেতে পারে।

একটা লাল রঙের বাইসাইকেল। ছোট্ট, সুন্দর। বেবি বাইসাইকেল।

গত পরশু তিন নম্বর রাস্তার শেষ বাড়ির লোকেরা বাড়ি বদলে অন্য কোথাও চলে গেছে, পল্টু জানত। তাই সে পরিকল্পিতভাবেই সাতসকালে হানা দিয়েছিল এই ডাস্টবিনে।

কিন্তু এমন একটা জিনিস পেয়ে যাবে ভাগাড়ে, তা অবশ্য সে ভাবে নাই। বাইসাইকেলটা ভালোই আছে। ছোট ছোট দুটো লাল রঙের চাকা। টায়ার-টিউব অবশ্য নেই। আবার চেনও আছে। প্যাডেল উল্টাদিকেও ঘোরে।

পল্টু সাইকেলটায় উঠে পড়ে। ছোট সাইকেল। অবশ্য পল্টুও ছোট। তবে সাইকেলের চেয়ে বড়। কাজেই সিটে বসার পরও তার পা দুপাশের মাটি স্পর্শ করে। সুতরাং সে পড়ে যায় না। প্যাডেল ঘোরাতে গিয়ে সে যখন পড়ো-পড়ো হয়, তখনই পা নামিয়ে দেয়। ফলে আর পড়তে হয় না। এই বুঝছি, সাইকেলের পিছের চাক্কার লগে দুইহান ছুডো চাক্কা থাকে, য্যান বড়লোকগো পোলারা পইড়া না যায়। বড়লোকগো পোলা? ক্যান, বড়লোকগো মাইয়ারা সাইকেল চালায় না ? সে নিজে হাসে। বড়লোকগো মাইয়ারা সাইকেলও চালায়। গাড়িও ভি চালায়।

নতুন-পাওয়া সাইকেলটা চালাতে চালাতে, বারবার হোঁচট খেতে খেতে পল্টু সাত-পাঁচ ভাবে। তার বাবা চালাত রিকশা। গত দুইমাস বিমারে পড়ছে, তাই বাপে আর রিকশা টানতে যেতে পারে না। মা-ই ভরসা। মায় কাম করে সারগো বাড়িত। অহন খুব টানাটানি চলতাছে। পল্টু ভাবে।

অবশ্য টানাটানি আর বেশিদিন থাকবে না। কারণ তার বুবু। পারানি। হের বয়স হইছে বারো-তেরো। আসলে আরো বেশি। কিন্তু শরীলডা বাড়ে নাই বইলা বুবুরে ছোডো দেহায়। তো এই বুবুকে শাড়িশুড়ি পরিয়ে একটা গার্মেন্টিসে ঢুকিয়ে দিলেই হল।

এখনো অবশ্য বুবু কামই করে। হোটেলে পানি দেয়। কিন্তু ট্যাকা পায় খুব কম।

আর আছে পল্টু মিয়া। সে কিছু করে না। মা বলেছিল ফুল-বেচার কাজে লাগিয়ে দেবে। পল্টু মিয়ারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই রাস্তার মোড়ে কেউ ফুল বেচে না। ফুল বেচে যেসব রাস্তায়, সেসব জায়গায় পল্টুর লাইন জুটল না। ওই বস্তির 'বড়মিয়া' সব পোলামাইয়ার গার্জিয়ান। তিনিই ফুল দেন আর টাকা বুঝে নেন। বড়মিয়া পল্টুকে

নেননি। বলেছেন— আরে কস কী, এই বস্তির মাইয়ারাই কাম পায় না, খাওন পায় না; অন্য বস্তির পোলাপানরে এইহানে লাগামু ক্যান। মাথা খারাপ, না প্যাড খারাপ ?

তো পল্টু মিয়া আত্মকর্মসংস্থান পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কাগজ টুকানো কাম। ডাস্টবিন ঘেঁটে পলিথিন, শিশি-বোতল, কাগজ, স্যান্ডেল উদ্ধার করে বেচে দেয়া। কামটা ভালো। মাঝেমধ্যে দামি জিনিস পাওয়া যায়। একবার সে সোনার একটা দুলও পেয়েছিল। তবে সাবধান। কনড়ুমরে বেলুন ভাবতা না!

আরেকবার দেখেছিল একটা মরা বাচ্চা। কোন্ মাগি ভি প্যাট খালাস করছে। আহারে বাচ্চাটা! চোখ-কান, হাত-পা।

আজ পল্টু মিয়া কামে যাবে না। আজ সে সাইকেল চালাবে। ইচ্ছামতো। তবে বড় হয়ে সে বাবার মতো রিকশা চালাবে না। সে চালানো শিখবে ট্রাক। সে হবে টেরাকের ডাইবার।

মাছের রাজা ইলিশ
মানুষের রাজা পুলিশ
রাস্তার রাজা টেরাক
বস্তির রাজা ব্যারাক

সাইকেল নিয়ে পল্টু আজ অনেক দূর যাবে। বহু দূরে। ততক্ষণ সে যাবে নাক বরাবর, যতক্ষণ না খিদেয় তার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

সকালবেলা বেরিয়েছে পল্টু। এখন ভরদুপুর। তার ফেরার নাম নেই। একবার খিদে লেগেওছিল বটে। সে খেয়ে নিয়েছে। পকেটে পয়সা ছিল, তাই দিয়ে রাস্তার ধারের হোটেল থেকে মেরে দিয়েছে দুটো রুটি, এক ছটাক গুড়। দুটো রুটিই সে উদরস্থ করেছে, গুড়টা পুরোটা করেনি। অর্ধেক কাগজের প্যাকেটে ভরে পকেটে রেখেছে। রাস্তায় খাওয়া যাবে।

আরেকটু পথ হয়তো সে যেত। কিন্তু গেল না, সামনে কতোগুলো বড়সড় পোলাপান। অইবো কোনো বস্তিটস্তির জাউরা পোলা। সে গালি দেয়। ব্যাটারা তার সাইকেলের দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে সে-নজর খুব ভালো কিছু নয়।

পল্টু সাইকেল ঘোরায়।

পকেটে তার গুড়।

পথের মধ্যে সে তার কিছুটা বের করে খায়। বাকিটা রাখে শোভনের জন্য। শোভন তার ফুফুআম্মার ছেলে। দুই বছর বয়স। পল্টুর খুব অনুগত। পল্টুভাই পল্টুভাই বলে ডাকে। তারা থাকে তাদের বস্তির পাশের ঘরে।

দুপুরের পর পল্টু যখন ফিরে এল, তার রেললাইনের ধারের বস্তিটির কাছাকাছি হল, তখনই তার যেন কেমন কেমন ঠেকল। চারদিকে এত লোক কেন ? এতো পুলিশ কেন ?

মাছের রাজা ইলিশ
মানুষের রাজা পুলিশ

হঠাৎ লোকজন পালাতে শুরু করল। ঠাসঠাস শব্দ। টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটল। পালাও পালাও।

পল্টুর সাইকেলে ধাক্কা লাগল পলায়নরত দুই লোকের। সে ছিটকে পড়লো একদিকে। সাইকেলটা পড়ে রইল রাস্তায়।

আরেকটু এগিয়ে গেল পল্টু। খানিক পর, হাতের মুঠোয় সাইকেলের হ্যান্ডেল।

এখন পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত। কিন্তু এ কী! তাদের ঘরবাড়িগুলো কোথায়। সব তো ভাঙা। ফাঁকা।

তার মা কোথায়!

অসুস্থ বাবা!

তার ফুফাতো ভাই শোভন!

ওদিকে ধোঁয়া উড়ছে। বস্তিতে কি আগুন লেগেছিল!

পল্টু মিয়া কাঁদতে থাকে।

চোখের নিচে তার পানি শুকিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে গলা গেছে বসে, পল্টু এখনো কাঁদছে। মাকে আর বাবাকে সে এখনো খুঁজে পায়নি।

তবে হয়তো অচিরেই পাবে।

যতই মারুক-কাটুক, তবু ঢাকা ছাড়ুমনা। আমরা কই যামু, ক্যান যামু ? পুলিশে পিটাইয়া আমগো ঘর থেইকা খেদাইছে। আল্লায় তো আর খেদাইব না।

গতকাল বুধবার রমনা রেল বস্তি থেকে উচ্ছেদের পর আট মাসের রবিউলকে বুকে জড়িয়ে রেল লাইনের ওপর বসে শাহিদা বেগম কাঁদছিলেন আর এই কথাগুলো বলছিলেন।

শাহিদার স্বামী কাবুল হাওলাদার তখনো ঘরে ফেরেননি। নগরীর সব বস্তি উচ্ছেদ করা হবে এ-কথা তিনি জানতেন। কিন্তু কখন কোথায় কোন্ বস্তি ভাঙা হবে তা জানতেন না। স্ত্রী-সন্তানের মুখে আহার জোগাতে কাবুল প্রতিদিনের মতো রাস্তায় নেমেছিলেন রিকশা নিয়ে। বস্তি উচ্ছেদের খবর পেয়ে তিনি ঘরের মালামাল সরাতে ছুটে যান। কিন্তু তার আগেই বুলডোজারে চাপা পড়ে যায় কাবুল ও শাহিদার ছোট্ট সংসার।

রমনা রেলবস্তিতে প্রায় ৫০০ তরুণী আছে, যারা গার্মেন্টসে শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের ওপর নির্ভরশীল একেকটি পরিবার। উঠতি বয়সের এ সব তরুণীদের নিয়ে বিপদে পড়েছেন তাদের অভিভাবকরা। গতকাল রমনা রেলবস্তি উচ্ছেদের পর সরেজমিনে দেখা গেছে, বস্তির ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে আছে ১০–১২ জন তরুণী। তাদের প্রশ্ন করা হয়, এখন তারা কোথায় যাবে ? জবাবে রুপা নামে একজন জানায়, কই যামু জানি না। কোথাও জায়গা না হইলে রাস্তায় থাকুম। রাস্তায় থাকতে ভয় করবে না ? জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, কী করুম, সরকার আমগো ঘরছাড়া করছে। অহন তো রাস্তায়ই থাকন লাগব। বস্তিতেই আমগো জন্ম। এই বয়সী একটা মাইয়ার যা হওনের তা-ই হইব, তবু ঢাকা ছাড়ুম না।...

... উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে গোপীবাগ, টিটিপাড়া বস্তির সন্ত্রাসীদের গুলিতে মহসিন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হওয়ার ঘটনায় পুলিশ নগরীর সব বস্তি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। গত তিনদিনে পুলিশ নগরীর পূর্ব-জোনের টিটিপাড়া, বালুরমাঠ, সোনার বাংলা, রেল ব্যারাক বস্তি, মালিবাগ ও মগবাজার এলাকার সব বস্তি উচ্ছেদ করে। বস্তি উচ্ছেদের পর হাজার হাজার বস্তিবাসী নগরীতে ভাসমান অবস্থায়

জীবনযাপন করছে। দিনের বেলা তাদের অধিকাংশ যেকোনো স্থানে মালামাল রেখে রাতের বেলা ফুটপাতে কাটাচ্ছে। (প্রথম আলো, ১২ আগস্ট, ১৯৯৯)

চলতিপত্র ১৬ আগস্ট ১৯৯৯

ফরম পূরণ ও হায়েনার গল্প

এক মহিলা কর্মচারী বসে আছেন হাসপাতালের জলাতঙ্ক বিভাগে। তিনি রেজিস্ট্রার। রোগীর নাম তালিকাভুক্ত করেন।

একজন রোগী এল।

তিনি আমোদিত হলেন। যাক। একজন রোগী পাওয়া গেল। তার কাছে রোগী সচরাচর আসে না। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে তার কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে।

'একটা ফরম পূরণ করতে হবে। এই হল সেই ফরম। আচ্ছা, আপনার নাম ?' মহিলা বললেন।

টেবিলের অপর পারে রোগী বসে আছে। ভদ্রলোক তার নাম বললেন। হারুন চৌধুরী।

'মিস্টার না মিস না মিসেস ?' মহিলার জিজ্ঞাসা।

রোগী ভড়কে গেলেন। এটা কী ধরনের প্রশ্ন।

'না না। ঘাবড়াবেন না। এটা হাসপাতালের নিয়ম। আমি শুধু নিয়ম পালন করছি। মিস্টার না মিস না মিসেস ?' মহিলা বললেন।

লিখুন—মিস্টার। রোগী জবাব দিলেন।

'থ্যাংক ইউ। আমাদের নিয়ম হল, সব প্রশ্ন রোগীকে জিজ্ঞেস করে নিয়ে ভালোভাবে বুঝে তারপর ফরম পূরণ করতে হয়। নিজে থেকে কোনোকিছু ধারণা করা যায় না। আপনি জানেন, এর আগে যিনি রেজিস্ট্রার ছিলেন, তিনি খুব মারাত্মক ভুল করেছিলেন। একজন মহিলা রোগীর নামের আগে মিস্টার লিখেছিলেন। শেষে তো মহা কেলেঙ্কারি ঘটনা। কারণ এই রোগে ইনজেকশন দিতে হয় নাভিতে। ভদ্রমহিলাকে যখন প্যান্টের বোতাম খুলতে বললেন একজন পুরুষ-ডাক্তার, তখনই ঘটনা খারাপ হয়ে গেল। বাই দ্য বাই, আমাদের এখানে নিয়ম হল কম কথা বলা! আমি ঘটনার তাই ডিটেইল বর্ণনা দেব না। মিস্টার হারুন চৌধুরীই সই। কী বলেন?'

'জি তাই তো বলছি।'

'এবার বলুন, সেক্স কী ? মেল না ফিমেল।'

হারুন চৌধুরী এবার আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন মহিলার মুখের দিকে।

'উত্তর দিন। এটা এ অফিসের নিয়ম। নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য চাই নির্দিষ্ট জবাব। মেল না ফিমেল।'

'মেল।'

'ঠিক বলেছেন। আমিও তাই ধারণা করেছিলাম।'

ভদ্রমহিলা মেলের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে দিতে বললেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, আপনারা কয় ভাইবোন ?

আমি একা। ভাইবোন নেই।

'আপনার ভাইবোনদের এর আগে কুকুরে কামড়েছিল?'

'বলেছি তো ভাইবোন নেই।'

'না। তা বললে চলবে না। ভাইবোন কজনের উত্তর হল কোনো ভাইবোন নেই। কিন্তু ভাইবোনকে কুকুরে কামড়েছিল কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর হবে : এন এ। নট অ্যাপ্লিকেব্‌ল। বুঝেছেন?'

'জি। বুঝেছি। নট অ্যাপ্লিকেব্‌ল।'

এই গল্পটা আরো অনেক বড়। কিন্তু আমাদের এ পর্যন্ত জানলেই চলবে।

ফরমে এ ধরনের প্রশ্ন থাকে। প্রথমটার উত্তর যদি 'না'-সূচক হয়, তবে দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিতে হয় না।

পাসপোর্টের জন্য, ভিসার জন্য ও বিসিএসের জন্য ফরম পূরণ করতে গিয়ে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আমাদের দিতে হয়েছে।

যেমন : আপনি এর আগে কি ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন।

আপনি উত্তর লিখলেন— না!

আপনার ওই আবেদনটি কি গৃহীত হয়েছিল?

আপনি লিখবেন— এন এ!

'গৃহীত না হলে কেন হয়নি?'

'এন এ।'

২

আমাদের রাজনীতিতে সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

সরকার বলছে, আমরা ট্রানজিট চুক্তি করিনি। শুধু ট্রান্সশিপমেন্ট করা যায় কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য কমিটি গঠন করেছি।

আর বিরোধীদল বলছে, ট্রানজিট চুক্তি বাতিল করো।

শুধু তাই নয়, এর চেয়েও মারাত্মক জটিলতার মধ্যে আমরা পড়েছি। জটিলতা, নাকি প্রহসন— সেটা অবশ্য বোঝা কঠিন।

বিরোধীদলগুলো প্রস্তাবিত ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্টের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে চায়। সেজন্য তারা সচিবালয়ের চারদিকে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দেয়। এবং ঠিক করা থাকে, সরকার যদি এই সমাবেশে হামলা করে (এবং যদি প্রাণহানি ঘটে) তবে তার প্রতিবাদে ৭২ ঘণ্টা হরতাল।

সরকারি দল অবশ্য এই কর্মসূচিকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে। কাঁচপুর ব্রিজে যানজট বেধে যায়। সাভার এলাকাতেও তেমনি বাধার সৃষ্টি হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটের শেষদিকে বেগম খলেদা জিয়ার বক্তৃতা শুরুর তিন মিনিট পর গোলযোগ শুরু হয় এবং শুরুটা হয় বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এবং বোমাটা কিন্তু পড়ে ব্যারিকেডের অন্য পারে— যে পারে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল এবং আহত হয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে একজন পুলিশই। এরপর দৌড়াদৌড়ি, বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ এবং অতঃপর পুলিশের টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, রাবার বুলেট বর্ষণ।

স্মর্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের উক্তি : বিরোধীদল চেয়েছিল একটা লাশ। তা তারা পায়নি।

এবং ঢাকার বিভিন্নস্থানে শুরু হয় গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমাবর্ষণ।

শুধু ঢাকায় নয়, একজন দুজন শহীদের রক্তের বদলা নিতে চট্টগ্রামে ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শুরু হয় সহিংস বিক্ষোভ কর্মসূচি।

ঢাকার সাধারণ মানুষদের মুখে মুখে ছিল শঙ্কা ও প্রশ্ন— কজন মরেছে।

কেউ বলছে একজন। কেউ বলছে দুজন।

বায়তুল মোকাররমে মরেছে একজন আর সাভারে একজন।

আসলে কেউ মরেনি।

তবুও হরতাল।

অর্ধদিবস একদিন দুদিনের জন্য নয়, তিনদিনের জন্য।

আমরা আমাদের ফরম পূরণ করার গল্পে যেতে পারি।

(ক) অবস্থান ধর্মঘটে পুলিশ ও সরকারি গুণ্ডাদের হামলায় কজন মরেছে?

(খ) এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কদিনের হরতাল?

উত্তর হওয়া উচিত—

(ক) একজনও মরেনি।

(খ) নট অ্যাপ্লিকেবল। প্রযোজ্য নহে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খ নং প্রশ্নের উত্তর হয়েছে— তিনদিনের।

আরো চিন্তা করে দেখুন, এ ধরনের কর্মসূচির অমানবিক দিকটা। অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি দেয়াই হয় এ আশায় যে, তাতে গোলযোগ হবে, লোক মরবে, এরপর ফলোআপ কর্মসূচি হিসেবে হরতাল ডাকা যাবে।

এ হলো জেনেশুনে মৃত্যুকে আহ্বান করা।

আমি জানি, যে কর্মীরা এতে যোগ দেয়, যে সাধারণ সমর্থকেরা এতে যোগ দেয়, তারা এই মরণকর্মসূচিতে যোগ দেয় স্বেচ্ছায়। হয়তো তারা জীবনের চেয়েও আদর্শকে বড় জ্ঞান করে। দেশের জন্য, আদর্শের জন্য, দলের জন্য শহীদ হওয়াটাকে সে গৌরব বলে জ্ঞান করে।

আর অনেকেই যায় এ ভাবনায় যে, গোলযোগ হলে অন্য কেউ মারা পড়বে, ঠিক আমি মরব না।

কিন্তু যে-নেতারা এ ধরনের কর্মসূচি দেন, তারা নিশ্চিত জানেন মরলে মরবে কর্মীরা, সমর্থকেরা, সাধারণ পথচারীরা— আমরা মরব না।

তাই তারা এ ধরনের অমানবিক কর্মসূচি দিতে পারেন।

হয়তো এটাই রাজনীতি।

দুই দেশে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন রাষ্ট্রপ্রধানরা মরে না, মরে সৈনিকেরা। সাধারণ মানুষেরা।

হয়তো আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছে ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতায় টিকে থাকাটা যুদ্ধের মতো।

আর কে না জানে, যুদ্ধে ও ভালোবাসায় ন্যায়-অন্যায় বলে কোনো কথা নেই।

কাজেই এ যুদ্ধে জেতার জন্য যদি নিজের সৈনিকও এক-আধটা মারতে হয়, মারলাম!

কোনো আত্মত্যাগই তো বৃথা যায় না।

৩
ডিসকভারি চ্যানেলের কল্যাণে আমরা ইদানীং অরণ্যের প্রাণীদের শিকার সংগ্রহ অভিযান দেখতে পাই। তাতে দেখা যায়, সিংহ বা বাঘ শিকার করে হরিণ বা মেষ। আর তার আশপাশে ঘুর ঘুর করে হায়েনারা। হরিণ বা মেষ মারা পড়ার পর হায়েনারা চলে আসে অকুস্থলে। নিজে শিকার করতে পারে না, অন্যের শিকার-করা প্রাণীর মাংসে ভূরিভোজন সারে।

এই হায়েনারা কারা?

৪
এরশাদ বা গোলাম আযমকে দেখুন। লড়াই করছে, মার খাচ্ছে, বা মারছে বিএনপি কর্মীরা— আর কী সুন্দর তারা আগেভাগেই হরতাল ঘোষণা করে বসে আছে!

'৯০ সালে ঢাকার রাজপথে একটা পোস্টার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।' হায়েনার কবল থেকে দেশ রক্ষা করুন— দেশনেত্রী খালেদা জিয়া।

কী আশ্চর্য না! খালেদা জিয়া এত বিচক্ষণ, এত ভবিষ্যৎদর্শী!

চলতিপত্র ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

মেয়রের কাছে ঢাকার মশাদের স্মারকলিপি

মাননীয় মেয়র, ঢাকা সিটি করপোরেশন, ঢাকা।

হে মহানুভব,
আপনার যোগ্য পৌরোহিত্যে, আপনার স্নেহচ্ছায়াতলে আমরা, ঢাকার মশারা দীর্ঘদিন ধরে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছি। আমরা এখন ঢাকা শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঢাকা শহরের উন্নতিতে আমরা সানন্দিত হই, ঢাকা শহরের কোনো অবমাননা হলে আমাদের মনে পড়ে বিষাদের ছায়া।

হে মহাত্মন,
আমরা আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ—আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তা আপনি নিশ্চিত করেছেন বলে। আপনার সিটি করপোরেশনে একটি আলাদা বিভাগই আছে মশক নিয়ন্ত্রণের জন্য। এ বিভাগ সারাশহরে মশা-নিরোধি ওষুধ ছিটিয়ে থাকে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই, এ ওষুধ আমাদের জন্যে কাজ করে সঞ্জীবনী সুধার মতো। ওষুধে প্রচুর পানি মেশানো থাকে, ফলে সেটা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে আমরা বেশ নেশা অনুভব করি। ঝিমঝিম লাগে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এ ওষুধের ছিটা গায়ে না পড়লে আমাদের সারাটা দিন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

হে মহোদয়,
আপনি আমাদের জন্য এই সঞ্জীবনী সুধার ব্যবস্থা করেছেন, কৃতজ্ঞতার নির্দশনস্বরূপ তার বিনিময়ে আমরাও আপনাদের কম দিইনি।

চিন্তা করুন, সিটি করপোরেশনের ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কথা, তাদের চাকরি-বাকরি আছেই শুধু আমরা আছি বলে। মশা না থাকলে মশানিরোধক সেনাই বা কেন লাগবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতনই বা পাবে কেন ? এই মানবিক কারণেই আমরা ঢাকা শহর ত্যাগ করতে পারছি না।

শুধু কি সিটি করপোরেশনের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর রুটিরুজির প্রশ্ন! তা নয়! আমরা আছি বলেই এদেশে বিকশিত হয়েছে কয়েল-শিল্প। এর সঙ্গে জড়িত হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা। আমাদের ওপরেই নির্ভর/ভরসা করে টিকে আছে এরোসল কোম্পানিগুলো। তাদের কথাও তো আমাদের ভাবতে হয়, নাকি!

হে প্রিয় ব্যক্তিত্ব,

ঢাকার মশা ভদ্র মশা— এ সুনাম আমাদের বহুদিনের। আমরা কেবল রক্তপান করি, গুনগুন গান করি; কিন্তু ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, গোদ—ইত্যাদির মতো মারাত্মক রোগের জীবাণু আমরা বহন করি না। আমাদের নীতি আছে যে মানুষের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, আমরা তাদের ক্ষতি কামনা করতে পারি না। যে মানুষেরা জলাশয়, ম্যানহোল, পচা-ডোবার ব্যবস্থা করে, টবে-ফুলদানিতে গৃহকোণে নোংরা পানি জমা করে আমাদের প্রজনন-ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছে, তাদের আমরা মারাত্মক রোগে ভোগাব, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব— এতটা অকৃতজ্ঞ আমরা নই।

হে করুণাময়,

সম্প্রতি ঢাকার বাইরে থেকে আগত কিছু মশার কথা শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এরা পাহাড়ি এলাকা থেকে এসেছে। এদের পেটের কাছটা নীল। এরা বহন করছে মারাত্মক সব জীবাণু। কেউ বলছে এই জীবাণু থেকে সৃষ্টি হয় মারাত্মক রোগ- সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া, যা কাজ করে মানুষের মস্তিষ্কে, মানুষকে মেরে ফেলে দুদিনের জ্বরে। কেউ বলছে, এই মশার কামড়ে হয় ডেঙ্গুজ্বর। কারো বা ধারণা এই মশার পেটে আছে টাইফাস। ছি ছি ছি! এসব মশা এত খারাপ। আমরা মোটেও এরকম না। আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, মানবপ্রাণ বিধ্বংসী কোনো রোগজীবাণুর সঙ্গে ঢাকার বনেদি মশাদের কোনো সম্পর্ক অতীতেও ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

আমরা চাই এই বহিরাগত মশাদের সমূহ বিনাশ। মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক বহিরাগতের জন্য ঢাকার সমস্ত নির্দোষ ভদ্র মশার মানহানি ঘটতে দেয়া যায় না।

হে কর্মবীর,

আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনার বীর কর্মীরা ঢাকার মশাদের বিনাশ করতে নতুন করে কর্মসূচি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঢাকাবাসীর মনে এমন আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে যে, ঢাকাবাসী নিজ উদ্যোগেই মশার বংশ নির্বংশ করে দিতে আজ উদ্যত। এটা অত্যন্ত অন্যায় প্রয়াস, একজনের দোষের শাস্তি অন্যজন পেতে পারে না। কাজেই যদি মারতে হয়, বেছে বেছে শুধু কালপ্রিটদেরই যেন মারা হয়। একটি নির্দোষ মশাও যেন এই মশকনিধন অভিযানে অপঘাতে মারা না যায়।

হে সিংহহৃদয়,
অতীতে আপনার স্নেহের পরশ পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। এই দুঃসময়ে আপনিই কেবল আমাদের উদ্ধারকারীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। মনে রাখবেন— আমরা যদি না থাকি, তাহলে কার্টুনিস্টরা কার্টুন আঁকতে পারবে না, রম্যলোকদের কলমের কালি শুকিয়ে যাবে, বিরোধীদল আমাদের বিরোধিতা বাদ দিয়ে সরকার-বিরোধিতায় নেমে পড়বে, আর ঢাকা শহর ছেয়ে যাবে সিঁদেল চোরে। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

চলতিপত্র ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

সহেনা সহেনা এই স্থূলতা

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের দিকে— পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে। রাজার জয়গান থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিমানুষের জয়গানের দিকে—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিকে।

কতদূর এগুলো গণতন্ত্র?

জীব ও জড়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে জীববিজ্ঞান বইয়ে বলা হয়, জীব নিজে নিজে নড়তে পারে, জড় পারে না।

উদ্ভিদ একটি জীব। সে নড়তে পারে। যেমন বটবৃক্ষ। তার ডাল থেকে অনেক ঝুরি বেরোয়। সেই ঝুরি মাটিতে ঢুকে গিয়ে শেকড় ছড়ায়। পরে দেখা যায়, কাণ্ড নেই, গাছটা ঝুরির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। একশ বছরে অন্তত তিন হাত গাছটা সরেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, বটগাছ নড়তে পারে। এর থেকে প্রমাণিত হয় বটগাছ একটা জীব।

এ-ছাড়াও একটা জানালার কাছে টবে গাছ রাখা হলো। তিনমাস পর দেখা যাবে গাছটা জানালার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তিনমাসে সে অন্তত তিন ইঞ্চি এগিয়েছে।

আমাদের গণতন্ত্রও এগুচ্ছে। অথবা গণতন্ত্রের দিকে আমরা গত এক বছরে অন্তত ১০ ইঞ্চি এগিয়েছি। কীভাবে এগুলাম, তার প্রমাণ এখন পেশ করছি।

২

শেখ হসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটা বড় আনন্দের খবর। হাজার হলেও তিনি তো আর ব্যক্তি হিসেবে পুরস্কারটা পাননি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার একটা সাফল্যের জন্য পেয়েছেন। সাফল্যটা হল পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটানো।

এ কাজটি করার জন্যে শেখ হাসিনা ও তার সরকার বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। ইউনেস্কো-ওয়ালারা শেখ হাসিনাকে পুরস্কার দিয়ে উচিত কাজই করেছে।

আমরা বাংলাদেশের এককেজন নাগরিক। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে পুরস্কার পেতে দেখে আমাদের গৌরব বোধ করার কথা। আমরা বোধ করছি। আমরা সবাই মনে মনে এজন্যে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাই।

৩

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর মুখোমুখি হলেন এক অভূতপূর্ব সংবর্ধনা-মহোৎসবের। আমি অবশ্য জানি না, এর আগে যারা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন, তারা পুরস্কার হাতে দেশে ফেরার পর এমন কোনো সংবর্ধনা পেয়েছিলেন কিনা।

যাই হোক। আমরা বাঙালিরা একটু আদেখলা ধরনের। এর আগে কেউ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফেরার পর সংবর্ধনা পেয়েছে ? কাজেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা পেতে পারেন।

৪

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা এক অভূতপূর্ব সংবর্ধনা-প্রতীক দর্শন করেন। কোনো এলাকায় যাওয়ার পথে বাঁশ ও রঙিন কাপড় সহযোগে নির্মিত এক অদ্ভুতদর্শন স্থাপনের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়। এই বংশস্থাপনটিকে তোরণ বা গেইট বলে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর প্রথমেই দেখতে পেলেন এ ধরনের অসংখ্য গেট। রাস্তার পিচ সামান্য খুঁড়ে বংশদণ্ডগুলো স্থাপিত এবং গেটের গায়ে নির্মাণ ব্যয় বহনকারীর নামটি বড় বড় হরফে লেখা।

অনেকগুলোতে অবশ্য 'শুভেচ্ছা' বানানটি দন্ত্য-স সহযোগে হয়ে গেছে 'সুভেচ্ছা'। হোক। সু তো বাংলা ভাষায় ভালো বৈ খারাপ নয়।

৫

এবং প্রধানমন্ত্রী দেখতে পেলেন, জিয়া এয়ারপোর্ট থেকেই শুরু হয়েছে, তার ফেরার পথের দুধারে ইউনিফরম পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের বালক-বালিকারা।

ভাদ্রের তালপাকা গরমে স্কুলের ক্লাস বাদ দিয়ে এই বাচ্চাকাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে আছে শুধু প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহনকে হাত নেড়ে অভিনন্দিত করার জন্যে ?

আমার মনে পড়ে গেল শৈশবের কথা। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান একবার আমাদের রংপুর জেলা স্কুল মাঠে এসেছিলেন জনসভা করতে। সামনে তার 'আস্থা-অনাস্থা'র গণভোট। ভোটকেন্দ্রে দুটো বাক্স থাকবে। একটায় তাঁর ছবি। অন্যটি ফাঁকা। ছবিওয়ালাটা 'হ্যাঁ'। ছবি-ছাড়াটা 'না'।

এই হ্যাঁ-বাক্সে ভোট চাইতে এসেছিলেন তিনি। আমাদের জেলা স্কুলের অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানও করেছিলেন। আমরা বেশ তালি দিয়েছিলাম। সেদিনও আমাদের স্কুলের ছাত্রদের জনসভায় হাজির করা হয়েছিল বাধ্যতামূলকভাবে। প্রথমে ইউনিফরম পরে ক্লাসে আগমন। সেখান থেকে জনসভায় যাত্রা। জনসভা শেষে পুনরায় ক্লাসে আগমন ও টিফিন-ভক্ষণ। এ-ছাড়াও এখন মনে পড়ে, মাঝেমধ্যে জিয়াউর রহমান শহরে এলে তার চলার পথের দুধারে দাঁড়িয়ে হাতনাড়ার কাজটি স্কুল-কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে করতে হতো!

৬

ইউনিফরম-পরা বাচ্চাদের দেখে এই মহামানবেরা কি বোঝেন না, এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেনি, 'এদের জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এদের এই হাতনাড়া দেখে মাহমানব-মহামানবীর অন্তত পুলকিত হওয়ার কিছু নেই!

না। তারা তা বোঝেন না। বরং তারা খুশি হন। 'রাজা তোর কাপড় নেই' বোকা রাজার মতো, দিগম্বর হয়ে চলেও বুঝতে পারেন না তার পোশাকহীনতাটুকুন।

বরং তাকে দাঁত বের করে হাসতে হয়। ক্যামেরার সামনে হাসিহাসি মুখে পোজ দিতে হয়। হাত নাড়তে হয়।

পৃথিবীতে মাত্র দুটো পেশার লোক হাত উঁচু করে রেখে ছবি দেয়। ট্রাফিক পুলিশ আর বাংলাদেশের নেতা।

৭

রাজা আসছেন, তাই কাজকর্ম ফেলে রেখে রাস্তার দু ধারে দাঁড়িয়ে থাকো। রোদে গলে যাও। বৃষ্টিতে ভেজো। যা-খুশি তাই করো। গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাও। ঘেমে-নেয়ে ডিহাইড্রেশনে ভোগো। রোদে থেকে লাল হয়ে বাসায় ফিরে পড়ো জ্বরে। তোমার যা-খুশি তাই হোক, ও স্কুল ছাত্রছাত্রী, আমি খুশি। আমি হলাম রাজা। সমস্ত প্রশংসা আমার। তোমরা কেবলই আমার প্রশংসা করো। আমর জয়গান করো। পথে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করো। অগণতন্ত্রিক সামরিক জান্তা, সামন্ততান্ত্রিক রাজা-বাদশা আর একালের নির্বাচিত প্রধামন্ত্রীর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই?

৮

তবু বলব দেশ এগুচ্ছে— গণতন্ত্রের দিকে। বটগাছের মতো ৫০ বছরে পাঁচ হাত সরেছে। আগে যখন জিয়া বা এরশাদকে ছাত্রছাত্রীরা ফুল ছিটাতে বাধ্য হতো, তখন পত্রপত্রিকায় এর বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। এখন করে।

আরো অনেক সমালোচনা করতে হবে। করতে করতে এই সামন্ততান্ত্রিক অশিক্ষা-স্থূলরুচি-মোটাদাগের সংবর্ধনা-তোরণ-মুদিত আঁখি বক্তৃতার হাত থেকে দেশকে / বিটিভিকে / জাতিকে / ছাত্রছাত্রীকে রক্ষা করতে হবে।

চলতিপত্র ৮ অক্টোবর ১৯৯৯

ছাগল বিষয়ে আবার!

ছাড়া ছাগলের উপদ্রব

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন আফাজিয়া বাজারটি এখানকার ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। হাটে হাজার হাজার ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমাগম হয়। অত্র বাজারে প্রভাবশালী এক ব্যক্তির দুইটি রামছাগল সব সময় ছাড়া থাকে। ছাগল দুটি বাজারের তরিতরকারি হতে শুরু করে ফলের দোকান, হোটেল, মুদি দোকানে অবাধে

ঢুকে পড়ে এবং জিনিসপত্র নষ্ট করে। ছাগলদুটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও কেহ কোনো কথা বলে না উক্ত প্রভাবশালী লোকদের ভয়ে। এমতাবস্থায়, ছাড়া ছাগলের উপদ্রব দূর করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

চিঠিপত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর, ১৯৯৯।

৬ অক্টোবর ৯৯ ইত্তেফাকে প্রকাশিত চিঠিটি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। একজন মানুষ চিঠি লিখছেন, মানুষের পত্রিকায়, দুটো ছাগলের হাত (ছাগলের হাত থাকে না, পা থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে ছাগলের পাগুলোকে হাতের সম্মান দান করা হলেও কম করা হয়) থেকে বাঁচার জন্য। শুধু তাই নয়, পত্রলেখক নিজের নাম প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছেন।

দুটো ছাগলের কাছে মানুষের এই পরাজয়! মানবাত্মার এই অবমাননা! মাথা হেঁট হয়ে আসে নাকি?

ছাগল বিষয়ে আমরা যা যা জানতাম

অথচ ছাগল বিষয়ে আমাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষকে পশুপাখির নামে ডাকাটা মানুষের একটা পুরনো অভ্যাস। 'তুমি আমার ময়না, তুমি আমার টিয়া' বলে আমরা কারো-না-কারো হৃদয় জয় করতে পারি। আবার 'বাঘের বাচ্চা' বলে উৎসাহ দিই কোনো সাহসী আদম সন্তানকে। (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বলতেন, বাঘটা সুন্দরবন থাইকা আইছিল, নাকি তোমার মায় সুন্দরবনে গেছিল)। সিংহহৃদয় পুরুষ সবার নমস্য, মুরগি-হৃদয় মোটেই নয়।

গাধা একটি গালি। বলদ রীতিমতো অপমানজনক গালি। শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা ইত্যাদি গালি দেয়ার চেয়ে বরং শারীরিকভাবে পেটানো ভালো।

আর ছাগল! ছাগল অত্যন্ত অপমানজনক একটি অভিধা! ছাগল জিনিসটা যে ঠিক কী? এটা কিন্তু বলদও নয়। বলদ গায়ে-গতরে বড়, খাটতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির অভাবে লাভটা ঘরে তুলতে পারে না। আর ছাগল শরীরেও বড় নয়, তার সৌন্দর্যও নেই। দুটো শিং, একটু দাঁড়ি, তৈলচিক্কন দেহ—এসবের বর্ণনায় একটু কাব্য-টাব্য করা চলে, কিন্তু ছাগলের পদমর্যাদার উন্নতি ঘটে না।

যদি বলা হয়, রামছাগল, তবুও না! এমনি হাস্যকর, এমনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভরা একটা চরিত্র এই ছাগল।

ছাগল নিয়ে প্রবাদ আছে : পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়! হ্যাঁ, এই একটা ব্যাপারে ছাগলের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা চলে না। ছাগল আর অগ্নি সর্বভূক। আগুন অবশ্য পানি খায় না। ছাগল খায়। ছাগল হলো সংবাদপত্রের পাঠক, সে নিউজপ্রিন্ট খায়। সে বাংলা সিনেমার দর্শক, নাচ-গান-কাহিনী হাস্যকৌতুক-সেক্স-ভায়োলেন্স স্থূলতা গলাধঃকরণ করে।

নিরোদ সি চৌধুরীর মতে লেখক দুপ্রকার। ছাগল লেখক ও পাগল লেখক। পাগল লেখক লেখেন নিজের মনের মতো করে, নিজের যা বলতে ইচ্ছা করে, তাই তিনি বলেন। আর ছাগল-লেখকরা লেখেন পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে, টাকার জন্য, জনপ্রিয়তার জন্যে।

ছাগল নিয়ে যত কথাই বলি না কেন, ছাগল ছাগলই থেকে যায়। এ জীবনে আমরা কেউই ছাগল হতে চাইব না, পরের জীবনেও না। কিন্তু এখন ইত্তেফাকের এ চিঠিটা পড়ে আমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হচ্ছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর পণ্ডিত মশাই স্কুল-ইন্সপেক্টরের তিন ঠ্যাঙা কুকুরের দৈনিক খাই-খবরের সঙ্গে নিজের পরিবারের দুপায়ের খোরপোষের তুলনা করেছিলেন। আর আমাদের তুলনাটা ছাগলের অস্তিত্বের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের। দুটো ছাগল বাজারে অত্যাচার করে বেড়ায়। ছাগলদুটোকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়না। তাদের গায়ে ফুলের টোকাটি দেয়ার সাহস কারো নেই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু মুখ ফুটে বলাও যাবে না।

ছাগল আর ওখানে ছাগল নেই। তারা সিংহের মতো পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে।

চিন্তা করুন ছাগলদুটোর শক্তি ও ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্পর্কে।

সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে লেখা গেছে। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে-লেখা ছাপা হয়েছে। হাসিনার বিরুদ্ধেও হরদম হচ্ছে।

জয়নাল হাজারির বিরুদ্ধে লেখা যায়।

হাজি সেলিমের বিরুদ্ধেও লেখা যায়।

কিন্তু দুটো ছাগলের বিরুদ্ধে লেখা যাবে না।

কেন যাবে না ? ব্যাপার কী ?

ব্যাপার হলো, ওরা হলো প্রভাবশালী লোকের ছাগল! প্রভাবশালী সে কত প্রভাবশালী! আমরা এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। গণতন্ত্রের প্রধান কথা: গণ। অর্থাৎ মানুষ। গণতন্ত্রের সব মানুষ সমান। কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, ছোট নয়। গণতন্ত্র হলো গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল।

আমাদের গণতন্ত্রেও সব মানুষ সমান। শুধু ছাগল মানুষের চেয়ে বড়।

এ শুধু একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, এ হলো একটি রূপক। আমাদের সমাজের আসল চিত্র। এখানে মানুষ পরিণত হয়েছে ছাগলে, আর ছাগল পরিণত হয়েছে সিংহে।

প্রভাবশালীর ছাগলরা অথবা প্রভাবশালী ছাগলেরা মানুষের হাটবাজার বনবাদাড় ঘরদোর ধ্বংস করছে। কিছুই করার নেই।

আমাদের এ গণতন্ত্রের যুগের স্লোগান হলো— শোনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে ছাগল সত্য তাহার উপর নাই। তা তো বটেই। রাষ্ট্রক্ষমতায়, চারকোণা বক্সের পর্দায়, মঞ্চের মাঝখানে সর্বত্র আজ ছাগলেরই একাধিপত্য। এদেশে আজ সত্যিকারের ছাগলতন্ত্র কায়েম হয়েছে, যেখানে মানুষমাত্রই অসহায়।

খেলিছ এ বঙ্গ লয়ে ?

'এসেছে করাল কার্তিক আবারো।'

তিস্তায় কত জল গড়াল, যমুনায় হলো সেতু। ডাল-ভাতের সরকার বিদায় নিল, এল ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদানকারী সরকার। কত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাস হলো, সফল হলো কত ক্ষুধা দূরীকরণ প্রকল্প। কত এনজিও গজাল, কত

এন.জি.ও. মরেও গেল। বাংলাদেশের তৃণমূল মানুষের দারিদ্র্য দূর হয়ে গেল বলে! এখন কোথায় ভাতের অভাব, গরিব মানুষেরা তো এখন রীতিমতো মোবাইল ফোনে কথা বলছে, দ্যাখো, বাংলাদেশের মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি রপ্তানি হচ্ছে খোদ-আমেরিকায়। এ গরিব মানুষশূন্য বাংলাদেশে অচিরেই এসে যাচ্ছে নোবেল প্রাইজ!

তবুও কার্তিক এল বাংলায়। উত্তরবঙ্গে।

কুড়িগ্রাম। মাঠ জুড়ে সবুজ ধান। পাকতে দেরি আছে। কাটতে তো অনেক দেরি। হাঁড়ি শিকেয় চড়েছে। চুলোয় চাল বাড়ন্ত। ভূ-শ্রমিকদের কাজ নেই। এমনকি অবস্থাপন্ন কৃষকের ঘরেও চাল নেই। বছরের এই একটা সময়ে উত্তরবঙ্গের ভূ-শ্রমিকরা পরে অকূল পাথারে। প্রতিবছর।

ঘরে চাল নেই। কিষাণবধূর চোখে অন্ধকার। স্বামী তার পালিয়ে গেছে কাজের সন্ধানে। দুটো বাচ্চা নিয়ে তসলিমা বা আকলিমা জরিনা কিংবা জরিমন বেওয়ার দিনগুলো যাবে কী করে! পাশের মিয়াবাড়ির গোলাও শূন্য। হামরাই না খায়া আছি বাহে, তোমাক কী দেবো, বলে মিয়াবাড়ির বড় গিন্নি।

তসলিমা তার ভুখা পেট কম্পমান শরীর নিয়ে বেরোয় খাদ্যের সন্ধানে। কোথাও একটু জংলী আলু কি ওলকচু কি পাওয়া যাবে না? খিদেয় সে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। হাঁটবে কী করে? কাল রাত কেটেছে শাক আর কলাগাছ সেদ্ধ খেয়ে। আজ সকাল থেকে ছেলেটা হাগতে শুরু করেছে। শাকে আর চলবে না। জংলী আলুটা যদি মেলে!

১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাস। আর কদিন পরে ২০০০ সাল। ইতিমধ্যে সবার জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে খাদ্য, স্বাস্থ্য শিক্ষা। তবু তসলিমার মাথার ওপর শকুন চক্কর মারে। রোদ বাড়ে।

বাঁশঝাড়ের ভেতরে তসলিমা খুরপি চালায়। এ যে শেকড়টা দেখা যাচ্ছে, এটা কি খাদ্য নয়? এটা খেলে কি তার ছেলেদুটো বেঁচে যাবে না? আহা! কতদিন ভাতের গন্ধ নাকে আসে না। যখন সেদ্ধ হয়,মাড় টাগবগ করে ফুটতে থাকে, বলক ওঠে, তখন কেমন যেন লাগে! ইশ্, সেই গন্ধ আবার কবে এসে নাকে জুটবে।

এখন আর মঙ্গা হয় না

আশাবাদীরা সন্দেহের চোখে তাকায়। এটা কি হতে পারে যে, এ একবিংশ শতকের গোড়ায় ভাতের অভাবে মানুষ মারা যাবে? মঙ্গা। ও হতো বটে আগে। আজকাল আর হয় না। দেশে গণতন্ত্রের নহর বইছে না? মাইক্রোক্রেডিট ঝেঁটিয়ে বিদায় করেনি দারিদ্র?

কিন্তু কী লিখলেন ভোরের কাগজের পরিমল মজুমদার—

উত্তরাঞ্চলে খাদ্যাভাব

> জেলার গ্রামাঞ্চলে কাজ না-থাকায় মানুষ খাদ্যাভাবে ভুগছে। দরিদ্র পরিবারের পুরুষরা তাদের স্ত্রী-সন্তান ফেলে অন্যত্র কাজের সন্ধানে ছুটছে। এসব গ্রামাঞ্চলে খাদ্যসংকট এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, অনাহারে মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
>
> গত ৮ অক্টোবর চিলমারী থানার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর ওয়ারি মৌজার বৈরাগীর ভিটায় একটি পরিবারের ৩ শিশু ও তার মা তিনদিন অনাহারে থাকার

পর কচুপাতা সিদ্ধ খেয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় ৯ ঘণ্টা যন্ত্রণায় ছটফট করার পর ৮ বছরের শিশু শাহনাজ মারা যায়। পরে গ্রামবাসী চাঁদা তুলে চাল কিনে ভাত খাওয়ালে বাকিরা প্রাণে রক্ষা পায়।

এ ঘটনার পর ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও থানা নির্বাহী অফিসার লোক মারফত একশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিএনওকে অনাহারে মারা যাওয়ার বিষয়টি জানালেও তিনি ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার এ প্রতিনিধিদ্বয় ঘটনাস্থল চিলমারী থানার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর ওয়ারি মৌজার বৈরাগীর ভিটা এলাকায় যান। সেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের রাস্তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত মোস্তফা আলীর বাড়িতে গেলে জানা যায়, ২৪/২৫ দিন আগে মোস্তফা আলী তার স্ত্রী কহিনুর বেগম, শিশুকন্যা সাথী (২), শাহনাজ (৮) ও মুক্তাকে (৯) ফেলে কাজের সন্ধানে ঢাকার আমিনবাজারে যান। সেখানেও কোনো কাজ না-পাওয়ায় তিনি বাসায় কোনো টাকা পাঠাতে পারেননি। তার স্ত্রী কহিনূর জানান, একদিন পাড়াপড়শীর কাছ থেকে ধারকর্জ করে চালালেও গত ৫ অক্টোবর থেকে তিনি কোনোভাবেই খাবার সংগ্রহ করতে পারেননি। অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় শিশুসন্তানরা কাতর হয়ে পড়লে উপায়হীন হয়ে তিনি গত ৭ অক্টোবর রাতে কচুপাতা তুলে এনে সিদ্ধ করে তার ৩ সন্তানকে খাওয়ান। এরপরও ক্ষুধা মেটেনি তাদের। পরদিন ৮ অক্টোবর সকাল ৭টার দিকে শাহনাজ ক্ষুধা সইতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কাফনের কাপড় যোগাড় করতে না-পারায় মৃত শিশুটিকে পুরনো ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে মুড়িয়ে কবরস্থ করা হয়।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, এ গ্রামের ফুল মিঞা (৪৮) তার ৩ বাচ্চাসহ দুদিন যাবৎ অনাহারে রয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেও দুমুঠো চাল কিংবা খাদ্য যোগাড় করতে পারেননি। এছাড়াও গত ৭ দিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও কোনো কাজ খুঁজে পাননি। এ গ্রামের বাচ্চানি বিবি (২৫), মমিনা (২০) এরাও সারাদিন অভুক্ত রয়েছেন বলে জানান। আবদুল জব্বার, আকবর আলী ও গাজী রহমান জানালেন, গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে বেশিরভাগ দিনই চুলা জ্বলে না। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি অভাবি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কাজের সন্ধানে ঢাকায় গেছেন। ফলে অভিভাবকহীন পরিবারগুলো চরম খাদ্যসংকটে দিন কাটাচ্ছে। এছাড়াও চিলমারী থানার নয়ারহাট ইউনিয়নের ফেইচক্যার চর, মানুষমারার চর ও উলিপুর থানার গেন্দার আলগীর চর ঘুরে দেখা গেছে, ঘরে ঘরে অনাহারি মানুষ খাদ্যের জন্য আহাজারি করছেন। কিন্তু কোনোভাবেই কাজ যোগাড় করতে পারছেন না এসব অভাবি মানুষ। এদিকে অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে চিলমারী থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মেসবাউল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন। তিনি বলেন, 'পুলিশের ডিআইও মহসীন আলী তদন্ত করে জানতে পেরেছেন অনাহারে মৃত্যুর খবর সঠিক নয়'। ওই ডিআইওই এ প্রতিনিধিকে মৃত্যুর খবর সঠিক— এ-কথা জানিয়েছেন বলে তাকে জানানো হলে তিনি বলেন, 'তার সঙ্গে আমার কথা

হয়নি, আমি বিষয়টি সঠিক জানি না'। তবে তিনি এলাকায় যাননি বলে স্বীকার করেছেন।

অনাহারে মৃত শিশুকন্যা শাহনাজের জীবদ্দশায় একমুঠো খাবার না জুটলেও মৃত্যুর পর তার বাড়ির উঠানে বড় হাঁড়িতে রান্না হলো খিচুড়ি আর মাংস। যারা তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি তারাই চাঁদা তুলে তার কুলখানিতে বাহারি খাবারের এ আয়োজন করে। তাহলে এবারো মানুষ মরল ক্ষুধায়? এই ১৯৯৯ সালে? মানুষ মরল কচু খেয়ে? দেশের এক অঞ্চলের মানুষ যখন মারা যাচ্ছে কচু খেয়ে, তখন আমরা ভদ্রলোকেরা কী করছি? সংবর্ধনা জানাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীকে।

হরতাল ডাকছি! আচ্ছা, হরতাল যেন কেন ডাকছি? কেউ জানে না, কেন? এইতো এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে, গল্প করছে জনাবিশেক তরুণ-তরুণী? তাদের কেউ জানে না কেন হরতাল হয়, কেনো, এইতো সেদিন হরতাল হলো (২১ অক্টোবর ১৯৯৯)! আর চট্টগ্রামের ঘটনা দেখুন। ওরা কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন। মেয়র মহিউদ্দিনের নির্দেশে দু ট্রাক ময়লা ফেলা হয়েছে বিএনপি নেতা মীর নাসিরউদ্দিনের বাসার সামনে।

হায়! হায় করে কাদা ছোড়াছুড়ি খেলা খেলে হরতাল হরতাল খেলা। আর মানুষ মরে অনাহারে। না খেয়ে!

চলতিপত্র ১ নভেম্বর ১৯৯৯

ওকে আল্লাহই বাঁচিয়ে রেখেছে

এটা একটা খবরের শিরোনাম। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি খবর। খবরের প্রথম অংশটি এরকম—

> 'ওকে আল্লাহই এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। ভুলটা আমাদেরই। মফস্বলের একটি হাসপাতালের রিপোর্টকে বিশ্বাস করেই ভুল করেছি। মেয়েটির রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ। অথচ তাকে দীর্ঘদিন ধরে দেয়া হয়েছে এবি পজিটিভ রক্ত। এ অবস্থাতে ও যে এখনো বেঁচে আছে, সেটাই অস্বাভাবিক।'

এ সহজ স্বীকারোক্তি দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তবিদ্যা বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. জলিলুর রহমানের। ১৭ বছর বয়সী ফারজানা বিশ্বাস টকি ব্লা- ক্যান্সারের রোগী হিসেবে তারই তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের ৬/বি ওয়ার্ডে ১৭ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন। শুধু বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালেই নয়, গত ৮ মাস ধরে বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসা পেয়ে আসছে টকি। নিজ রক্তের গ্রুপের বদলে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ব্যাগ ভিন্ন গ্রুপের রক্ত দেয়া হয়েছে। ডাক্তার বিস্মিত! রোগিণীর বেঁচে থাকার কথা নয়। ভুল গ্রুপের রক্ত দেয়া হচ্ছে রোগিণীকে। অথচ রোগিণী বেঁচে আছে! এ কী করে সম্ভব!

এসব ক্ষেত্রে আমাদের সহজ ব্যাখ্যা হলো— ওপরে আল্লাহ আছেন। তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে আরো একটা ব্যাখ্যা আছে। তা হলো ভেজাল আর বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে, সীসা, কার্বন-মনো-অক্সাইড, সালফার— নানা ভাসমান কণা ভরা বাতাসে

ফুসফুস ভরিয়ে, আর্সেনিক আর নানা ধরনের বিষ-মেশানো পানি খেয়ে-খেয়ে আমরা বাঙালিরা বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছি। কোনো বিষই আর আমাদের মারতে পারে না। আমাদের যদি আটকে রাখা হয় হিটলারের গ্যাসচেম্বারে, তবুও আমরা ভোঁক ভোঁক করে শ্বাস নেব, আর দাঁত বের করে হাসব-বলব, বেঁচে আছি। এটাকে বলে— শরীরে এন্টিবডি তেরি। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি। যেমন করা হয় টিকাদানের বেলায়। বসন্তের টিকায় আসলে থাকে বসন্তেরই জীবাণু, সামান্য পরিমাণ, যাতে শরীর ওই জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে। শরীর ওই জীবাণুকে মেরে ফেলে, আর মেরে ফেলার জন্য শরীরের রণসজ্জা বাড়ানো হয় বহুগুণে। এরপর যত শক্তিশালী বসন্ত-জীবাণুই আসুক না কেন, সুবিধা করতে পারবে না।

আমাদের চারদিকের পরিবেশে এমনি জীবাণু-টিকা সুঁচ বাড়িয়ে আছে শ শ। আমাদের ওয়াসার পানিতে ব্যাক্টেরিয়া আছে— শুধু তাই নয়, বড় কেঁচো পর্যন্ত পড়ে ট্যাপ থেকে। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে আমি বলছি, আমাদের নিজের বাসার ট্যাপ থেকে জোঁক পড়েছে, দুদিন। আমি বালতির পানিতে ধরেছিলাম। লাল বালতির পানিতে কালো জোঁক ভাসছে। তার সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে একবার সংকুচিত, একবার প্রসারিত হচ্ছে— দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে পানি খেয়ে আমরা বেঁচে আছি না! বলবেন, পানি তো লোকে ফুটিয়ে খায়। তা খায়। কিন্তু মিনারেল ওয়াটার যখন কিনে খাই, তখন ? মিনারেল ওয়াটার ফ্যাক্টরি খুলতে তো কিছুই লাগে না। শুধু বাড়ির পরিত্যক্ত ঘরটিতে বোতল বোতল পানি ভরো, আর একটা ছিপি লাগানোর যন্ত্র বসিয়ে টপাটপ ছিপি লাগিয়ে ফেলো। একটা কাজের বুয়া, আরেকটা ছিপি লাগানোর যন্ত্র— এ নিয়েই বিশাল মিনারেল ওয়াটার ফ্যাক্টরি! কী দারুণ চলছে! সেসব পানি আমরা খাচ্ছি— কই, মরে তো যাইনি। গান্ধীজি নাকি একবার রবীন্দ্রনাথকে তেলে-ভাজা খেতে দেখে বলেছিলেন— জানেন, আপনি বিষ খাচ্ছেন ? রবীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ওই বিষ খেয়েই আমরা এতদিন বেঁচে আছি।

২

আর আমাদের চিকিৎসকরা জানেন, এরা মরবে না। এরা মরে না। আবুল হাসানের কবিতায় রোগীরা ঘোষণা দিয়েই রেখেছে— মারী ও মড়কে যার মৃত্যু হয় হোক, আমি মরি নাই; শোনো, কেউ কোনোদিন কোনো অস্ত্রে আমার আত্মাকে দীর্ণ করতে পারে না। অতএব যে-কোনো অস্ত্রই চালাও রোগীর ওপরে, ঠিক সয়ে যাবে। প্রবচন কি আর মিথ্যে বলেছে— শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে,তাই সয়। হয়তো দেখা গেল, অপারেশনের আগে চেতনানাশক ইনজেকশনের বদলে ভুল করে দেয়া হলো ডিস্টিলড স্যালাইন ওয়াটার, তারপর রোগী অজ্ঞান হয়েছে কি হয়নি, শুরু হলো পেট কাটা! তা তখন যদি হাতের কাছে ভালো ছুরি কাঁচি না থাকে, তবে বটি কিংবা ভোঁতা তরকারি কাটা ছুরিই চালানো যায়। এরপরে কি রোগী সজ্ঞান না হয়ে পারে!

আপনি বলছেন আমি ফাজলামো করছি! যাহ্! এরকম কি হয় ? সাক্ষী আনব! আমাদের সহকর্মী মুনির রানার মা! তার মায়ের চোখ অপারেশন হচ্ছে। অ্যানেসথেসিয়া দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার ব্যথা লাগছে। অসহ্য ব্যথা। পরে বোঝা গেলো অ্যানেসথেসিয়া কাজ করছে না।

এইতো গত পরশু কলকাতা দূরদর্শনের খাস খবরে দেখলাম, মৃত রোগীর এক এক্সরে প্লেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আস্ত কাঁচির ছবি। রোগীর পেটে অপারেশন হয়েছিল কিনা। কাঁচিটা রয়ে গিয়েছে। ওই কাঁচি নিয়েই রোগী স্বর্গে গেছে। স্বর্গের দেবতারা কাঁচিটি নিয়ে নিশ্চয় পরস্পরের গোঁপ ছাঁটাছাঁটি করছেন।

রংপুর মেডিক্যাল কলেজে একবার এক কাণ্ড হয়েছিল। রোগীর বাঁ পা কাটাতে গিয়ে ডাক্তার ডান পা কেটেছিলেন। তখন এরশাদের সামরিক শাসন। রোগীও এরশাদের আত্মীয় মতন। পুরো হুলস্থুল লেগে গিয়েছিল। ডাক্তারের চাকরি গিয়েছিল। আর কিছু হয়েছিল কিনা, জানিনা। শুধু কি ডাক্তাররা ভুল করেন— মানবিক ভুল! আছে নকল ওষুধ। মাত্র দুদিন আগে চ্যানেল আইয়ে 'খোলা চোখে' অনষ্ঠানে দেখা গেল। কীভাবে ড্রামে নানা কিছু মিশিয়ে এক অশিক্ষিত শ্রমিক ওষুধ বানাচ্ছে। তারপর সেসব ভরা হচ্ছে শিশিতে। লেবেল লাগানো হচ্ছে বড় কোম্পানির। এসব চলে যাবে বাজারে। আপনি আমি কিনে খাব। ইতিমধ্যে অনেক খেয়েছি। কই তারপরও মরিনি তো!

৩

এই যে বেঁচে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা, এটাই বাঙালিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে ১০ দিন ১৫ দিন ধরে অসহযোগ— বাস চলবে না, ট্রেন চলবে না, দোকানপাট খুলবে না— এর মধ্যে ৯৬ সালে আমরা বেঁচে ছিলাম না! কই জিনিসপত্রের দামও তো বাড়েনি! এই যে মাসে ৭ দিন হরতাল, ৮ দিন সরকারি ছুটি— এর মধ্যেও আমরা টিকে আছি কীভাবে। আমরা মরব না বলে পণ করেছি বলে!

৪

যে-খবরটা এই লেখার শুরুতে মানবজমিন পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখন আমরা এ-খবরটার একটা প্যারোডি করতে চাই।

ওকে আল্লাহই বাঁচিয়ে রেখেছে

ওকে আল্লাহই বাঁচিয়ে রেখেছে। ভুলটা আমাদেরই। আমাদের নেতা-নেত্রীদের বিশ্বাস করেই আমরা ভুল করেছি। দেশটির দরকার বিশ্রামহীন কর্মযজ্ঞ। অথচ তাকে দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে আসা হয়েছে হরতাল। এ অবস্থায় ও যে এখনো বেঁচে আছে, সেটাই অস্বাভাবিক। এ সহজ স্বীকারোক্তি দেশের জ্ঞানী-গুণী সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পকদের।

৫

দাঁতের ডাক্তারদের নিয়ে অনেক ধরনের কৌতুক দেশে-বিদেশে প্রচলিত। একটা বলি।

এক দাঁতের রোগীর দাঁত তোলার সময় ডাক্তার বেদনানাশক বা চেতনানাশক ইনজেকশন দেন না। সাঁড়াশি দিয়ে টান মারেন। এতেই কাজ হয়। অবশ্য চেতনানাশক ইনজেকশন দিলেই যে কাজ হতো, তার গ্যারন্টিই বা কে দেবে। ওতে তো ওয়াসার পানিও থাকতে পারে। যাই হোক, একদিন একজন পুরনো রোগীর দাঁত তোলা হলো। রোগী বলল, আশ্চর্য ডাক্তার সাহেব, আজ ব্যথা লাগেনি। ডাক্তার

বললেন, তা লাগবে কেন ? আমি তো দাঁত তোলার বদলে ভুল করে আপনার **আলজিভ তুলে ফেলেছি।**

৬

আলজিভ তুলে ফেলা সহজ। অত ব্যথা-বেদনা হয় না। রক্তক্ষরণও কমই হয়। কিন্তু দাঁত তোলা কঠিন। কারণ দাঁতের একটা শেকড় (root) থাকে গভীর পর্যন্ত। হ্যাঁচকা টানে দাঁত তুলতে গেলে বেশ রক্তপাত হয়, তীব্র বেদনাও অনুভব করে রোগী।

সম্প্রতি সরকার গণতন্ত্রের একটা দাঁত তুলে ফেলল। সাঁড়াশি দিয়ে। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া। গণ্ডা গণ্ডা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সবাই মিলে টান দিয়ে তুলেছে গণতন্ত্রের এ দাঁত। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন। তাতে সরকার হয়তো উল্লসিতই–কিন্তু গণতন্ত্র বড় কাতরাচ্ছে। বড়বেশি শোনা যাচ্ছে তার কাতরানি।

চলতিপত্র ২২ নভেম্বর ১৯৯৯

উপরের অংশটি পড়িয়া...

বেগম জিয়া আর শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আর বেগম জিয়া। তাঁরা আমাদের নেত্রী, আমরা তাদের সম্মান করি। ভক্তি করি। তারা যা বলেন, আমরা মন দিয়ে শুনি। বিশ্বাস করি। মান্য করি।

কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে হামলা হলো। একজন কবিকে হত্যা করতে উদ্যত হলো চায়নিজ কুড়াল। দুজন ধরা পড়ল।

তারপর একদিন শোনা গেল, এক নেত্রী বলছেন, এটা সাজানো ঘটনা। সরকার জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

শামসুর রাহমান দেশের খুব বড় কবি। দেশের মানুষ তাঁকে আর তাঁর কবিতা ভালোবাসে। মানুষ হিসেবেও তিনি সজ্জন, অমায়িক। শামসুর রাহমানের মতো মানুষকে নিয়ে এ ধরনের ঘটনা কেউ সাজাতে পারে, তা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

আর শামসুর রাহমানের মতো একজন কবির বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছে একটি বড় রাজনৈতিক দল ও তার নেত্রী ? বরং তারা কি বলতে পারত না, সরকার জনগণের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ! যে দেশে শামসুর রাহমানের নিরাপত্তা নেই, সে দেশে একজন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটুকু ?

যশোরে উদীচীর সম্মেলনে হামলার পর, প্রধানমন্ত্রী বলছেন, এসব হলো বিরোধীদলের কারসাজি। দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রয়াস।

অন্যদিকে বেগম জিয়া তার জবাবে বলছেন, যশোর-হত্যাকাণ্ড সরকারের সাজানো!

বিরোধীদলের ষড়যন্ত্র।
সরকারের পাতানো খেলা।
বিরোধীদলের স্যাবোটাজ।
সরকারের সাজানো চক্রান্ত।
বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচার বন্ধের অপচেষ্টা।

গণআন্দোলন বানচালের অপপ্রয়াস।...

ক্যাসেট প্লেয়ার বেজে চলেছে।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে জনগণের কান ঝালাপালা। কেবল যশোরে নিহত নয়জন সঙ্গীতপ্রেমিক মানুষের আত্মীয়স্বজনদের কোনো সান্ত্বনা নেই। তাদের স্বজনেরা আর ফিরে আসবে না। মানুষের মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করতে হবে ? নাকি এদেশের রাজনীতি করতে হয় মানুষের মৃত্যু নিয়েই ? উপরের অংশটি পড়িয়া নিচের প্রশ্নগুলির জবাব দাও।

প্রশ্ন : লোডশেডিঙের কারণ কী ?

উত্তর : বিরোধীদলের স্যাবোটাজ।

উত্তর : সরকারি দলের সাজানো নাটক মাত্র।

প্রশ্ন : দেশে ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটছে কেন ?

উত্তর : বিরোধীদলের ষড়যন্ত্র।

উত্তর : সরকারি দলের সাজানো ঘটনা মাত্র।

প্রশ্ন : কল্পগল্প ভালো হয় না কেন ?

উত্তর : বিরোধীদলের স্যাবোটাজ।

উত্তর : সরকারি দলের চক্রান্ত মাত্র।

প্রশ্ন : কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবে মারা যান ?

উত্তর : বিরোধীদলের স্যাবোটাজ।

উত্তর : সরকারি দলের সাজানো ঘটনা মাত্র।

চলতিপত্র ১৫ মার্চ ১৯৯৯

নেতাদের সুমতি হোক

কাশেম খন্দকার এ দেশটাকে বড় ভালোবাসেন। তার চার ভাই, বৃদ্ধ মা-বাবা, সবাই পাড়ি জমিয়েছে আমেরিকায়। কিন্তু কাশেম খন্দকার রয়ে গেছেন দেশে। নিজের একটা ছোট্ট ব্যবসা আছে, তাই তিনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন; আসলে তিনি পেছন থেকে ঠেলছেন। দুটো ছেলে-মেয়ে আছে তার। একটা কেবল স্কুলে যায়,আরেকটা সামনের বছর যাবে।

কাশেম খন্দকার কোনোদিনই ভাবেননি তাকে এ দেশ ছাড়তে হবে। বেড়ানোর জন্য তিনি ইওরোপ-আমেরিকা গিয়েও ছিলেন। কিন্তু সেখানে তার কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লেগেছে। এই দেশ, আমার নিজের দেশ। গরিব হোক, অনুন্নত হোক, তবু আত্মপরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে চলার জন্য এ দেশটাই আদর্শ।

দেশটার কিছু হবে না— যারা বলে, তিনি তাদের গালে কষে দুটো চড় মারতে পারতেন আজ থেকে ১০ বছর আগেও। তখন এরশাদ-আমল! কাশেম খন্দকার তখন এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনেও অংশ নিচ্ছেন। নেতা হিসেবে নয়, কর্মী হিসেবে। তার মনে আশা, এই সামরিক জান্তাটাকে অপসারণ করা গেলে নিশ্চয় দেশের উন্নতি শুরু হবে। গণতন্ত্র হলো উন্নয়নের প্রধান শর্ত।

এরশাদ বিদায় নিল। এল খালেদা জিয়ার আমল। পরিস্থিতি খুব যে পাল্টাল তা নয়। কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে বিরোধীদলগুলো আন্দোলন শুরু করে দিল।

কাশেম খন্দকারের তখন নতুন ব্যবসা। প্রায়ই হরতালের কারণে কাজকর্ম বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হতো। তার খারাপ লাগত। তিনি বলতেন, আরে বেগম জিয়া কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নিলেই তো পারেন। তা তো তিনি মানলেন না। যখন মানলেন, তখন দেশের অর্থনীতির বারোটা বেজে গেছে।

এখন হাসিনার আমল। শেষ ভরসা। কিন্তু কই ? আবার তো শুরু হলো আন্দোলন। কোনো ইস্যু নেই। শুধু হরতাল ডাকার জন্যই হরতাল।

অথচ ব্যাপারটা এতদূর নাও গড়াতে পারত। বিরোধীদল কেন গেল পৌরসভা নির্বাচন বর্জন করতে ?

কাশেম খন্দকার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন। আজ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯। ২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে পৌর নির্বাচন। বিরোধীদল এ নির্বাচন বর্জন করেছে। তাতে নিশ্চয় সকার খুশি। কারণ, এর ফলে দেশের সবগুলো পৌরসভা থেকে বিরোধীদল বিদায় নিল। পৌর-নির্বাচন রাজনৈতিক নির্বাচন নয়। এতে বিরোধী দল অংশ নিল কি নিল না, কাগজে-কলমে তা না দেখলেও চলে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে বিএনপির অনেক প্রার্থী অংশও নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এরা আওয়ামী লীগেই চলে আসতে বাধ্য হবেন। সবচেয়ে বড় কথা, পৌরসভাগুলোতে নির্বাচনী হাওয়া লেগে গেছে। রাজধানীর হরতালের আঁচ পৌরসভাগুলোতে তেমন করে লাগছে না। এ অবস্থায় পৌর নির্বাচন করে ফেলানোর লোভ সরকার ছাড়তে পারবে না।

এখানেই বিএনপিসহ বিরোধীদলগুলো বিপাকে পড়ে গেছে। সরকার তাদের সঙ্গে সমঝোতা করছে না। তারা তাহলে কী করবে ? বসে বসে বুড় আঙুল চুষবে, তা হয় না। তারা শক্তি দিয়ে আগুন জ্বালাতে থাকবে। ইতিমধ্যে ৬০ ঘণ্টা হরতাল হয়ে গেছে। ৬ জন নিহত। আরো ৬০/৭০ ঘণ্টা আসছে।

আগামী আড়াইটা বছর তারা রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বালাবে।

সরকারের লক্ষ্য— ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।

বিরোধীদের লক্ষ্য— সরকার উৎখাত, আবার ক্ষমতায় বসা।

এই নিয়ে ঝগড়া-মারামারি। মা-বাবা ঝগড়া করে তার শিশুসন্তানকে আছড়ে মারতে পারেন ?

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এখন নিজেদের গোস্বায় জনগণকে ধরে আছড়াতে শুরু করছে। এদেশের জনগণের আর বাঁচা নেই।

কাশেম খন্দকার চোখেমুখে অন্ধকার দেখেন। এমনিতেই তার ব্যবসার অবস্থা খারাপ। আগামী আড়াই বছর দেশটা পুড়বে আগুনে। তারপর কে ক্ষমতায় আসবে ? বিএনপি ? তখন আওয়ামী লীগ ছেড়ে দেবে ? তাহলে ?

এ যে দেখছি এক বিষচক্র! এ থেকে জনগণের মুক্তির কোনো আশা নেই।

দেশের মানুষ হরতালের ওপর বিরক্ত। সরকারি দল যদি শান্তিপূর্ণভাবে নীরবে হরতালের দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার কৌশল অবলম্বন করত, তাহলেই সাধারণ মানুষ হরতাল ভেঙে দিত। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা থাকে। ক্ষমতার দম্ভ তাদের স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানও কেড়ে নেয়। নাহলে হরতালের বিপক্ষে কেউ অস্ত্র নিয়ে মিছিল বের করে রাজপথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে! এদিকে সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে এক ভয়াবহ সংবাদ— হরতালে গুলি-বোমা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাল্টা গুলি চালাবে। ডিএমপি কর্মকর্তাদের বৈঠকে হরতাল মোকাবিলার কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা। (ভোরের কাগজ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯)

তার মানে হরতালে আরো রক্তপাত। তারপর আবার কর্মসূচি। দেশটা পুরো পেট্রোলের উপর ভাসছে। শুধু দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠি দিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেই হলো।

না। এ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অথচ এর অমিত সম্ভাবনা ছিল। প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলিত হতে শুরু করলে তার সুফল পেতে পারত দেশবাসী। বিদেশী বিনিয়োগও বাড়তে পারত। কিন্তু কিছুই হবে না।

হবে না, তার একমাত্র কারণ, নেতারা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তারা সব বোঝেন, শুধু দেশের ভালোটা বোঝেন না।

কাশেম খন্দকার ঠিক করেছেন তিনি দেশ ত্যাগ করবেন।

এ সিদ্ধান্তটা নিতে গিয়ে তার চোখে জল এসে যায়। এই সুন্দর দেশ আর সুন্দর মানুষগুলোকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। তার ছেলেমেয়েরা অন্য দেশের জাতীয় সংগীত গাইবে, অন্য দেশের পতাকাকে স্যালুট দেবে। তার লাশ সমাহিত হবে অন্য দেশের মাটিতে।

তিনি কাঁদতে থাকেন।

আমি আমাদের নেতৃবৃন্দের সুমতি প্রার্থনা করি। দোহাই, আপনারা আমাদের এতবড় সর্বনাশ করবেন না। দেশটাকে ধ্বংস করবেন না— কাঁদতে কাঁদতে বলেন কাশেম খন্দকার।

কিন্তু তার এই আর্তি জাতীয় নেতৃবৃন্দের পাষাণহৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।

চলতিপত্র ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

পেঁয়াজ

পঞ্চাশ টাকা কেজির চেয়ে বেশি দাম যদি হয় পেঁয়াজের, তবে একজন মন্ত্রী, বলেছিলেন, পদত্যাগ করব। এখন পেঁয়াজের দাম ৬০ টাকা। তো তিনি কি পদত্যাগ করেছেন!

না। করেননি।

কারণ দেশের কোন-না কোনো বাজারে ৫০ টাকার নিচেও নিশ্চয়ই পেঁয়াজ আছে। তাছাড়া সব ত্যাগ করা যায়, পদ ত্যাগ করা যায় না। পদ মানে পা। পা ত্যাগ করলে আর থাকল কী !

ধরা যাক, একটা টুল। তার আছে চারটা লম্বা পা। আপনি পা চারটা কেটে ফেললেন। টুল হয়ে গেল পিঁড়ি। ধরা যাক গুঁইসাপ। তারও আছে চারটা পা। পাগুলো কেটে ফেললে গুঁইসাপের কী থাকে! গুঁইসাপ অবিকল সাপ হয়ে যায়! অতএব, আমাদের মন্ত্রীবর পদত্যাগ করলেন না।

পা থাকার অনেক সুবিধা।

১. পা দিয়ে লাথি দেয়া যায়। ছোটবেলায় রচনা বইয়ে পড়েছিলাম আইয়ুব খান মাহাত্ম্য। আইয়ুব খানের (ফিল্ড মার্শাল) ঘরে একবার এক চোর ঢুকে পড়েছিল। আইয়ুব খান টের পেয়ে মারলেন এক লাথি। সঙ্গে সঙ্গে চোর মরে গেল। (আপনি

আমি লাথি মেরে চোর মারলে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হতো, আইয়ুব খান বলে ফিল্ড মার্শাল উপাধি পেলেন)।

২. পা আছে বলেই পা চাটা যায়, পায়ে তেল দেয়া যায়।

৩. পদ আছে বলেই আছে পাদুকা। আছে জুতা আবিষ্কারের কাহিনী। লাখ লাখ বাটা কোম্পানির স্টাফ করে-কিনে খাচ্ছে। (জুতা আবিষ্কারের কাহিনী সূত্রে মনে পড়ল, নারায়ণগঞ্জ শহরকে ধূলিমুক্ত করতে জেলা প্রশাসক আর পৌর প্রশাসকের মধ্যে লেগে গেছে খিটিমিটি। জেলা প্রশাসক পানি ছিটিয়ে ধূলি দূর করতে চান দেশী লাগসই প্রযুক্তিতে। পৌর প্রশাসক তার বিরোধী। পরে দেখা গেল, এত পানি যোগানো অসম্ভব। দেশী প্রযুক্তি ফেইল করল। কাজেই আমাদের প্রস্তাব, পুরো শহরটাকে চামড়া দ্বারা ঢাকা হোক। *প্রথম আলো : ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮)*

৪. পা আছে বলেই আছে ফুটবল খেলা। আছে ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল। আছে রোনালদো, আছে সুজানা!

৫. পা আছে বলেই আছে পা ভারি সমস্যা। আছে গরিবের বাড়িতে হাতির পাড়া!

৬. পা থাকার সবচেয়ে বড় উপকার হলো পা ধরে মাফ চাওয়া যায়, পায়ে পড়ে সালাম দেয়া যায়।

৭. পা থাকলে দৌড়ে পালানো যায়।

একবার এক হরিণ বলল, হে আল্লাহ, আমার শিংগুলো কতো সুন্দর আর পাগুলো কত নোংরা। তুমি কেন নোংরা এই পাগুলো আমাকে দিয়েছ!

> এমন সময় ধাওয়া করল শিকারী। হরিণ দৌড় ধরল। পা বলল : কি হরিণ, আমরা আছি বলেই তুমি দৌড়াচ্ছো। হঠাৎ লতায়-গুল্মে পেঁচিয়ে গেল হরিণের শিংগুলো। হরিণ বলল, হে আল্লাহ, এই শিং তুমি কেন আমায় দিয়েছিলে!

পা-তথা পদের এত উপকারিতা আছে বলেই কেউ পদত্যাগ করে না। আর মুখ আছে বলেই সবাই বড় বড় কথা বলে!

কী দরকার ছিল এ-কথা বলার যে, পেঁয়াজের দাম ৫০ টাকা বেশি হলে আমি পদত্যাগ করব!

যাক। পা-বন্দনা এখানেই সাঙ্গ করি। জবান দিয়ে যারা জবান রাখে না, তারাই এদেশে বড় নেতা, বড় মন্ত্রী। এ নিয়ে আফসোস করা গর্দভের কাজ!

বরং আসুন আমরা পেঁয়াজের বন্দনা করি।

পেঁয়াজ জিনিসটা এখন ভালো ফ্যাশন। এটা সবাই জানেন, সোনার দুলের বদলে ধনীর দুলালীরা পেঁয়াজের অলংকার পরিধান করছেন— জুয়েলারিতেও পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এটা পুরনো সংবাদ।

লেটেস্ট সংবাদ হচ্ছে, বাংলাদেশের এই মহামূল্যবান পদার্থটি কুক্ষিগত করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া সচেষ্ট। ইউরেনিয়ামের চেয়েও পেঁয়াজ এখন তাদের কাছে বেশি লোভনীয়।

বিশ্বে পেঁয়াজ-সংকট কেন দেখা দিল! এর কারণ এক ভারতীয় ভেষজ-চিকিৎসক নাকি বলেছেন, পেঁয়াজ খেলে পুরুষত্ব ও রমণীত্ব জোরদার হয়। ভায়াগ্রা সেবনের প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান কোম্পানিগুলো পেঁয়াজ স্টক করেছে।

পেঁয়াজের বদলে মুলাজু খাওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে ডাকনাম হিসেবেও পেঁয়াজের কদর বেড়েছে। ফজলুর রহমান পটল নাম না রেখে বাবা-মা'রা এখন নাম রাখছেন ফয়জুর রহমান পেঁয়াজ। করলা গাড়ির নামও নাকি বদলে পেঁয়াজ রাখা হবে। মোল্লা দোপেঁয়াজা নাকি তার নাম বদলে রেখেছেন মোল্লা দোমুলাজা।

হায় বাংলার গরিব মানুষ! বেগম জিয়া তোমাদের খাওয়াতে চেয়েছিলেন ডাল-ভাত। তার বদলে খাইয়েছিলেন 'ডাইল'। আর শেখ হাসিনা ভোটের অধিকারের পর ভাতের অধিকার দিতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলার কৃষক যে দুটো লংকা একটা পেঁয়াজ ডলে পান্তা খাবে, তারও উপায় রইল না।

শিশির ভট্টাচার্য তাই প্রথম আলোয় কার্টুন এঁকেছেন। পেঁয়াজের ছবি এঁকে গৃহিণী টাঙিয়ে রাখছে রান্নাঘরের দেয়ালে।

মালয় দ্বীপের এক যে বোকা শেয়ালে
লাগলে ক্ষুধা মুরগি এঁকে দেয়ালে
মনের সুখে চাটতে থাকে খেয়ালে।
বঙ্গদেশে এক যে চালাক গৃহিণী
পেঁয়াজ ছাড়া ভাবছে গৃহ শ্রীহীনই
আঁকল পেঁয়াজ : এটাই যে আজ বিরিনি।

পেঁয়াজ জিনিসটা যে ভোগাবে, এটা বুঝেছিল এক গ্রহান্তরের আগন্তুক।

সে দেখল, পেঁয়াজের দাড়ি আছে, কিন্তু সেটা থুতনিতে নয়। গোড়ায়।

তখনই তার মন্তব্য— এই জিনিস ভোগাবে।

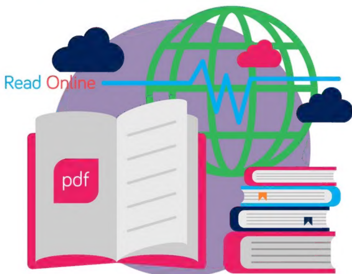
এর আগে সে এসেছিল আরো একবার। একটা পেট্রল-পাম্পে গিয়ে দেখে ডিজেল, পেট্রল, অকটেন লেখা কতগুলো প্রাণী। তারা ভাবল—এগুলো হলো পৃথিবীগ্রহের প্রাণী।

সঙ্গে সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীটি গুলি ছুড়ল। অমনি জ্বলে উঠল ওই পেট্রল বা অকটেনের স্তম্ভগুলো।

আগুন দেখে ভিনগ্রহের প্রাণীটি মন্তব্য করল—আমি আগেই বুঝেছিলাম, পৃথিবীর এই প্রাণীটি ঝামেলা করবে। নইলে কোনো প্রাণী কি তার মূত্রদণ্ড কানে পেঁচিয়ে রাখে!

ডিজেল-পেট্রলের স্তম্ভের মতো পেঁয়াজও একটি বিপজ্জনক জিনিস। ঠিকমতো অগ্নিসংযোগ করতে পারলে এ থেকেও ঘটতে পারে মারাত্মক বিস্ফোরণ। এমনকি ঘটতে পারে সরকারেরও পতন। কিন্তু আমাদের বিরোধীদল পেঁয়াজ বোঝে না। বোঝে খালি পাবনা–২ আসন। বিরোধীদলের সময় এসেছে আসন বদলানোর।

চলতিপত্র ১৪ ডিসেম্বর


Read Online
pdf